শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশ্রীনাথ সেন প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

১২নং ক্রস ষ্ট্রীট, বড়বাজার হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র শেঠ
ও
শ্রীঅতুলচন্দ্র পাল দ্বারা
প্রকাশিত।

১৩২০

মূল্য ২৲ বাঁধাই ২।৹ টাকা।

Printed by

R. C. Mittra, at the Visvakosha Press.

21|3, Santiram Ghose's Street, Bagbazar,

CALCUTTA.

1913.

উৎসর্গ পত্র



যিনি সুধাময়ী শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-গ্রন্থ লিখিয়া বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভূভাগে গৌরনাম প্রচার করিয়াছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকৃপায় আমরা শ্রীশ্রীগৌর-রসামৃতের লেশাভাস আস্বাদনের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যিনি অধুনা ইহজগতে প্রকট থাকিলে এই গ্রন্থ-সন্দর্শনে অতুল আনন্দলাভ করিতেন, আজ আমরা আমাদের সেই পরম ভক্তিভাজন নিত্যধামগত মহাত্মা শ্রীল **শিশিরকুমার ঘোষ** মহোদয়ের পবিত্রনামে ভক্তিপূতচিত্তে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীগৌরভক্তচরণরেণু-প্রয়াসী—

শ্রীসতীশচন্দ্র শেঠ

শ্রীঅতুলচন্দ্র পাল

প্রকাশক।

নিবেদন।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র শেঠ ও শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র পাল শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি প্রথমতঃ তাঁহাদের এই শুভ প্রস্তাবে একরূপ অসম্মত হইয়াছিলাম। তাহার কারণ এই যে, শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর চরিত সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থে অতি অল্প কথাই দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অপরাপর গ্রন্থে দুই একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু উহা অপ্রামাণিক বলিয়া অনেকেরই উহাতে শ্রদ্ধা নাই। অথচ আধুনিক পাঠকেরা চরিত-গ্রন্থ হাতে লইয়াই, যাঁহার চরিত বর্ণনা করা হয় তাঁহার তিনকুলের চতুর্দ্দশ পুরুষের নামধাম ও জন্মাদির তারিখাদির কথা জানিতে ব্যগ্র হয়েন। পাঠক-বিশেষের এই তৃষ্ণা নিরারণের জন্য বৈষ্ণবচরিত লেখকদের মধ্যেও এখন কেহ কেহ এই শ্রেণীর পাঠকের সন্তোষার্থ স্বকপোলকল্পিত নামধাম ও তারিখাদি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। আমি কাল্পনিক নামধাম-তারিখাদি সংযোজনার একান্ত অপক্ষপাতী। তবে বর্ণনীয় চরিত্রের স্বাভাবিকতা ও সম্ভাব্য-তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠকগণের হৃদয়ে পবিত্রতা, প্রেমভক্তি ও ভাবরসাদির উদ্রেকের জন্য ঔপন্যাসিক ধরণে ঘটনার পুষ্টিসাধিকা বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাদৃশী শক্তিতেও আমার অধিকার নাই। বিশেষতঃ প্রিয়াজীর চরিত্র অতি গম্ভীর।

এই দুরবগাহ চরিত্রের কোন কথা লিখিতে যাইয়া পাছে বা ভক্ত-সমাজে অপরাধী হই—ইহাও গুরুতর দুর্ভাবনা।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমি আমার স্নেহভোজন প্রকাশকদ্বয়ের অনুরোধ প্রথমতঃ প্রত্যাখান করিয়াছিলাম। কিন্তু ইঁহারা আমার অযোগ্যতা ও আশঙ্কার কথা একবারেই অগ্রাহ্য করিলেন। অবশেষে ইঁহাদের অনুরোধ,—আদেশে পরিণত হইল। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নিজে কঠোর বিরহ-যাতনা সহ্য করিয়া সমগ্র মানব-সমাজের জন্য শ্রীগৌর-ভজন-প্রণালী,—তদীয় গার্হস্থ্য-লীলাতেও বিরহের আবেশে প্রকাশ করেন। সুতরাং প্রিয়াজীর শ্রীচরিতগ্রন্থ প্রকাশিত করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া ইঁহাদের মনে অত্যন্ত আগ্রহ হয়। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ের হৃদয়েও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত সঙ্কলন করার বলবতী বাসনা ছিল। সেই কথা মনে করিয়া এবং প্রকাশকদ্বয়ের অনুরোধে আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-চরিত লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু প্রিয়াজীর কথা লিখিবার সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া আগেই সম্মুখে দাড়াইলেন। তখন আমি আরও নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। সুতরাং এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। দশ ফর্ম্মায় গ্রন্থ শেষ হইবে বলিয়া আশা করিয়া-ছিলাম, কিন্তু ৩১ ফর্ম্মাতেও কুলাইল না, নমোনম করিয়া গ্রন্থ শেষ করিলাম।

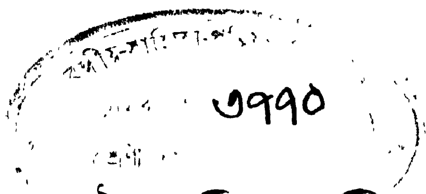
"অনন্ত চৈতন্য-কথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জার মাথাখেয়ে করি টানাটানি॥

বহু ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতার মধ্যে দিনযামিনী যাপন করিয়াও কেবল শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীচরণ মানসচক্ষুর সমক্ষে রাখিয়া স্নেহভাজন প্রকাশকদ্বয়ের অনুরোধ রক্ষা করা হইল। এই গ্রন্থ-মুদ্রণের যাবতীয় ব্যয় শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র ও শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র বহন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তাঁহারা শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রীতি-কামনায় সদনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক বাসনা। সুতরাং ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে কাহারও কোন স্বার্থ নাই! এই গ্রন্থে শ্রীভগবানের নাম ও লীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রথন-নিপুণতা না থাকিলেও ভক্ত-পাঠকগণ তাহাতেই প্রীতি লাভ করিবেন এবং তাহাতেই এই অযোগ্য লেখকের অসীম আনন্দ। অলমতি বিস্তারেণ।

কলিকাতা
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট,
৩০শে ভাদ্র, ১৩২০ সাল।

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা

সূচীপত্র



শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া



শৈশব-চরিত।

[১]

হের দেখসিয়া নয়ন ভরিয়া
কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে শচীর মন্দিরে
চাঁদের উদয় দিনে।
কিয়ে লাখবান কষিত কাঞ্চন
রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর- জলদে নিকষিল
থির বিজুরি পারা॥
কত বিধুবর বদন উজোর
নিশিদিন সম শোভে।
নয়ান ভ্রমর শ্রুতি সরোরুহে
ধায় মকরন্দ-লোভে।

লোচনদাস।

বেদে যিনি সর্ব্বতত্ত্বের আধার,—সর্ব্বদেব-দেব বিষ্ণু,—উপনিষদে যিনি "রুক্মবর্ণ" পরমতত্ত্ব,—মহাভারতে যিনি "সুবর্ণবর্ণহেমাঙ্গ",—শ্রীমদ্ভাগবতাদিপুরাণে যিনি দ্বাপরে শ্যামসুন্দর রূপে উপাস্য,—কলিতে সেই পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান্,—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রূপে অবতীর্ণ। যাঁহারা অবতার-তত্ত্ব বোঝেন না, জীবের প্রতি শ্রীভগবানের যে অসীম দয়া, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ তাঁহারা জানিতে পারেন না। অবতারবাদীরা জানেন, যে গুণাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, নিরাকার নির্ব্বিকার জ্ঞানব্রহ্ম জীবের কোন প্রয়োজন সাধন করেন না। তিনি ভাবুক বিশেষের একটি ভাব-স্বরূপ, তিনি শ্রীভগবানেরই এক মহিমবিশেষ। শ্রীভগবান্ শরীর ধারণ করিয়া যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, মানুষ তখন বুঝিতে পারে, জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে ; সে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। তিনি দয়াময়, তিনি প্রেমময়, তিনি জীবের চির সুহৃদ্। তাঁহার অবতরণে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়। মানুষ শ্রীভগবান্‌কে তখন আপনার হইতেও আপনার বলিয়া চিনিতে পারে।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, শ্রীভগবান্ বহুদেশে বহুরূপে বহুভাবে অবতরণ করেন। সেই সকল অবতরণের কথা কম বেশী সকলেই কিছু কিছু জানেন। এস্থলে তাঁহাদের কথা উল্লেখ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। এখানে মহাবতারী,—সর্ব্বঅবতারের আদি বীজ,—শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের কথাই সংক্ষেপে বলা হইবে।

বলিয়াছি তো শ্রীভগবান্ বহুরূপে বহুদেশে অবতরণ করিয়া লীলা করেন। তাঁহার অযোধ্যা লীলা, দ্বারকা মথুরা ও বৃন্দাবন

লীলা এখনও সমগ্র ভারতে পঠিত ও কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন, রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে মহর্ষিরা এই লীলারসের নিত্য উৎস জগতে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কলিতে দয়াময় শ্রীভগবান্ এই বঙ্গদেশের সৌভাগ্য-গৌরব বর্দ্ধন করেন। আমাদের এই বাস-ভূমিকে তিনি তাঁহার উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠতম লীলার স্থান বলিয়া নির্ব্বাচিত করেন। তাঁহার এই দয়ার কথা মনে হইলেও হৃদয় আনন্দ-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এখানে সেই প্রেমের ঠাকুর আমাদের মধ্যে আমাদেরই সাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যেমন রূপে, তেমনি জ্ঞানে, তেমনি প্রেমে, তেমনি মাধুর্য্যে,— সর্ব্বাবতারের শ্রেষ্ঠতম।

বঙ্গদেশ এই শ্রেষ্ঠতম অবতরণের স্থান-রূপে নির্ব্বাচিত হইল কেন? বাঙ্গালীরা জ্ঞানে বড়, প্রেমে বড় বাঙ্গালীরা হৃদয়বান্। এই কলিকালে শ্রেষ্ঠধর্ম্মের গৌরবে বাঙ্গালীর মহত্ত্ব জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে,—এই বাঙ্গালীরা প্রেম-ভক্তির ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতে সমর্থ হইবে,—এই নিমিত্তই অনন্ত মাধুর্য্যের আধার শ্রীভগবান্ মাধুর্য্যময় বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইলেন।

ইতিহাসের হিসাবে ইহা বেশীদিনের কথা নয়। ১৪০৭ শকে দয়াময় শ্রীভগবান্ বাঙ্গালার তৎকালের প্রধান নগর,— সরস্বতীর প্রিয়তম স্থান,—নবদ্বীপ নগরে অবতীর্ণ হয়েন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার বাসন্তী সন্ধ্যায়, পূর্ণ চন্দ্রের রজতশুভ্র জোৎস্নায় জাহ্নবীতটে অনন্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দিবস আবার সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ। যাঁহারা কখনও হরি নাম কৃষ্ণনাম মুখে

আনেন নাই, আজ তাঁহারাও ভক্তগণের সহিত মিলিয়া জাহ্নবীতটে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে সমবেত হইয়াছেন! হরিনাম কীর্ত্তনের মহারোলে মহানগরী মাতিয়া উঠিল। এই সময়ে মহাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইলেন। এইরূপে হরিনামের তরঙ্গ তুলিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্রগৃহে শ্রীশ্রীশচীমাতার গর্ভসিন্ধু হইতে ভুবনমঙ্গল শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলেন। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাকার লিখিয়াছেন:—

হেন মতে হইল প্রভুর অবতার॥
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে হরি বলি যায়েন ধাইয়া॥
যার মুখে এ জন্মেও নাহিক হরিনাম।
সেই হরি বলি ধায়, করি গঙ্গা স্নান॥

যিনি ভুবন-পাবন হরিনামে জীবের চিত্তের অন্ধকার দূর করিতে,—এবং হরিনাম মহামন্ত্রে জীব উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হয়েন, সেই পরমদয়াল গৌরচন্দ্র নদীয়া নগরে জন্মমাত্রেই জাহ্নবী-তীরে হরি-নামের তরঙ্গ তুলিয়া আপনি উদিত হইলেন।

শিশুর কনক-জ্যোতিতে সূতিকাগৃহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঢল-ঢল আকর্ণবিস্তৃত কমল নয়ন; সে নয়ন-কমল হাসিমাখা। মাথা-ভরা ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি,—ওষ্ঠ দুখানি সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় মসৃণ ও আরক্তিম,—নধর দেহ, সুবলিত সুগোল গঠন,—কমলারুণ চরণ-তল ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি-চিহ্ন-সমন্বিত,—এই অলৌকিক রূপ ও

অলৌকিক গঠন দেখিয়া শচীমাতা ও অন্যান্য নারীগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। শিশুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহোদয় জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সামুদ্রিক বিদ্যাতেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান। লগ্নচক্র-নিরূপণ করিয়া ও শিশুর অঙ্গ লক্ষণ দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন এই শিশু প্রাকৃত শিশু নহেন। তিনি সত্য গোপন রাখিলেন না, তাঁহার জামাতা মিশ্র মহাশয়কে বলিয়া গেলেনঃ—

মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কয়।

*　　*　　*　　*

বৃহস্পতি জিনিঞা হইবে বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইবে সর্ব্বগুণের নিধান॥

আর একজন জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণ বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেঃ—

বিপ্র বলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হইতে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইবে স্থাপন॥
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এ শিশু করিবে সর্ব্ব জগত উদ্ধার॥

*　　*　　*　　*

অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ॥

*　　*　　*　　*

ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান্।
যার এ নন্দন তারে রহুক প্রণাম॥

হেন কোষ্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান্।
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইবে ইহান্॥
ইহানে জানিবে লোকে নবদ্বীপ-চন্দ্র।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ॥

শিশুর জন্মের পর হইতেই নবদ্বীপে এক পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সে পরিবর্ত্তন কি, না, লোকের মুখে সকল স্থানেই 'হরি' নামের ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। ইহার আগে এরূপ ভাবে আর কখনও হরিনাম শুনা যায় নাই। এখন যেখানে-সেখানে কেবল হরিনাম!

কি নগরে কি চত্বরে কিবা গঙ্গাতীরে।
নিরবধি লোকে হরি হরি ধ্বনি করে॥

যে তিথিতে গৌরচন্দ্রমা উদিত হইলেন, সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমা প্রকৃতপক্ষেই ভক্তিপ্রদায়িনী। ব্রহ্মাদিও এই তিথির আরাধনা করেন। ব্যাসাবতার শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ—

চৈতন্যের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মাআদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরমপবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন গোরা দ্বিজমণি॥

এ তিথি অবশ্যই পরমারাধ্যা। আমাদের আরও একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। সে কথাটী এই ঃ—

পরমপবিত্রতমা এই বঙ্গভূমি।
যঁহি অবতীর্ণ হইলা গৌর-প্রেম-খনি॥

এই বঙ্গভূমিকেও আমরা মহামহাতীর্থ বলিয়া মনে করি।

[২]

ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন ও নামকরণ হইল। এই অপ্রাকৃত শিশুটির নাম রাখা হইল নিমাই। * দিন দিন নিমাইর শ্রীঅঙ্গের বিকাশ হইতে লাগিল। মাথার চুলগুলি কপালের উপর দিয়া মুখ ঝাপিয়া নয়ন-কমলের উপরে পড়িত, নিমাইর হাসি-হাসি নয়ন দুটি ঘনকৃষ্ণকেশপাশের মধ্য দিয়া এমন সুন্দর দেখাইত, যে কোন মানব শিশুকেই কেহ কখনও তেমন সুন্দর দেখে নাই,—অলৌকিক কনক-কান্তি,—নিরূপম রূপলাবণ্য,—সুপ্রসর বক্ষঃ,—চাঁদের মত মুখ,—শিশুটীকে দেখামাত্রই লোকের চিত্তে প্রেমের উদয় হইত।

---

* 'নিমাই' নাম রাখার কয়েকটি কারণ আছে। বাসু ঘোষের একটি পদে লিখিত আছে:—

শচীঠাকুরাণী কিছু কহিতে লাগিলা।
সাতপুত্রের পরে বিধি এই পুত্র দিলা।
নিমাই বলিয়া নাম দেহ দ্বিজবর।
বাসুদেব ঘোষ কহে জুড়ি দুইকর॥

কেবল বিশ্বরূপ ব্যতীত শচীদেবীর কয়েকটী পুত্রের অতি শৈশবে মৃত্যু হয়। নিম্ব অতি তিক্ত, তিক্ত বলিয়া উহা অগ্রাহ্য। শিশুবিনাশিনী অপদেবতারা শিশুর প্রাণ সংহার করে। নিম্বকে চলিতকথায় নিম বলা হয়। নিম হইতেই নিমাই নামের উৎপত্তি—নিমাই নাম রাখিলে তিক্ততা স্মরণ করিয়া শিশুসংহারিণী অপদেবতারা শিশুর প্রতি লোভ করে না, এই মনে করিয়া লোকে নিমাই নাম রাখিত; এ প্রথা এখনও আছে। বাসু ঘোষের পদ-অনুসারে শচীমাতাই এই

সমগ্র নগরে এই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় অলৌকিক জ্যোতিঃপূর্ণ শিশুর জন্ম-সংবাদ প্রকাশ পাইল। দর্শনার্থী নর-নারীগণের আগমনে সততই মিশ্রের আলয় লোকে লোকারণ্য হইত। নদীয়াই শ্রীগৌরাঙ্গদর্শন এক মহামহোৎসবে পরিণত হইল। নিমাইকে কোলে করা,—নিমাইকে সাজাইয়া দেওয়া,—নিমাইকে খাওয়ান,—প্রতিবেশী রমণীদের এক নিত্য কর্ম্মে পরিণত হইল। নিমাই সকলের কোলে যাইতেন। সকলের মুখের দিকে চাহিয়া মধুর আনন্দের হাসি হাসিতেন। সে হাসি দেখিয়া, সে মুখ দেখিয়া, নর-নারীগণ চাতকের ন্যায় এই শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হইতেন।

নিমাই যখন হাসিতেন, তখন হাসির তরঙ্গ ছুটিত, আবার যখন কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন, তখন কিছুতেই

নামটি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস নামক অপর পদ কর্ত্তার মতে শ্রীল অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবী এই নাম রাখিয়াছিলেন যথা :—

'ডাকিনী শাকিনী হইতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ভয়ে নাম থুইল নিমাই'। কোন কোন পদকর্ত্তা বলেন নিম্ববৃক্ষমূলে ইহার জন্ম হয় বলিয়া ইহার নিমাই নাম রাখা হয়। ঘনশ্যাম দাস বলেন—

"নিম্ব-মহীরুহ-তলে, সূতিকা গেহে, উদয় ভেল গৌরশশী।"

এইরূপ পদ আরও আছে। গৌরবর্ণ বলিয়া উহার নাম গৌর ও গৌরাঙ্গ, শচীসুত, শচীনন্দন, জগন্নাথ-মিশ্রনন্দন প্রভৃতি আরও বহু নাম আছে। রাশি নাম—বিশ্বম্ভর; সন্ন্যাস নাম,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; মহাপ্রভু নামটী উপনিষদ্‌মূলক। "মহান্ প্রভু র্বৈ সঃ" শ্রুতিতে পরমতত্ত্ব এইরূপ নামেও পরিচিত হইয়াছেন।

সে রোদন থামিত না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শচীমা এ যাতনার এক উপায় প্রাপ্ত হইলেন। শচীমা হরিনাম করিলেই তৎক্ষণাৎ নিমাইর রোদন থামিয়া যাইত। নিমাই প্রায়শঃই এইরূপ রোদন করিয়া শৈশবে সকলকে হরিনাম শুনাইতেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন ঃ—

করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন॥
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করি করয়ে রোদন॥
"হরি হরি" বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্রবদনে॥
জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজন মিলি।
সদাই বোলেন হরি দিয়া করতালি॥
আনন্দে করেন সবে হরি-সংকীর্ত্তন।
হরিনামে পূর্ণ হইল নদীয়া ভবন॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

নাম থুইবার সবে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বলেন এক অন্যে বলে আর॥
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যাপুত্র নাই।
শেষ যে জন্মায় তার নাম সে নিমাই॥
বোলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
এক যোগ্য নাম হয় থুইতে ইহার॥

লোকে কথায় বলে 'উঠন্ত মূল পাতা দেখিলেই জানা যায়।'* শচীগৃহে এইযে হরি নামের মধুর রোল উঠিয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে এই শিশুর প্রভাবে সেই হরিনাম-তরঙ্গ সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আশা আছে, সমগ্র জগতেই এই নামদাতার নাম প্রচারিত হইবে।

এখন লীলার কথাই বলিতেছি। নিমাই অতি সত্বরে হামা-গুড়ি দিতে শিখিলেন। হামাগুড়ি দিতে শিখিয়া তিনি বাড়ীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন; তাঁহার চাঞ্চল্যে শচীমাতাকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হইত। এক দিন নিমাই একটী বিষধর সর্পকে জড়াইয়া ধরিলেন, সর্প অমনি কুণ্ডলী করিয়া নিমাইকে বেড়িয়া রহিল, নিমাই তাহার উপর পরমসুখে শুইয়া হাসিতে লাগিলেন। এই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে সকলেই ব্যাকুল হইলেন। সর্পটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যিনি মহাপ্রেমে সমগ্র জগৎ বশীভূত করেন, বিষধর হিংস্র সর্প যে তাঁহার নিকটে হিংসা ভুলিবে, ইহাতে

এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল শস্য পাইল কৃষকে॥
জগত হইল সুস্থ ইহার জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে॥
অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠিতেও লিখিল বিধান॥
নিমাই যে বলিলেন পণ্ডিতগণ।
সেহ নাম দ্বিতীয় ডাকিবে সর্ব্বজন॥

আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস বলেন, এ লীলায় যিনি বিশ্বাস করেন, সংসার-কাল-ভুজঙ্গে তাঁহার কোনও ভয় থাকে না। ইহা অতি সত্য কথা।

নিমাই অচিরেই হাটিতে শিখিলেন। রূপের ছটা দিন দিন আরও বাড়িয়া উঠিল। মাথাভরা চাঁচরচুল, পদ্ম পলাশের মত ঢল-ঢল নয়ন, আজানুলম্বিত বাহু, প্রতপ্তকনক-কান্তি-বিকাশি নধরকোমল সমুজ্জল দেহ,—অরুণ অধর, সুপ্রসর বক্ষ, চাঁপাফুলের মত অঙ্গুলী,—নিমাই যখন হাটিতে থাকেন, মায়ের মনে ভয় হয়,—মসৃণ-আরক্ত-কোমল চরণ হইতে বুঝি রক্ত বহিয়া পড়িবে। চাঞ্চল্যের পার নাই, নিমাই এই হেথা, এই সেথা, কভু ঘরে কভু বাহিরে।

কিন্তু যাঁহারা হরি বলেন, নিমাই তাঁহাদিগকে বড় ভাল বাসেন। হরি বলিয়া ডাকিলে নিমাই ফিরিয়া চান, কেহ তাঁহার নিকটে আসিলে তাঁহার হাতে যে কোন খাদ্য দ্রব্য থাকে, অমনি তাহা তাহার হাতে দেন। মেয়েরা হরি বলিয়া করতালি দিলে নিমাই দুই হাত তুলিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করেন। সে আনন্দ-মাখা নৃত্য দেখিলেই হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম জাগিয়া উঠে।

মাথাব দীর্ঘচুল মুখে গড়াইয়া পড়ে দেখিয়া শচীমা মাথার উপরে ঝোটন বাধিয়া দেন, কপালে অলকাবলি ও তিলক বিন্দু,—এই বেশে নিমাই যখন নৃত্য করিতে করিতে হরিনাম করেন, সে নাম শুনিয়া সে নৃত্য দেখিয়া লোকে বৈকুণ্ঠের সুখও তুচ্ছ করে।

আবার তিনি নাচিতে নাচিতে ধূলায় পড়েন, সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হয়, দেখিয়া শচীমাতা আদরে কোলে তুলিয়া লয়েন।

আর এক দিনের লীলা শুনুন:—একদিন জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে বলিলেন 'নিমাই, গৃহ হইতে আমার গ্রন্থ লইয়া আইস।" নিমাই গৃহে প্রবেশ করিলেন, সেই গৃহের মধ্যে জগন্নাথ নূপুরের রুনু-রুনু ঝুনু-ঝুনু শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু নিমাইর পায়ে নূপুর ছিল না। কত অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কাহাকেও দেখা গেল না। অথচ ঘরে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশযুক্ত পদ চিহ্ন দেখা গেল। শচী ও জগন্নাথ উভয়ে বিস্মিত হইলেন। এইরূপে শ্রীগৌর-সুন্দর শচীগৃহে বালগোপাল-লীলা প্রকাশ করেন।

নিমাই যে প্রকারে তৈর্থিক ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত। তীর্থ-ভ্রমণকারী এক ব্রাহ্মণ একদা জগন্নাথ মিশ্র গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি রন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদনকালে নয়ন মুদিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এদিকে ধূলি-মাখা নিমাই কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া এক গ্রাস অন্ন মুখে দিলেন। ব্রাহ্মণ চাহিয়া দেখেন,—নিমাই তাঁহার থালা হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া মুখে দিয়াছেন। তিনি মিশ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে মিশ্র তোমার পুত্র এই অন্ন স্পর্শ করিয়া অশুচি করিয়াছে!"

ইহাতে জগন্নাথ মিশ্র অধীর হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিমাইকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন।

অতিথি ব্রাহ্মণ অতিশয় সদাশয়। তিনি বাধা দিয়া

বলিলেন,—"মিশ্র, আপনি এ কি করিতে যাচ্ছেন? নিমাই শিশু; উহার এখনও ভাল মন্দ জ্ঞান হয় নাই, এ জন্য উহাকে প্রহার করা কি আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায়? অমন কার্য্য করিবেন না। আমার মাথার দিব্যি।"

মিশ্র বিষণ্ণ ও নীরব হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

অতিথি। মিশ্র, এজন্য আপনি বিন্দু মাত্র ও দুঃখিত হইবেন না। আহার হওয়া না হওয়া,—ঈশ্বরের বিধান। ঘরে যদি ফল মূল কিছু থাকে, তাই দিন।

মিশ্র। ঠাকুর তা হবে না, যদি আমাকে আপনি ভৃত্য বলিয়া মনে করেন, তবে আবার রন্ধন করুন। আপনার নিকট সকলেরই এই প্রার্থনা।"

ব্রাহ্মণ সম্মত হইয়া আবার রন্ধন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শচী মাতা নিমাইকে লইয়া অপর বাড়ীতে গেলেন। নিমাইর মুখে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। বাঁকা বাঁকা কোকড়ান চুল কপালের উপর দিয়া নয়ন যুগলের উপরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আর মেঘের গায়ে বিজুরির মত উহার মধ্য দিয়া নিমাইর চখের হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। নিমাইকে দেখিয়া মেয়েরা বলিলেন:—

"ওরে নিমাই, তোর একি কাজ, বল্ দেখি? অতিথি-ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের অন্ন এমন ক'রে খেতে আছে কি?" নিমাইর তখন কথা ফুটিয়াছে, সে কথা গুলি এত মধুর যে, যে একবার সে কথা শুনে, সে আপন কাজ ভুলিয়া নিমাইর কথা শুনিবার জন্য দুই দণ্ড

দাঁড়ায়। নিমাই সেই মধুর স্বরে অতি নম্র ভাবে হাসিয়া বলিলেন :—

"আমার দোষ কি, ব্রাহ্মণ আমাকে খাইতে ডাকিলেন কেন? তিনি না ডাকিলে আমি কি তাঁহার অন্ন খাইতাম ?"

জনৈক রমণী নিমাইর কথায় উত্তর দিয়া বলিলেন—'কিন্তু তোমার জাতি গেল। অজানা অতিথি বামন; কোথায় বাড়ী, কেমন ব্রাহ্মণ,—তা কে জানে ?

নিমাই হাসিয়া বলিলেন—"আমার জাতি যাবে কেন? তোমরা জান না, আমি যে গোয়াল! ব্রাহ্মণের অন্ন খেলে কি গোয়ালের জাতি যায় ?"

নিমাইর কথায় রমণী সমাজে একটী হাসির রোল উঠিল। কিন্তু তাঁহার কথার প্রকৃত মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

এদিকে ব্রাহ্মণ রন্ধন সমাধা করিয়া আবার অন্ন-নিবেদন নিমিত্ত তাঁহার উপাস্য গোপালের ধ্যান করিতে বসিলেন। ভক্তের ভগবান্ নিমাই সুন্দর ব্রাহ্মণের ধ্যানে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি রমণীমণ্ডলীকে মোহিত করিয়া এক দৌড়ে ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া এক মুষ্টি অন্ন লইয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

এবার মিশ্রের রোষের সীমা রহিল না। তিনি হাতে লাঠি লইয়া নিমাইয়ের পশ্চাতে দৌড়িলেন। নিমাই ভীত-ভীত ভাবে এক ঘরে গিয়া লুকাইলেন। মিশ্র তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সকলেই বুঝাইতে লাগিলেন 'নিমাই শিশু, শিশুদের এই-

রূপই স্বভাব। আপনি ধৈর্য্যধরুন।' কিন্তু সর্ব্ব দেবময় অতিথির সেবা-ব্যাঘাতে মিশ্রের ধৈর্য্য রহিল না। অবশেষে অতিথি-ব্রাহ্মণ উঠিয়া আসিয়া মিশ্রের হাত ধরিলেন। হাত ধরিয়া বলিলেন—"মিশ্র, তুমি কেন মিছে ক্রোধ কর, বিধাতা আজ আমার ভাগ্যে অন্ন লিখেন নাই। শিশুর দোষ কি ?"

কিন্তু ইহাতে মিশ্রের মনে শান্তি হইল না। তিনি বিষণ্ণ মনে মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিলেন।

এই সময়ে মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বরূপ তখন কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। সেই দেবমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপকে দেখিয়া তৈর্থিক ব্রাহ্মণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

সর্ব্ব অঙ্গ,—নিরুপম লাবণ্যের সীমা॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেও নাহিক উপমা॥
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র, ব্রহ্ম তেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তি-ভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণ-ভক্তি-ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায়॥

অতিথি বিশ্বরূপের মূর্ত্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন "মিশ্র, এ পুত্র কাহার !"

মিশ্র নীরব। অপরাপর লোকেরা বলিলেন "এটি ইহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। মিশ্র বলিলেন, "এ পুত্রের পিতামাতা প্রকৃতই ধন্য ! এতো মানুষ নয়,—যেন সাক্ষাৎ দেবতা।"

বিশ্বরূপ অতি নম্র ভাবে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—ঠাকুর আমাদের পরম ভাগ্য যে আপনি এখানে অতিথি হইয়াছেন! আপনি আত্মারাম ও আনন্দময়; কেবল জগৎ পবিত্র করিবার জন্যই আপনার এই পর্য্যটন। আপনি উপবাস থাকিলে গৃহস্থের অমঙ্গল। আপনি আবার রন্ধন করুন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বাবা, মনে কোন দুঃখ করিও না, আমি আর রাঁধিতে পারিব না। কিছু ফল মূল থাকে তো দাও, তাহাই যথেষ্ট হইবে। আমি বনবাসী;—প্রতিদিন কি আমার অন্ন মিলে? প্রায়শঃই আমি ফল মূল খাইয়া থাকি। ফল মূল যাহা থাকে, তাহাই দেও। আমি তোমাকে দেখিয়া যে সন্তুষ্ট হইয়াছি, ভোজনে তেমন সন্তোষ পাইতাম না।"

মিশ্র মাথায় হাত দিয়া বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি একবারেই নীরব।

বিশ্বরূপ ছাড়িবার পাত্র নহেন। বিশ্বরূপ বলিলেন, 'ঠাকুর, আপনি করুণা-সিন্ধু, সাধুরা পরদুঃখে স্বভাবতঃই কাতর। আমাদিগের দিকে চাহিয়া আবার কৃষ্ণ-নৈবেদ্য রন্ধন করুন। আলস্য করিবেন না। আমরা সগোষ্ঠী দুঃখিত।'

ব্রাহ্মণ। দেখ দুই বার রন্ধন করিলাম। কিন্তু অন্ন-প্রসাদ-ভোজন ঘটিল না। কৃষ্ণের ইচ্ছা নাই, কি করা যায়, বল?

কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥

যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করিলে তথাপি সিদ্ধ নয়॥

আজ কৃষ্ণের ইচ্ছা নাই। আর অনুরোধ করিও না।”

কিন্তু বিশ্বরূপ তাহা মানিলেন না। কাজেই অগত্যা ব্রাহ্মণ আবার রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে নিমাই, মিশ্রের ভয়ে যে ঘরে লুকাইয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, মিশ্র এক খানি যষ্ঠি লইয়া সেই ঘরের দরজায় বসিয়া রহিলেন। ইহার উপরে বাহির দিকে দরজা ভাল রূপে বান্ধিয়া রাখা রহিল। আর ও দুই চারি জন লোক পাহারায় বসিয়া গেলেন। মহাযোগীন্দ্রও যাঁহাকে ধ্যানে ধরিতে পারে না, যাঁহার লোম-কূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে, আজ সেই অনন্ত-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহেশ্বরকে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল! ঐ ঘরে দুই একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, “নিমাই ঘুমাইয়াছে, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।”

ব্রাহ্মণের রন্ধন শেষ হইল। তিনি আবার অন্ন নিবেদন করার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। এবার যোগেশ্বরেশ্বর মহাপ্রভু সকলকে নিদ্রায় অভিভূত করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন,—আবার সেই **শিশু**।

ব্রাহ্মণ হায় হায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার সকলেই যোগ নিদ্রায় অচেতন। নিমাই তখন আত্ম-প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“ঠাকুর, তুমি যে আমায় ডাক, তাই আমি আসি, বল

দেখি, ইহাতে আমার দোষ কি? তুমি নিরবধি আমায় ডাক, তাই আজ তোমায় দেখা দিলাম এই দেখ!"

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া চাহিলেন, চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে এক বিশাল অষ্টভুজ শ্রীমূর্ত্তি,—

সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম,—অষ্টভুজ-রূপ॥
এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণি-হার॥
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে মণিময় অলঙ্কার॥
নব গুঞ্জ বেড়া শিখি পুচ্ছ শোভে শিরে।

কেবল শ্রীমূর্ত্তি নয়, আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্য শোভা পর্য্যন্ত তিনি দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন।

গৌর সুন্দর তাঁহার মাথায় শ্রীহস্ত স্থাপন করিলেন, তাঁহার চেতনা হইল! এইরূপ বহুবার সাত্ত্বিক বিকারের পরে ব্রাহ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন! শ্রীগৌর সুন্দর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—আমি দ্বাপরে নন্দনগৃহেও তোমাকে এইরূপ কৃপা করিয়া ছিলাম। সাবধান, এ কথা কাহাকেও বলিও না।'

এদিকে নিমাইর রক্ষক জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতির যোগনিদ্রা ভাঙ্গিল। তাহারা দেখিলেন, দরজা ঠিক আছে। ওদিকে অতিথি প্রেমাবেশে অন্নদ্বারা অঙ্গলেপন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় "জয় গোপাল জয় গোপাল" রব কবিতেছেন। সে রব শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র ও

অপরাপর সকলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। অতিথি বলিলেন, 'এবার প্রকৃত পক্ষেই কৃষ্ণ কৃপা করিয়াছেন। আজ তোমার ঘরে মহাপ্রসাদ পাইব।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আত্মসংবরণ করিয়া প্রসাদ ভোজন করিলেন। গৃহস্থও কৃতার্থ হইলেন।

নিমাইর চাঞ্চল্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সমবয়স্কদের উপরেই সে উপদ্রবের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। জনক জননী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আর একদিন শচীমাতা নিমাইর উপদ্রবে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। মাতার ক্রোধ দেখিয়া নিমাইর ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিল। নিমাই তখন ঘরের হাড়ী বাসন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শচীমা তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিমাইর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিমাই দৌড়িয়া বাড়ীর সংলগ্ন অশুচি স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে অশুচি ভাঙ্গা হাড়ির উপরে বসিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া নিমাই হাসিতে লাগিলেন। কেন না অশুচিস্থলে তো আর মা যাইতে পারিবেন না। নিমাই এইরূপে মাকে পরাস্ত করিলেন।

শচীমা দুঃখে ও ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন "ওরে হতভাগা, তুই যে ব্রাহ্মণের ছেলে। এখনও তোর শুচি অশুচি জ্ঞান হইল না। যা, স্নান ক'রে আয়, তবে তোকে কোলে লইব।" শচীমা জানিতেন না, যে তাহার এই পুত্রটী কে।

শিশু নিমাই অস্পৃশ্য হাড়ীর উপরে বসিয়া বলিলেন "মা, সে কি কথা? শুচি, অশুচি কি? উহা কল্পনা মাত্র। ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ ও চিত্তময় এই জগৎ কেবল পূর্ণ-অদ্বৈত-পাদপদ্ম

একমাত্র শ্রীহরিরই বিস্তৃত বৈভব। এক করুণাসাগর হরি ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই, ইহা নিশ্চয়রূপে জানিও। মা, আমি চিরপবিত্র, কথনও অপবিত্র নহি,—এবিষয়ে মনে কোনও শঙ্কা করিও না”*: কিন্তু এই অভেদ-জ্ঞানোপদেশে শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণ-পত্নী স্নেহময়ী শচীদেবীর মন টলিল না। তিনি আস্তাকুড়ে ছুটিয়া গিয়া ছেলেটিকে ধরিয়া আনিলেন, ছেলে সহ গঙ্গায় গিয়া স্নান করিলেন।

আর একদিন মায়ের প্রদত্ত খৈ সন্দেশ না খাইয়া নিমাই মাটি খাইতেছিলেন। মা ক্রোধ করিলেন, নিমাই কাঁদিয়া বলিলেন :—

—কেন কর রোষ।
তুমি মাটি খেতে দিলা আমার কি দোষ।
খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার॥
এই মাটি সেই মাটি কি ভেদ-বিচার॥

মা বিস্মিতা হইলেন তখনই শিশুকে ভেদ-বিচার বুঝাইয়া দিলেন। নিমাই প্রাকৃত শিশুর ন্যায় সরলভাবে বলিলেন “মা এই কথা আগে বুঝাইলে তো আর মাটি খাইতাম না।” বেদান্তী মুরারিগুপ্তকেও এই বয়সেই একদিন সোঽহং বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া ছিলেন।

---

* শৃণু, শুচিরশুচিরেষা কল্পনামাত্রমেতৎ ক্ষিতি-জল-পবনাগ্নিব্যোম-চিত্তং জগদ্ধি বিতত-বিভব-পূর্ণাদ্বৈতপাদাক্ত একো হরিরিহ করুণাব্ধির্ভাতি নান্যৎ প্রতীহি।
অতঃ পবিত্র এবাস্মি নাপবিত্র কথঞ্চন
জানী হি মতে নাস্থাং ত্বং শঙ্কাং কর্ত্তুমিহার্হসি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে।

গঙ্গাঘাটে।

[১]

বহু মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি কৃষ্ণ চন্দ্রের বিহার॥
'কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।'
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য॥
যদ্যপিহ গঙ্গা অজ-ভবাদি বন্দিতা।
তথাপিহ যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥
বাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

পতিতপাবনী বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী ভগবতী জাহ্নবী আজও নবদ্বীপ-ধামের পদ-প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন;—এখনও সহস্র সহস্র নরনারী বালক বালিকা গঙ্গাঘাটে স্নান করেন। তাঁহাদের ভক্তিমাখা আনন্দমূর্ত্তি দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির ভাব জাগিয়া উঠে, বালক বালিকাদের সরলতামাখা উদ্দামময় গঙ্গাস্নান-জনিত কলধৌত মধুর-পবিত্র তিলক-চর্চ্চিত মুখচ্ছবি দেখিয়া হৃদয়ে পবিত্রতা, ভক্তি ও প্রেমানন্দের উদয় হয়, প্রাণের ভিতরে নব ভাবের সঞ্চার হয়। গঙ্গাঘাটের এই পবিত্র দৃশ্য, এই সুখময় সম্মিলন, এই প্রেম-পবিত্রতার পুণ্য-খেলা হিন্দুর জীবনে চিরদিনই পবিত্র

উদ্যম আনিয়া দিয়া হিন্দুকে অজ্ঞাতসারে পুণ্যের রাজ্যে আকৃষ্ট করে। গঙ্গাঘাটে পরিচিত সুহৃদ্ বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়, অপরিচিতের সহিত আলাপ হয়, পরস্পর কথাবার্ত্তা দ্বারা হৃদয়ের ভার লঘু হয়, আবার তৎসঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ে আনন্দ ও উদ্যমের সঞ্চার হয়।

গঙ্গাঘাট কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভের মহাতীর্থ নয়, সামাজিক সম্মিলনেরও মহাতীর্থ। এখানে বৃদ্ধা মহিলাগণ, কুল-বধূগণ ও সংসারের আনন্দকুসুম,—কুসুমকোমলা বালিকারাও অবাধে সম্মিলিত হয়েন। স্মরণাতীত কাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সময়ে এই সুপ্রথা ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতেছে। এখন আমরা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মাত্রায় শিষ্ট ও ভদ্র হইতেছি।

কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। গঙ্গাতটবর্ত্তী হিন্দুগণ তখন গঙ্গা-স্নান না করাই পাপজনক বলিয়া মনে করিতেন। গঙ্গাস্নান, গঙ্গাস্তব-পাঠ, গঙ্গাবন্দনা, গঙ্গাঘাটে সন্ধ্যাপূজা ও জপাদি করা গঙ্গাতীরের হিন্দুগণের নিত্যকর্ম্ম ছিল। এমন কি কুলরমণীরা অবাধে গঙ্গাঘাটে আগমন করিতেন, বালিকারা পর্য্যন্ত ভক্তিভরে তিনসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করিত। এ দৃশ্য দেখিয়া কাহার প্রাণে ভক্তির সঞ্চার না হয়? অমন যে পাষাণ-পাষণ্ড,—তাহার প্রাণেও এই প্রেম-পবিত্রতা ও ভক্তির বিপুল ভাব সন্দর্শনে দ্রবীভূত হয়, সেই ঊষর ক্ষেত্রেও ভক্তির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে,

নরনারীগণের প্রাণে কোমলতার হ্রাস হইতেছে, জাতীয় জীবনের উৎস,—শুষ্ক নীরস ও ম্লান হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা জীবনে যে নিত্য অভিনব বল উদ্যম ও প্রফুল্লতার সঞ্চার হইত, এখন সেই সুখসৌভাগ্যের দিন একরূপ চলিয়া গিয়াছে। তথাপি গঙ্গাঘাটে আমরা বিগতসুখস্মৃতির বিলুপ্তপ্রায় নিদর্শনের ক্ষীণ ও পরিম্লান চিহ্নের অবশেষ এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাই। জীবনের উদ্যম, সজীবতা, পবিত্রতা, প্রফুল্লতা ও ভক্তির ভাববিকাশ এখনও গঙ্গাঘাটে ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু যে দিনের পুণ্য-কাহিনী স্মরণ করিয়া এস্থলে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে, সেদিন বাঙ্গালীর অতি সৌভাগ্যের দিন,—অতি গৌরবের দিন। বাঙ্গালী সেদিনের কথা ভুলিতে বসিয়াছে, বাঙ্গালী কাচ পাইয়া কাঞ্চন ত্যাগ করিতেছে। পুণ্যধাম নবদ্বীপে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর—কেবল বাঙ্গালীরই বা বলি কেন—সমগ্র জগতের অধিবাসীদের এই যে সৌভাগ্য রবির উদয় হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা এক অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। বিদ্যা-গৌরবে ও ঐশ্বর্য্য-বৈভবে তখন নবদ্বীপ অদ্বিতীয়। নবদ্বীপ তখন ভারতের প্রধানতম বিদ্যাতীর্থ, নবদ্বীপ ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান না হইলেও প্রধানতম নগর। বর্ত্তমান কলিকাতা হইতেও তখন নবদ্বীপে লোক সংখ্যা বেশী ছিল। তখন নবদ্বীপের পদ-প্রান্ত-বিহারিণী পুণ্যসলিলা ভগবতী জাহ্নবীর পবিত্র তট দিবানিশি লোকে লোকারণ্য হইত। শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস

ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তখনকার নবদ্বীপের অবস্থা নিম্নলিখিত কথায় বর্ণনা করিয়াছেন :—

অবতরিবেন প্রভু জানিয়ে বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে।
একেক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একই জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥

এই বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় নবদ্বীপের একেক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নান করিতেন। নবদ্বীপের এই বিশাল বিপুল বৈভবের সময়ে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রমা সমুদিত হয়েন। দয়াময় যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন চন্দ্রগ্রহণ। সে সময়ে নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটে যে বিপুল লোক-সমাগম ও তুমুল হরিসংকীর্ত্তন রোল উঠিয়াছিল, এখন গঙ্গাঘাটে গ্রহণোপলক্ষে তাহার স্মৃতিমাত্র পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ে গঙ্গার মহিমা আরও বর্দ্ধিত হয়েন। কেন না সাক্ষাৎ ভক্তিদেবী তৎপূর্ব্বেই অবতীর্ণা হইয়া শ্রীধামকে শ্রীপাদ ভক্তগণের প্রিয়ভূমি করিয়া তুলিয়াছেন। নীলাকাশে চাঁদের পাশে নক্ষত্রগণ যেমন সাজিয়া দাঁড়ায়, ভক্তগণও চারিদিক হইতে সেইরূপ নবদ্বীপে আগমন করিয়া ছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরশশীর উদয়ে গঙ্গাঘাটের ভক্তিলীলা দিন দিন অধিকতর বাড়িয়া উঠিল।

অন্যান্য কুলমহিলাগণের ন্যায় শ্রীশ্রীগৌরশশীর জননী নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন। অনেকেই ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান-ব্রত পালন করিতেন। এখন যেমন মহিলাগণের সঙ্গে বালক বালিকারা গঙ্গাস্নান করেন, তখন এই রীতি খুব বেশী ছিল।

[২]

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য বাড়িতে লাগিল, তখন প্রায়শঃই গঙ্গাঘাটে তাঁহাকে দেখা যাইত, সোণার গোপাল, বাল্যসঙ্গীদের সঙ্গে গঙ্গাঘাটে বিচরণ করিতেন, লোকের পূজার সামগ্রী কাড়িয়া লইতেন, বলিতেন,—'তোমরা আমার পূজা কর, আমাকে নৈবেদ্য দেও, গঙ্গা সন্তুষ্ট হইবেন, দেবতারা সন্তুষ্ট হইবেন।' লোকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, তাঁহার রূপে তাঁহাদের নয়ন আকৃষ্ট হইত, মধুর অথচ সতেজ কথা কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিত। তাঁহারা পূজা ভুলিয়া পূজার দ্রব্য তাঁহার হাতে অর্পণ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বয়স্য বালকদের হাতে ভোজ্য দ্রব্য দিয়া

গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। গঙ্গাঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা অতি অদ্ভুত কাহিনী। ঠাকুর বৃন্দাবন ইহার যে জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর ও মনোহর। এই দেখুন একটি চিত্র :—

ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন কালির বিন্দু শোভে মনোহর॥
পড়িয়া শুনিয়া সর্ব্ব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতুহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য লোক এক ঘাটে স্নান করে॥
কতেক বা দান্ত গৃহস্থ, সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তঁহি আসি॥
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে॥

শ্রীপাদ ঠাকুর বৃন্দাবন স্বর্ণগোপাল শ্রীগৌরাঙ্গের এই যে চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন, ইহার তুলনা নাই। নিমাই বালক, তাঁহার হাতে খড়ি হইয়াছে, তিনি তালপাতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, তাহার উপরে আবার লিখন-কালির বিন্দু পড়িয়া এক অদ্ভুত শোভা প্রতিফলিত হইয়াছে। এই অবস্থায় তিনি শিশুগণের সঙ্গে নানা রঙ্গে অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে

গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন,—আর গঙ্গা ঘাটের যত লোক,— এই বালকটীর দিকে অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন।

তিনি দেখিতে দেখিতে গঙ্গায় ঝাঁপিয়া পড়িলেন, মধ্য গঙ্গায় গিয়া সাঁতার কাটিতে লাগিলেন, তীরস্থ লোকেরা দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, কেহ কেহ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন, পাছে বা কি হয়; চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "অরে বালক, গঙ্গায় কুম্ভীর আছে, এখনি কুম্ভীরে ধরিবে, তোর কি ভয় নাই? মধ্য গঙ্গায় ডুবিয়া গেলে কে তোকে তুলিবে?" যিনি ভবসাগরে নিমজ্জিত লোকদিগকে উদ্ধার করেন, স্নেহমোহান্ধ লোকেরা তাঁহার নিমজ্জন ভয় করিয়া অধীর হইতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কাহারও কথায় কাণ না দিয়া ঃ—

সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে॥

নরনারীগণের ইচ্ছা,—নিমাই তীরে উঠেন। বাঞ্ছা-কল্পতরু তাঁহাদের মনের উদ্বেগ দূর করিবার জন্য তীরের দিকে আসিয়া হাত পা ছুড়িয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও এক উপদ্রব হইল ঃ—

জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দর-শরীর।
সভার গায়েতে লাগে চরণের নীর॥
সবে মানা করে তবু মানা নাহি মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে॥

কেবল এইটুকু করিয়াও তিনি নিবৃত্ত হইতেন না, কেহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন, নিমাই তাঁহার মুখে এক এক ছিটা জল দিয়া বলিতেছেন, "ওগো তুমি কার ধ্যান কর। এই দেখ না,—আমি স্বয়ংই তোমার সম্মুখে আসিয়াছি, একবার নয়ন মেলিয়া দেখ, আমি প্রত্যক্ষ নারায়ণ,—তোমার সম্মুখে।"

ধ্যানস্থ ব্রাহ্মণ বালকের কথা শুনিয়া অবাক্! বাস্তবিকই তাঁহার মনে হইল এই কনক-জ্যোতি শিশু বুঝি সূর্য্য-মণ্ডলের মধ্য হইতে অবতরণ করিয়া নয়ন-সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন,—কিন্তু বিষ্ণুমায়ায় আবার মোহিত হইয়া গেলেন। ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, তুমি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই। এই দেখ না যাচ্ছি তোমার বাপের কাছে;—মজা দেখাব এখন! খবরদার ফের এমন করো না।"

নিমাই ব্রাহ্মণের মুখে দিকে চাহিয়া একটুকু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অপর এক ব্রাহ্মণের পূজা শিবলিঙ্গ লইয়া দৌড়িলেন। ব্রাহ্মণ পাছে পাছে দৌড়িতে লাগিলেন, নিমাই বলিলেন, "এই যে স্বয়ং আমি এসেছি, আবার এ মূর্ত্তি পূজা কেন?" ব্রাহ্মণ দৌড়িয়াও বালককে খুঁজিয়া পাইলেন না, কিছুকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আবার খুঁজিতে লাগিলেন। এই যে তিনি এবার খুঁজিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার ক্রোধ বা দুঃখের ভাব ছিল না। তিনি এবার মনে করিতেছিলেন এই যে বালকটী আমার শিবলিঙ্গ কাড়িয়া লইল, এ বস্তুটী কি? বালক বলিল, "এই যে আমি স্বয়ং আসিয়াছি,—আবার এ মূর্ত্তি পূজা কেন?" আমি ধ্যানে

যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি "রজত-গিরি-নিভ" কিন্তু ইহার অঙ্গ-চ্ছটা কি মনোহর স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট,—দেহের মধ্য হইতে যেন চাঁদের কিরণের মত জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছিল। এই গঙ্গাঘাটে প্রতিদিন স্নান করিতে আসি, মানব শিশুরা কখনও এরূপ সাহস প্রকাশ করে নাই, এরূপ কথাও বলে নাই।"

ব্রাহ্মণ গঙ্গাঘাটে বসিয়া পড়িলেন, ধ্যানে বিভোর হইলেন। আবার তখন কোথা হইতে চঞ্চল বালক আসিয়া তাঁহার টিকি নাড়িয়া বলিলেন—"যোগি-বর, একবার চেয়ে দেখ, এই আবার এসেছি,—এবার ঠিক হয়েছে কিনা দেখ দেখি," ব্রাহ্মণ চাহিয়া দেখিলেন, মহাদেবের বেশে বৃষ আরোহণে ঠিক্ সেই বালকটী তাঁহার দৃষ্টির সমক্ষে উপস্থিত! এবার তাঁহার ত্রিনেত্র,—পরিধানে কীর্ত্তিবাস। ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; বালক তাঁহার টিকি ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন, বলিলেন,—'খবরদার, আর আমাকে তাড়া করিও না, তাহা হইলে আর কখনও দেখা দিব না।' এই বলিয়া বালক তখনই সহসা অন্তর্ধ্যান করিলেন। ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন নদীয়ার গঙ্গাঘাটে এতদিনে শিবপূজার ফল ফল ফলিল, স্বয়ং ভগবান্ বালকরূপে গঙ্গাতটে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন। আজ তাঁহার নয়ন ও জীবন সফল হইল। সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সে দিন হইতে আর অপর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

(৩)

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নদীয়ায় প্রকট হয়েন, সে সময়ে ও নদীয়ার গঙ্গাতটে শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা হইত। ব্রাহ্মণগণ পুষ্প তুলসী, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, চন্দন, নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার সজ্জা লইয়া গঙ্গাতটে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে কেহ বা শিবপূজা, কেহ বা বিষ্ণুপূজা, আর কেহ বা গঙ্গাপূজা করিতেন। বালস্বভাবসুলভ চঞ্চলতার মধ্যে চঞ্চল নিমাইর একটা ঝোঁক্ গঙ্গাঘাটে কিছু বাড়া-বাড়ি মাত্রায় পরিলক্ষিত হইত। তিনি দেব-পূজকদের নিকট বেশী বেশী ঘেষিতেন। শিবপূজককে তিনি যেরূপ ভাবে কৃপা করিয়াছিলেন, পাঠকগণ সে বিবরণ শুনিতে পাইয়াছেন।

এখন আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন এক জন ব্রাহ্মণ গঙ্গাতটে বিষ্ণু-পূজার দূর্ব্বা তুলসী পুষ্প চন্দন নৈবেদ্য ও বিষ্ণুর আসন রাখিয়া গঙ্গায় অবগাহন করিয়া তীরে উঠিতেছেন,—চাহিয়া দেখেন এই অবসরে চঞ্চল বালক তাঁহার আনীত বিষ্ণুর আসনে বসিয়া বিষ্ণু-নৈবেদ্য ভোজন করিতেছেন। অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত,—সেই ধূলিমাখা দেহ চন্দনে চর্চ্চিত হইয়াছে, কপালে চন্দনের তিলক, মাথায় সুনীল কৃষ্ণকেশরাশি,—উহা ফুলসাজে সজ্জিত,—মুখে মৃদুহাসি, আর বিষ্ণু-নৈবেদ্যের গ্রাস। ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া তীরে উঠিলেন, চক্ষু কটমট করিয়া নিমাইর প্রতি তাকাইলেন, দুই এক কথা বলিতে না বলিতেই নিমাই তাঁহার নৈবেদ্যের থালা ফেলিয়া দিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া এক দৌড়ে পলায়ন করিলেন। আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

ব্রাহ্মণ ক্রোধভরে তটে উঠিলেন, তিনি ক্রোধ-কম্পিতস্বরে নিমাইয়েব প্রতি তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া কি বলিতেছিলেন, কিন্তু নিমাই যখন ছুটিয়া পলাইলেন, তখন সহসা ব্রাহ্মণের ক্রোধের বিরাম হইল, কিন্তু কি দিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেন, মনে সেই ভাবনা উঠিল, আর এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নিমাইর সেই লাবণ্যময় সৌন্দর্য্যমাখা মুখখানির কথা ব্রাহ্মণের মনে পড়িতে লাগিল।

নিমাই দৌড়িয়া পালাইলেন বটে, কিন্তু কি-যেন-কি এক ভাল-বাসার ভাব ব্রাহ্মণের হৃদয়ে রাখিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধ ভুলিয়া বিষ্ণু-পূজার কথা ভুলিয়া নিমাইর মুখখানি ভাবিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, আমার ক্রোধ দেখিয়া বালকটী দৌড়িয়া পালাইল, কিন্তু উহার মুখখানি কি সুন্দর, মাথার চুলগুলি অযত্ন ভাবে কপালের উপর দিয়া চক্ষু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, আর সেই ঘনকৃষ্ণনিবিড় চুলগুলির মধ্য দিয়া চঞ্চল বালক কমলের ন্যায় দুইটী চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে কেমন হাসিমাখা চাহনিতে তাকাইতেছিল। দেহের এমন রং,—চোখের এমন চাহনি,—মাথার এমন চুল, আর এমন লাবণ্যমাখা অঙ্গ-গঠন—আর তো কোথাও দেখি নাই। এমন সৌন্দর্য্য কি এ জগতে সম্ভব? বালক যদি আমার সাজসজ্জ নষ্ট না করিত, তাহা হইলে উহাকে আমি কত ভালবাসিতাম। বালকের বুদ্ধি দেখ, ধূলি ধূসরিত দেহে চন্দন মাখিয়াছে, আবার কপালে কেমন সুন্দর চন্দন-তিলক পড়িয়াছে। দেহখানি ধূলিমাখা বটে, কিন্তু অসাধারণ জ্যোতিঃ!"

ব্রাহ্মণ গঙ্গাঘাট ভুলিলেন, পূজা ভুলিলেন, গঙ্গাতটের অসংখ্য

লোক-সংঘট্টের কথা ভুলিলেন, তাঁহার মন গৌর-রূপে ডুবিয়া গেল, তিনি স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া পড়িলেন, দেহ নিস্পন্দ হইয়া গেল, কেবল গৌর-রূপ তাঁহার মর্ম্মের অন্তস্তলে জাগিয়া রহিল। তাঁহার দেহ পুলকে পরিপূরিত হইল, নয়ন-কোণে জলধারা বহিতে লাগিল।

এই অবস্থায় তিনি বুঝিতে পারিলেন, কে যেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাথায় ফুল গুজিয়া দিতেছে, সহসা নয়ন মেলিলেন,—ব্রাহ্মণ অমনি হাত বাড়াইয়া চঞ্চল বালককে ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইবেন বলিয়া বাসনা করিলেন, কিন্তু উহা বাসনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। তথনই বালকের অন্তর্ধ্যান! আর তিনি উহাকে দেখিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণের হৃদয়ে সহসা এক পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

তিনি এই দিন হইতে ভক্তিসহকারে গৌরগোপাল রূপের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, প্রত্যেক দিন এই সময়ে গঙ্গাঘাটে আসিয়া বালকের প্রতীক্ষা করিতেন, কিন্তু আর উহাকে দেখিতে পাইতেন না। ভাল ফুল, ভাল নৈবেদ্য, ভাল আসন লইয়া আসিতেন, গঙ্গাতটে পূজার সজ্জ রাখিয়া আনমনা ভাবে গঙ্গায় অবগাহন করিতেন, দীর্ঘকাল গঙ্গায় দেহ নিমজ্জিত করিয়া চঞ্চল বালকের প্রতীক্ষা করিতেন, তীরে উঠিয়া দেখিতেন, যেথানকার ফুল সেথানেই আছে, যেথানকার চন্দন সেথানেই রহিয়াছে, তাঁহার পূজার নৈবেদ্যে আর সে চম্পককলি-অঙ্গুলীর স্পর্শপাত হয় নাই। ব্রাহ্মণ অঝোর নয়নে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গৌর-গোপালের পূজা করিতেন। হয়ত তাঁহার পার্শ্বের লোকেরাই চঞ্চল বালকের অত্যাচারে কথা বলাবলি করিতেন, কিন্তু সে মূর্ত্তি আর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত

না। কিন্তু ব্রাহ্মণ তন্ময় হইয়া এই চঞ্চল বালকের রূপ চিন্তা করিতে করিতে গঙ্গাঘাটে বিষ্ণুপূজা সম্পন্ন করিতেন। গঙ্গাঘাটে এই এক নূতন ধরণের বিষ্ণু-পূজা দেখিয়া অন্যান্য উপাসকগণের কেহ কেহ উপহাস করিতেন, কেহ কেহ বিস্মিত হইতেন, কাহারও মনে হইত,—ব্রাহ্মণ পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন।

চঞ্চল বালক নিমাইর শুভ-উদয়ে গঙ্গা-ঘাটে এই নূতন ধরণের উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাণের প্রাণকে কিরূপ প্রাণের ভালবাসা দিয়া, নয়নের জল দিয়া পূজা করিতে হয়, নবদ্বীপের গঙ্গাতটের কর্ম্মী উপাসকদের মধ্যে কাহার কাহারও ভাগ্যে এই অনুরাগময়ী নব সাধনার সঞ্চার লক্ষিত হইত।

(৪)

গঙ্গাঘাটে শ্রীশ্রীনিমাইচাঁদের লীলা অতি মধুময়ী। এক নিমাই-চাঁদই কতিপয় বৎসর নদীয়ার-জাহ্নবী তটখানিকে স্নানের বেলায় আনন্দ কোলাহলময় করিয়া তুলিতেন। "ঐ এলো",—"ঐ নিল",—"ঐ গেল",—"ধর্ ধর্"—"যাঃ—ঐ চ'লে গেল"—শ্রীজগন্নাথমিশ্রের স্নানের ঘাটে স্নানের বেলায় কেবল এইরূপ রব শুনা যাইত। কেবল এক নিমাইচাঁদই এই আনন্দ-কোলাহলের কারণ হইয়াছিলেন।

গঙ্গাঘাটে ধূলিধূসরিত নিমাইর ছবি, ভজননিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তের ধ্যানের বিষয়,—আস্বাদনের বিষয়। সে চিত্র আমরা আঁকিতে অসমর্থ। মাথায় ঘনকৃষ্ণ সুনীল কুন্তলরাশি—মসৃণ কেশদাম কপালের উপর দিয়া মুখ পর্য্যন্ত দুলিয়া পড়িয়াছে, কেশরাশির

মধ্য দিয়া চঞ্চল, উজ্জ্বল, দুষ্টামি ও হাসিমাখা পদ্মপলাশ-লোচনের স্নিগ্ধ কিরণ যেন সম্মুখের দিকে বাঁকাভাবে লতাইয়া পড়িতেছে। পক্কবিম্বের ন্যায় মসৃণ লোহিতরাগরঞ্জিত ছোট ছোট দুখানি পাতল ওষ্ঠের মধ্য দিয়া শুভ্র কুন্দপাতির ন্যায় দন্ত হাসির সহিত বিকশিত। সুঠাম সুকোমল আয়ত কনক গৌরদেহ ধূলিতে ও লিখন-কালিবিন্দুতে সুশোভিত।

পাঠক, আপনি কি চাঁপাফুলে ভ্রমর লাগার শোভা দেখিয়াছেন? না দেখিয়া থাকেন তো একবার কল্পনা নয়নে দেখুন। তাহার পরে এই কনকচাপাবরণ নিমাইর শ্রীঅঙ্গে লিখন-কালির বিন্দুপাতে শোভার কথা মনে করুন। তাহা হইলে গঙ্গাঘাটে কি বেশে আমাদের নিমাইচাঁদ পদার্পণ করিতেন, তাহার আভাস বুঝিতে পারিবেন।

নিমাইচাঁদ গঙ্গাঘাটে জলে অবগাহন করিয়া জলক্রীড়া করিতেন, বয়স্যদের সঙ্গে কত রঙ্গ করিতেন, স্নানার্থীদিগকে লইয়া কত কৌতুক করিতেন, পরিচিত অপরিচিতের কথা তাঁহার বিচারেই আসিত না। কৌতুকী নিমাই যাহাকে পাইতেন, তাহাকে লইয়াই কৌতুক করিতেন। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমার নিকটে প্রতিদিনই দফায় দফায় নালিশ রুজু হইত। চার্জের রকম এইরূপ :—

শুন শুন ওহে মিশ্র পরমবান্ধব।
তোমার পুত্রের অন্যায় কহিব সব॥

ভাল মতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥
আরো বলে 'কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে নারায়ণ মুঞি পরতেখ॥'

নিমাইচাঁদ কৌতুকচ্ছলে ঠিক কথাই বলিতেন, ভাগ্যবানেরা বুঝিতেন, অভাগিয়ারা বুঝিত না। যাঁহারা বুঝিতেন তাঁহারা গঙ্গাস্নানের ফল হাতে হাতে পাইলেন বলিয়া মনে করিতেন।

কেহ বলিতেন, মিশ্র তোমার পুত্র আমার শিবলিঙ্গ লইয়া পলাইয়াছে, কেহ বলিতেন, আমি উত্তরীয় রাখিয়া স্নান করিতে জলে নামিয়াছিলাম, ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, তোমার পুত্র আমার উত্তরী লইয়া উধাও দৌড়িয়া ছুটিয়াছে।

কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লইঞা যায় চরণ ধরিয়া॥
কেহ বলে আমার না রহে সাজি-ধুতি।
কেহ বলে লয়ে গেছে মোর গীতা পুঁথি॥
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
"মুইরে মহেশ" বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হইতে।
দেহ তাহার ভাল থাকিবে কেমতে॥

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী প্রায়শ এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাইতেন। মিশ্র তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গঙ্গাঘাটে পুত্রকে শাসন করিতে যাইতেন, কিন্তু নিমাইকে সেখানে দেখিতে পাইতেন না। নরনারীগণ আসিয়া বলিতেন, "তোমাদের নিমাই গঙ্গাঘাটে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, লোকের গায়ে কুলকুচি দিতেছে, জল ছিটাইয়া অনর্থ করিতেছে, লোকে কত কথা বলিতেছে। অগাধ জলে পড়িয়া যে ডুবিয়া মরিবে, সে ভয়ও তাহার নাই। কেহ কিছু বলিতে গেলে, তাহাকে বিদ্রূপ করে, আরও অগাধ জলে সাঁতার দিয়া যায়। এখনও সে গঙ্গায় ঝাঁপাঝাপি খেলিতেছে। কত বলিলাম—কিছুতেই উঠিল না,—গেলেই দেখিতে পাবে, এখন।"

মিশ্র জগন্নাথ তাড়াতাড়ি গঙ্গাঘাটে গেলেন, এঘাটে সেঘাটে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না, বাড়ীতে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, পুত্র ঘরেই আছে। স্নানের কোনও চিহ্ন নাই, দেহ ধূলিধূসরিত, তাহাতে লিখন-কালির দাগ যথা :—

আর পথে গেলা ঘরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাতেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর॥
লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর-অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে॥

নিমাই যেন টোল হইতে ফিরিরা ঘরে আসিলেন। তাঁহার হাতে পুঁথি, কনকগৌরদেহে লিখন-কালির বিন্দু,—চাঁপাফুলের উপর ভ্রমরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। নিমাই বাড়ীতে আসিয়া

বলিলেন—"মা তেল দাও, স্নান করিতে যাই।" শচী ও মিশ্র নিমাইকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যথা :—

তৈল দিয়া শচীদেবী গণে মনে মনে।
বালিকারা কি বলিল কিবা বিপ্রগণে॥
লিখন-কালির বিন্দু আছে সর্ব্ব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান, সেই পুঁথি সঙ্গে॥
মিশ্র দেখে সর্ব্ব অঙ্গে ধুলায় ব্যাপিত।
স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইল বিস্মিত॥

বিংশ শতাব্দীর স্থূলদর্শী পাঠকগণের নিকট এই কথাগুলি যেন কেমন-কেমন বোধ হইবে, তাহা আমরা বুঝি। যাঁহাদের নিকট এই সকল কথা কাল্পনিক বলিয়া মনে হইবে, তাঁহাদিগকে আমরা নিন্দা করিতে পারি না। কেন না, যাঁহারা ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের প্রভাব বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহারা স্বাভাবিক স্থূল বুদ্ধিতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিতে পায়, তাহাই যথেষ্ট। জ্ঞানের উন্মেষেই লোকে সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গণ যে সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ, শিশু অর্ব্বাচীন, অশিক্ষিত বা অসভ্যেরা তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে না। যাহা আমার তোমার জ্ঞানের অগোচর, জ্যোতির্ব্বিদ্, রসায়নতত্ত্ববিদ্ ও আত্মতত্ত্ব-বিদ্ প্রভৃতি তাহা অনায়াসে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পান। অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য শ্রীভগবানের পক্ষে এইরূপ অদ্ভুত লীলা অবশ্যই সম্ভবপর, এবং তাঁহাতে এই সকল অলৌকিক লীলা দেখিয়াই মনীষীগণ তাঁহাকে প্রথম হইতেই শ্রীভগবান বলিয়া বুঝিয়া লইয়া ছিলেন।

দুইটী ভাই।

নিমাইর এই বাল্য-চাঞ্চল্যের মধ্যে সততই এক অলৌকিক ভাব পরিলক্ষিত হইত। অনেকেই সময়ে সময়ে সে ভাব লক্ষ্য করিতেন। কিন্তু নিমাইর দাদা বিশ্বরূপ এই ভাবটি অধিকতর লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থে লিখিত আছে :—

অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীতি।
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত॥
"এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রীবাল গোপাল॥
যত অমানুষ কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি খেলেন কৃষ্ণ ইঁহার শরীরে॥"

বিশ্বরূপের পক্ষে এই ভাবে অনুভব করার সবিশেষ কারণ ছিল। বিশ্বরূপ অলৌকিক ভক্তিভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তির দিব্য চক্ষু ভিন্ন ভগবানের ভাব দেখিবার বা বুঝিবার অন্য উপায় নাই। ভক্তির মূর্ত্তিমান্ অবতার,—বিশ্বরূপ তাই শৈশবেই অনুজকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে একবার বিশ্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। এখানে উঁহার কথা আরও কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে বলা যাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় বিশ্বরূপ অতি গূঢ় মহাপুরুষ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে :—

জগন্নাথ মিশ্রপত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল, জন্মি জন্মি মরে ॥
অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিল বিষ্ণুর চরণ ॥
তবে পুত্র জনমিলা "বিশ্বরূপ" নাম।
মহা-গুণবান্ তেঁহ, বলদেব ধাম ॥

ইঁহার জন্মের কত বৎসর পরে, নিমাই চাদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার ঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং বিশ্বরূপের জন্মের পরে হয়ত শচী দেবীর আরও দুই একটি সন্তান জন্মিয়া ছিলেন। বিশ্বরূপের পূর্ব্বে জাতা কন্যাদের ন্যায় তাঁহারাও হয়ত অল্প কয়েক দিন জীবিত ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামি-কৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পদে জানা যায়, শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী ঈশ্বরী সীতা-ঠাকুরাণী ডাকিনী শাখিনীর ভয়ে ইঁহার নিমাই নাম রাখিয়াছিলেন। যথা—

দুর্ব্বাধান্য দিয়ে শির্ষে কৈলা বহু আশীষে
"চিরজীবী হও দুই ভাই।"
ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ভয়ে নাম থুইল "নিমাই"।

কেহ কেহ মনে করেন, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিশ্বরূপের বয়স দশবৎসর। তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। নিমাইর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, বিশ্বরূপ তখন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের বৈষ্ণব সভায় কৃষ্ণভক্তি ব্যাখা করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে,

বৈরাগ্যে ও কৃষ্ণ-ভক্তিতে সকলেই বিমুগ্ধ হইতেন। তিনি আজন্ম সংসারে বিরক্ত ছিলেন; বিনয়, নম্রতা, ধীরতা, বিদ্যানুরাগ প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণের জন্য জন-সমাজে বিশ্বরূপের আদরের সীমা ছিল না। তিনি অতি অল্প বয়সে বহু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রের সাহায্যে তিনি বিষ্ণু ভক্তির সারবত্তা সকলকে বুঝাইয়া দিতেন, তাঁহার ভক্তিময়ী ব্যাখ্যা খণ্ডন করার শক্তি কাহারও ছিল না। তিনি কৃষ্ণ-কথা ভিন্ন অন্য কথা বলিতেন না,—অন্য কথা শুনিতেন না—কৃষ্ণ চিন্তা ভিন্ন মনেও অন্য চিন্তা স্থান দিতেন না। তাঁহার দেহ-মন-ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ-পদে সমর্পিত হইয়াছিল।

বিশ্বরূপ অতি প্রত্যুষে গঙ্গা স্নান করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় যাইতেন। অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুর নিবাসী হইলেও নবদ্বীপ সহরেও তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার বাড়ীতে ভক্তগণ সমবেত হইতেন। বিশ্বরূপ এখানে আসিয়া ভক্তগণ-সমীপে কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যাখ্যা করিতেন, আহারের সময় উতরিয়া যাইত, তথাপি তিনি বাড়ীতে ফিরিতেন না। শচীমাতা বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আনিবার জন্য নিমাইকে অদ্বৈত-সভায় পাঠাইতেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের সভাস্থ বৈষ্ণবগণ নিমাইর মুখে অমানুষিক অলৌকিক দেবভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেন। এমন কি তাঁহাদের কৃষ্ণ-কথা পর্য্যন্ত স্থগিত হইত। নিমাই অপরের নিকট অতীব চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন। কিন্তু দাদার নিকট অতি নিরীহ —যেন জগতে তেমন শিষ্ট শান্ত বালক আর দুইটী নাই। নিমাই অদ্বৈত-সভায় ধীরে ধীরে দাদার নিকট যাইয়া তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া

বলিতেন "দাদা, এখন বাড়ী চল, মা ডেকেছে, খেয়ে আবার এস এখন,—মা তোমার জন্য ব'সে রয়েছে"।

এই বলিয়া দাদার কাপড় ধরিয়া দাদাকে টানিয়া লইয়া বাড়ীতে যাইতেন।

অদ্বৈতাচার্য্যও এই শিশুটীকে একরূপ চিনিয়া লইয়াছিলেন,—যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত-মহাশয়
প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়॥

দাদাকে ডাকিয়া লইবার উপলক্ষে নিমাই শৈশবেই বৈষ্ণব-গণকে দর্শন দিতেন। বিশ্বরূপের হৃদয়ে যদিও সংসারের প্রতি প্রবল বিরক্তি ছিল, কিন্তু মাতা পিতা ও ভ্রাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। বিশেষতঃ নিমাইর প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমাই ছিল না। কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও সংসার-বন্ধন ছিল না। শ্রীমন্মুরারি গুপ্ত মহাশয় একটি মাত্র পদ্যে বিশ্ব-রূপের অতি সমুজ্জ্বল চরিত্র ও ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছেন, সে পদ্যটি এই :—

শ্রীমচ্ছ্রীবিশ্বরূপঃ সকলগুণনিধিঃ ষোড়াশাব্দোঽতিশুদ্ধঃ।
প্রাপাচার্য্যত্বমাত্মশ্রবণ-মননতঃ শক্তধীঃ প্রেমভক্তঃ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদাঽসৌ নর-হরি-চরণাসক্তচিত্তোঽতিহৃষ্টঃ।
শান্তঃ সন্তোষযুক্তো জগতি ন মতিমান্ বেদবেত্তা রসজ্ঞঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমৎ-বিশ্বরূপ সকল গুণনিধি। উঁহার বয়স্ ষোড়শ বৎসর। আত্মতত্ত্ব-শ্রবণ-মনন দ্বারা ইনি এই বয়সেই আচার্য্য-পদ

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার বয়ঃস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য ছিল না। বিশুদ্ধচিত্ত, সর্ব্বজ্ঞ, হরিচরণাসক্ত, হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, সুশান্ত, বেদজ্ঞ, বেদবেত্তা, প্রেমভক্ত ও রসজ্ঞ বিশ্বরূপের বিন্দুমাত্রও সংসারে আসক্তি ছিল না।

মিশ্র মহাশয় ও শচীদেবী ষোড়শবর্ষে বিশ্বরূপের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনিবেন বলিয়া মনে করিলেন, বিবাহের প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু, হায়, এই শুভবিবাহ-প্রস্তাব বিষময় ফলে পরিণত হইল।

বিশ্বরূপের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিবাহের কথা শুনিয়া তাঁহার সংসার-বিরক্তির মাত্রা এত অধিক হইয়া উঠিল, যে তিনি সহসা এক দিবস প্রত্যূষে গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসার্থ বহির্গত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।

জগন্নাথের সুখের ঘরে সহসা নিদারুণ শোকের ভীষণ অনল জ্বলিয়া উঠিল, অদ্বৈতাচার্য্যের সভা শোকের বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল,—চারিদিকে শোকাশ্রুর অবিরাম ধারা বহিতে লাগিল,—দীর্ঘ নিঃশ্বাসের বিরাম নাই—সর্ব্বত্রই এক কথা—"হায় বিশ্বরূপ কোথা গেল।" কিন্তু উপায় নাই। বৃদ্ধ পিতা মাতা শোক-বিহ্বল হইলেন, বন্ধুবান্ধবগণ সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "মিশ্র, আপনি দুঃখ করিবেন না,—আপনার পুত্র সন্ন্যাস করিয়াছে

ইহা অতি ভাগ্যের কথা। যাঁহার গোষ্ঠীতে কোন ব্যক্তি সন্ন্যাস করেন, সেই বংশের ত্রিকোটিকুলের বৈকুণ্ঠে বাস হয়। ইহা অপেক্ষা মঙ্গলের কথা আর কি হইতে পারে।"

এই সান্ত্বনায় কি অমন গুণনিধান পুত্রের বিরহ-শোক শান্ত হয়? বৃদ্ধ মিশ্র ও শচীদেবী যদিও শোক-বিহ্বল হইলেন, তথাপি সন্ন্যাসগ্রহণার্থী পুত্রকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার বাসনা আর তাঁহাদের মনে স্থান পাইল না। মিশ্র মহাশয় বিধাতার নিকট সন্ন্যাসার্থী পুত্রের সন্ন্যাস-প্রসক্তিরই প্রার্থনা করিলেন,—যথা শ্রীচৈতন্য-চরিত কাব্যে :—

অযং বয়োনূতনমেব সংশ্রিতো।
বতাধিশিশ্রায় যতিত্বমেব যৎ।
তদা বিধাতঃ করুণা বিধীয়তাং
সদাত্র ধর্ম্মে নিরতোভবেদ্‌যথা।

জগন্নাথ শোকবিহ্বল চিত্তে ভগবানের নিকটে বলিলেন—"হে বিধাতঃ এই বালক অতি অল্পবয়সে কঠোর যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, তুমি দয়া করিয়া ইহার ধর্ম্মে মতি রাখিও।"

মিশ্র প্রকৃত পক্ষেই মহাপুরুষ, তাহা না হইলে কি স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণ দেশে পাণ্ডুরপুরে উপস্থিত হয়েন। এই তীর্থেই তিনি দেহ রক্ষা করেন। কতিপয় বৎসর পরে সন্ন্যাসগ্রহণান্তর গৌরাঙ্গসুন্দর যখন

এই তীর্থে পদার্পণ করেন, তখন কথা-প্রসঙ্গে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

এদিকে শোকবিহ্বলা জনক-জননীর রোদনে নিমাই বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার স্নেহের অগ্রজ সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য চির দিনের তরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আর তিনি বাড়ীতে ফিরিবেন না, আর তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না, আর তিনি তাঁহাকে অদ্বৈত-সভা হইতে কাপড় ধরিয়া টানিয়া বাড়ীতে আনিবেন না। তাঁহার চাঞ্চল্যের জন্য সকলেই তাঁহাকে শাসন করিতেন, কিন্তু তাঁহার দাদা তাঁহাকে একদিনের জন্যও একটি কটু কথা বলেন নাই, তিনি কত মিষ্ট কথায় তাঁহাকে বুঝাইতেন কত ভালবাসিতেন, দাদার সেই স্নেহমাখা কথা আর তিনি শুনিতে পাইবেন না। এইরূপ ভাবের প্রবাহে নিমাইর হৃদয়ে সহসা ভীষণ শোকের নিদারুণ আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নিমাই দাদার জন্য কান্দিতে কান্দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ পিতা-মাতা দেখিলেন,—এ আবার এক নূতন বিপদ্। তাঁহারা বিশ্বরূপের বিরহ-শোকে চাপা দিয়া নিমাইকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বরূপের জন্য একটিবার হাহাকার করার অবসর নাই, একবিন্দু চোখের জল ফেলিবার উপায় নাই একটুকু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিবার ও যো নাই,—অমনি নিমাই তাহাতে ব্যাকুল ও অধীর হইয়া পড়েন।

দাদার বিরহে নিমাই একটু আনমনা হইয়া পড়িলেন, চাঞ্চল্য অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। পিতামাতা বিশ্বরূপের

শোক মনে চাপা দিয়া নিমাইকে প্রফুল্ল রাখার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিতে লাগিলেন। নিমাইও সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকটে থাকিতেন, বলিতেন, "তোমাদের চিন্তা কি? দাদা গিয়াছেন, আমিত আছি। আমিই তোমাদের প্রতিপালন করিব।"

নিমাই খেলা ছাড়িয়া পড়ায় মন দিলেন। শক্তিময় চিত্ত যখন যে দিকে আকৃষ্ট হয়, তখন তাহাতেই মাতিয়া পড়ে। নিমাই সর্ব্বশক্তির আধার ঃ—

খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আর বার উলটিয়া সবারে ঠেকায়॥

অন্যান্য লোকেরা বলিতে লাগিলেন, মিশ্র আপনার ভাগ্যের সীমা নাই, কোথাও এমন প্রতিভাবান্ বালক দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে

তুমিতো কৃতার্থ মিশ্র এহেন নন্দনে।
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে॥
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে অধ্যয়নে।
শুনিলেই সর্ব্বঅর্থ আপনে বাখানে।
তান্ ফাকি বাখানিতে নারে কোনজনে॥

কিন্তু মিশ্র মহাশয় এসকল কথা শুনিয়া বিন্দুমাত্রও সুখী হইতেন না। বিশ্বরূপের কথা তাঁহার মনে হইত,—বিশ্বরূপ

শাস্ত্র পড়িয়া সংসারের মায়া কাটাইল, নিমাই যদি পণ্ডিত হয়,—সে কি আর ঘরে থাকিবে?

এই আশঙ্কা করিয়া জগন্নাথ নিমাইর পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। শচীদেবী ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন "এ কি কথা, পুত্রকে মূর্খ করা হইবে কেন? খাবে কি করিয়া?" মিশ্র বলিলেন, "সে ভাবনায় ফল কি? কৃষ্ণ যাহা করেন তাহাই হইবে।"

কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্ববল॥
"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিত-গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ॥"
অনায়াসে মরণ,—জীবন দৈন্য বিনে
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যাধনে॥
কৃষ্ণ কৃপাবিনা নহে দুঃখের মোচন।
থাকিলে বা বিদ্যা কুল, কোটি কোটি ধন॥
যার গৃহে আছয়ে সকল উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন এক রোগ॥
কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পুড়ি মরে।
যার নাহি—তাহা হইতে দুঃখী বলি তারে॥

এই সকল যুক্তি দিয়া মিশ্র শচীদেবীকে একবার নীরব করিলেন; নিমাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার দিব্যি, আজ হইতে পাঠ বন্ধ কর। আর পড়ার প্রয়োজন নাই।"

এই দিন হইতে নিমাইর লেখাপড়া বন্ধ হইল। নিমাই পিতৃআদেশ-পালন করিলেন বটে, কিন্তু পাঠ-ত্যাগের জন্য মর্ম্মে মর্ম্মে দুঃখিত হইলেন। তাঁহার শক্তিশালি চিত্ত পাঠে ব্যাপৃত থাকিত, কিন্তু এখন আর পাঠ নাই। আবার চাঞ্চল্য ও দুষ্টামি প্রবল হইয়া উঠিল—ঘরে বাহিরে ও গঙ্গাতীরে সর্ব্বত্রই আবার নূতন উদ্যমে নিমাইর উপদ্রব আরম্ভ হইল। জগন্নাথ ইহাতে কিছু বলিতেন না। কিন্তু এই উপদ্রব ও অত্যাচারের কথা লইয়া শচীমাতা নিমাইকে কিছু বলিলে নিমাই উত্তর করিতেন "মূর্খের যে কাজ,—আমি তাই করি,—আমার অপরাধ কি? আমায় পড়িতে দাওনা কেন?"

মিশ্র মহাশয়কে সকলেই ওলাহন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি আশঙ্কা করেন কেন, কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম্ম। ছেলেটী পড়িতে চায়; আপনি বাধা দিবেন না।"

মিশ্র মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। নিমাই আবার পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার লেখা পড়ায় একটা বিশেষ ভাব দৃষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে তিনি আপন মনে বহুবার "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এইরূপ নাম পাঠ করিতেন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন "নিমাই এ পাঠ কোথায়?" নিমাই গম্ভীর ভাবে উত্তর করিতেন,— "সর্ব্বত্রই"—তিনি পাতা ভরিয়া লিখিতেন :—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥

উপনয়ন ও অধ্যয়ন।

নিমাই নবম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। যজ্ঞসূত্রের উপযুক্ত সময় হইল। মিশ্র মহাশয় অতি সমারোহের সহিত নিমাইর যজ্ঞোপবীতের আয়োজন করিলেন। শুভক্ষণে যজ্ঞোপবীতের বৈদিক কার্য্য আরম্ভ হইল। নিমাইর মস্তক মুণ্ডিত হইল, পরিস্নাত কলধৌত-কনক-কান্তি যেন ব্রহ্মতেজে অধিকতর সমুজ্জল হইয়া উঠিল,—গলদেশে কৃষ্ণাজিনসহ যজ্ঞসূত্র ও মেখলা,—হস্তে বৈণব ও বিল্বদণ্ড, নয়নযুগল সমুজ্জ্বল,—মুখমণ্ডল জ্যোতিষ্মান ও লাবণ্যপূর্ণ,—পরিধানে রবি-রাগ-রঞ্জিত অরুণ বসন,—যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান তরুণ-ব্রহ্মচর্য্য নিরুপম রূপে যজ্ঞস্থলে সমাগত,—যেন সাক্ষাৎ বামনদেব যজ্ঞালয়ে উপনীত। জগন্নাথ, নিমাইর কর্ণে সাবিত্রীমন্ত্র প্রদান করামাত্রই নিমাই কি-যেন-কি এক গূঢ়-গভীর ভাবাবেশে অবশ হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই আবিষ্টের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইলেন। অনেক যত্নে তাঁহার চেতনা হইল। যদিও আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল, কিন্তু শচীদেবী ও মিশ্র মহাশয় এই ব্যাপারে নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন।

উপনয়নের পরে মিশ্র মহাশয় তাঁহার শিক্ষার জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যাকরণ পাঠ প্রথম প্রয়োজনীয়। এই সময়ে নবদ্বীপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ন্যায় বৈয়াকরণ অতি অল্পই ছিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর-দেবের অধ্যয়ন-রুচি বাড়িতে লাগিল।

তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতমহোদয়কেই ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদে মনে মনে বরণ করিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের নিকট আকারে ইঙ্গিতে এই ভাব প্রকাশ করায় তিনি অবিলম্বে তাঁহার টোলে স্বীয় বালককে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ঃ—

নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যেহেন সান্দীপনি॥
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁহার ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত॥
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস বিপ্রঘর॥
শিষ্য দেখি পরম আনন্দে গঙ্গাদাস।
পুত্র প্রায় করিয়া রাখিলা নিজ পাশ॥

গঙ্গাদাসের টোলে বিশ্বম্ভর অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগিলেন। গঙ্গাদাসের মুখ হইতে কোন ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই বিশ্বম্ভর উৎফুল্লভাবে বলেন, "ঠিক্ হয়েছে—বুঝেছি। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় একটুকু দোষ আছে, তাহা এইরূপ" এই বলিয়া তাঁহার স্বীয় উক্তি সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক নিমাইর উক্তি ও যুক্তি শুনিয়া নিরুত্তর হইয়া পড়েন। নিমাই গুরুর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। গঙ্গাদাস এই ব্যাপারে একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি সহস্র সহস্র ছাত্র পড়াইয়াছেন, ব্যাকরণে তাঁহার ব্যাখ্যায় দোষ দিতে পারে,—তিনি এ পর্য্যন্ত এমন কাহাকেও দেখিতে

পান নাই। কিন্তু মিশ্রনন্দন পাঠারম্ভেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক মহাশয় নিমাইর অমানুষিক শক্তির পরিচয় পাইয়া মনে মনে বুঝিলেন, যে ইনি নরবেশে স্বয়ং ভগবান্ নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে লিখিত আছে:—

যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন॥
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন॥
সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জনে।
হেন কারো শক্তি নাহি দিবার দূষণে॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব শিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥

যিনি বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভায় শিক্ষা-গুরুকেই বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সহপাঠিগণ যে তাঁহার বিচারে কি প্রকারে বিচলিত হইতেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

বিদ্যালোচনার তরঙ্গ সিন্ধুর তরঙ্গের ন্যায় নিরন্তর নিমাইর হৃদয়ে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। যেখানে-সেখানে যাহার তাহার সহিত তিনি বিদ্যাকলহে প্রবৃত্ত হইতেন। গঙ্গাঘাটে গিয়াও তিনি কাহাকে এই বিদ্যাযুদ্ধে ছাড়িয়া দিতেন না। এক ঘাট হইতে অপর ঘাটে যাইয়া ছেলেদের সহিত শাস্ত্রকলহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন:—

পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এই মত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়॥
প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঞি ঠাঞি॥
প্রতি ঘাটে ঘাটে যায় গঙ্গায় সাঁতারি।
এক ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি॥

বিশ্বম্ভর কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ করিতেন; গঙ্গাঘাটে এই কলাপ ব্যাকরণের বৃত্তিপঞ্জী ও টীকার বিচার লইয়া যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিতেন। ইহার উপর তিনি তাঁহার স্বকীয় প্রতিভারও যথেষ্ট পরিচয় দিয়া উচ্চ শ্রেণীর পড়ুয়াগণকে বিস্মিত করিয়া ফেলিতেন। যথা :—

যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
তারা বোলে কলহ করহ কি কারণ॥
জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কোন বুদ্ধি।
বৃত্তি পঞ্জী টীকার কে জানে দেখি শুদ্ধি॥"

বিশ্বম্ভর বলিলেন, "অপরের বৃত্তি টীকা পঞ্জীর প্রয়োজন কি? দেখ না আমি নিজেই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি।" তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ স্তম্ভিত হইলেন, বলিলেন "তোমার ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা আর কখনও শুনি নাই।"

গঙ্গাঘাটে পণ্ডিত ও ছাত্রগণ অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের

দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুখখানি হাসিমাখা, কথাগুলি মধুর, ভাষা বালকের ন্যায় সরল, কিন্তু ভাব অতি গম্ভীর।

বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন, "এই ব্যাখ্যাকেই তোমরা ভাল বলিতেছ? এযে কিছুই হয় নাই, উহাতে কত দোষ আছে,"—এই বলিয়া গভীর পাণ্ডিত্য সহকারে নিজের ব্যাখ্যা নিজেই খণ্ডন করিতে লাগিলেন। বিস্ময়ের পর বিস্ময় আসিয়া শ্রোতা পণ্ডিত ও ছাত্রগণের হৃদয় জুড়িয়া বসিতে লাগিল! বিশ্বম্ভর বলিলেন, "আমার ব্যাখ্যা যে দূষিত হইয়াছে, বুঝিলে তো। তোমরা এখন উহার ভাল ব্যাখ্যা কর।"

একথা শুনিয়া সকলেই নীরব, একে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন, "যখন ব্যাখ্যা খণ্ডন করিলাম, তখন অগত্যা আমিই স্থাপনের জন্য দায়ী। তবে এইবার ভালরূপে সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছি, দেখদেখি কেমন হয়।" এই বলিয়া বালক হাসিতে হাসিতে গুরু-গম্ভীর ভাবে আবার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চারিদিকে অসংখ্য পণ্ডিত লোক দাঁড়াইয়া বালকের অদ্ভুত বিচার-শক্তি ও শাস্ত্র-জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বালকের নয়নে অপূর্ব্ব প্রতিভা বিস্ফারিত হইতেছিল, কপাল হইতে অদ্ভুত জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া দর্শক মাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল! অতি বৃদ্ধ পণ্ডিতগণও বলিতেছিলেন "গঙ্গাদাস পণ্ডিত অতি ধন্য। তাঁহার এ ছাত্রতো মানুষ নয়—এযে

সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। এই বয়সে ও এই পড়াতেই এই! এমন পণ্ডিত বোধ হয় সমগ্র নদীয়াতেও নেই।”

ব্যাখ্যা করিতে করিতেই নিমাইর বাল-স্বভাব-সুলভ চাঞ্চল্যের উদয় হইল, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে সহপাঠীদিগের চক্ষে জলের ঝাপটা মারিয়া ঝাপাইয়া গঙ্গায় পড়িলেন। শাস্ত্রযুদ্ধে যেমন তাঁহার সহিত সকলেই অপারগ ছিলেন, জলযুদ্ধেও সেইরূপ তাঁহার সহিত কেহ আটিয়া উঠিতে পারিত না। তিনি একক তাঁহা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক শত শত বালককে জল ছিটাইয়া পরাস্ত করিয়া দিতেন।

সন্তরণে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি অসাধারণ সন্তরণ-পটুতা প্রদর্শন করিতেন। গঙ্গায় তিনি এত বেগে সন্তরণ করিতেন, তাঁহার মুখের দিকে যাহারা তাকাইয়া থাকিত, তাহারা মনে করিত,—গঙ্গায় যেন শত শত সোণার কমল এক শ্রেণীতে ফুটিয়া চলিয়াছে। এইরূপ বহুবার তিনি গঙ্গার এক পার হইতে অপর পারে সাঁতার দিয়া যাইতেন। তাঁহার ন্যায় দ্রুত সন্তরণপটু আর কেহ ছিল না।

২

জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য এবং অধ্যয়ন-নিপুণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন, মনে করিতেন, শ্রীভগবান্ কি তাঁহার এই সৌভাগ্য বজায় রাখিবেন। তিনি কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতেন :—

আমি তোর দাস প্রভু যতেক আমার।
রাখিবা আপনি তুমি সকলি তোমার॥

ফলতঃ নিমাইর অধ্যয়ন-যত্ন ও অঙ্গ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার মনে সততই অশুভ চিন্তার উদয় হইত। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন ;—নিমাই শিখা-মুণ্ডন করিয়া কৌপীন পরিয়াছেন, তাঁহার প্রাণের ধন, সোণার গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর কৃষ্ণ-নামে উন্মত্ত হইয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্যাদি তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন, নিমাই বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া সকলের মস্তকে পদার্পণ করিতেছেন, তাঁহার চরণ পাইয়া সকলেই কৃতার্থ হইতেছেন। কোটি কোটি লোক লইয়া নিমাই নগরে নগরে নাচিয়া নাচিয়া হরিনাম-কীর্ত্তন করিতেছেন। কেবল মানুষ নয়—দেবতাগণও এই মহা-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া নিমাইর স্তুতি করিতেছেন :—

চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র বদন।
সভেই গায়েন জয় "শ্রীশচীনন্দন"॥
কতক্ষণে দেখি কোটি কোটি লোক লঞা।
নিমাই বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়া॥
লক্ষ কোটি লোক নিমাইর পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সবে হরিধ্বনি গায়॥

এই স্বপ্ন দেখিয়া মিশ্রের আশঙ্কা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল—এমন কি তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

দিবানিশি তাঁহার মনে কেবলই পুত্রের ভাবনা। এই দুশ্চিন্তায় তাঁহার আর স্বাস্থ্য রহিল না। একদিন সহসা জগন্নাথ মিশ্র

শ্রীনিমাইর মুখচন্দ্র দেখিতে দেখিতে নয়নজলে বদন ভাসাইয়া গোবিন্দ নাম করিতে করিতে শচীদেবী ও নিমাইকে রাখিয়া দেহ-ত্যাগ করিলেন।

পিতৃ-বিয়োগে শ্রীনিমাই অধীর হইয়া পড়িলেন, সেই নিদারুণ শোকে শচীদেবীর যে দশা হইল, তাহা বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র। তিনি নিমাইর মুখের দিকে চাহিয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিলেন। নিমাই বৃদ্ধা মাতাকে বলিতেন, "মা তোমার ভাবনা কি? আমি আছি। আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব।"

ব্রহ্মা মহেশ্বর যে দুর্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে॥

শচী আনন্দময় নিমাইর মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।

নিমাই আবার পাঠে মন দিলেন। তিনি পড়ুয়াদের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন, বিদ্যাযুদ্ধে জয়ী হইতেন, তাঁহার অলৌকিক প্রতিভায় সকলেই বিস্মিত হইত, কিন্তু গঙ্গাস্নানান্তে নিমাই আর কাহারও মুখপানে তাকাইতেন না; ভক্তিবিগলিতচিত্তে তিনি গঙ্গাঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন, আর গঙ্গাপূজা করিতেন, বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া বিষ্ণুপূজা করিতেন, তুলসী দেবীকে জল দিতেন, এবং ভোজন করিয়া পাঠগ্রন্থ লইয়া নির্জ্জনে বসিতেন, ব্যাকরণের সূত্র টিপ্পনী লিখিতেন, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

করি বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতুহলে॥

যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥
ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে॥
আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তক-রসে সর্ব্বদেবমণি॥

এইরূপে গৌরাঙ্গসুন্দর প্রতিদিন গঙ্গাপূজা করিতেন, বাড়ী হইতে গঙ্গাপূজার সাজসজ্জা লইয়া যাইতেন। কিন্তু একদিন ইহা লইয়া বড়ই গোল বাঁধিয়াছিল। ঘটনা এইরূপ ঃ—

শচীদেবী পিতৃহীন বালকটীকে লইয়া বৃদ্ধ বয়সে কোনরূপে দিনযাপন করিতেছেন. ভাবিতে বসিলে তাঁহার দুঃখের পার নাই। একে একে সকলগুলি জঠরের ধনই তাঁহার কোল শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র নিরুদ্দেশ। নারী জীবনের একমাত্র সম্বল,—পতি, তিনিও পরলোকে। পুত্র নিমাই চঞ্চল, একবারেই পাগলের মত। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, সংসারে এমন কেহ নাই। ঘরে নারায়ণ। পুত্রটী তাঁহাকে জল তুলসী দেয়, কোন প্রকারে উঁহার ভোগের আয়োজন করিয়া ভোগান্তে মাতা ও পুত্র প্রসাদ পান। ঘরে আর দ্বিতীয় লোক নাই। সাত্ত্বিক প্রকৃতি জগন্নাথ ধন-সঞ্চয় করেন নাই। কোন প্রকারে বৃদ্ধা দেবীর দিন গুজরাণ হইত। কিন্তু পুত্রটীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি সকল দুঃখ ভুলিতেন। নিমাই চখের আড়াল হইলেই শচী পলকে প্রলয় গণিতেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেন। আবার পুত্রের চাঁদমুখ

দেখিলেই তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভাসিয়া যাইত। বিষ্ণুখট্টায় নারায়ণ, এবং অঞ্চলের ধন,—অন্ধের নয়ন,—পুত্রটীকে লইয়া বৃদ্ধা শচীদেবী এক প্রকারে দিন অতিবাহিত করিতেন।

পিতৃহীন বালক সময়ে অসময়ে বুঝিয়া না বুঝিয়া, ঘরে কিছু থাকুক আর না থাকুক, এক এক সময়ে আব্দারের ঝোঁক তুলিতেন, তখন বৃদ্ধা মাতাকে কিরূপ বিব্রত হইতে হইত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু বৃদ্ধা মাতা তাহাতে ক্লেশ মনে করিতেন না। তিনি প্রফুল্লমনে সকল আব্দারই সহ্য করিতেন।

৩

একদিন নিমাই গঙ্গাস্নানে যাইবার সময়ে বলিলেন,—"মা আমি গঙ্গাপূজায় আজ সুগন্ধি ফুলের মালা ও সুগন্ধি চন্দন দিব। আমায় মালা চন্দন দাও।"

মা বলিলেন—"বাপ, একটু অপেক্ষা কর, আমি মালা আনিয়া দিচ্ছি।" এই অপেক্ষা আর সহিল না। নিমাই একবারেই রৌদ্র রসে মাতিয়া উঠিলেন, বলিলেন "তুমি এখন মালা আনতে যাইবে, আচ্ছা তবে দেখ।"

এই বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, প্রথমে গঙ্গাজলের হাড়িগুলিকে একে একে দুপ্‌দাপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিলেন, ঘর জলময় হইয়া উঠিল, ভাঙ্গা কানা সমস্ত ঘরে বিকীর্ণ হইয়া গেল। তারপরে হাতে এক ঠেঙ্গা লইয়া যে সকল পাত্রে তৈল ঘৃত ও লবণাদি দ্রব্য ছিল, একে একে সে সকল ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া

দিলেন, একটি মৃৎপাত্রও আস্ত রাখিলেন না। তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। চাউল, কার্পাস, ধান, লবণ, বড়ী মুদ্গ যেখানে যাহা ছিল, সকল ছড়াইয়া ফেলিলেন। অবশেষে শিকাগুলি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এমন কি পরিধেয় বস্ত্র-গুলিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

ইহার পরে দেখিলেন নষ্ট করার আর কিছু অবশিষ্ট নাই। তখন দুই হাতে ঠেঙ্গা লইয়া অচেতন গৃহখানির উপরে ক্রোধের বেগ দেখাইতে লাগিলেন। ইহাতেও ক্রোধের শান্তি হইল না, ঘরের বাহির হইয়া বৃক্ষগুলিকে দুই হাতে ঠেঙ্গা মারিতে মারিতে অবশেষে মাটির উপরে ঠেঙ্গার আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত ক্রোধের মধ্যেও ধর্ম্মসংস্থাপক নিমাই জননীকে কিছুই বলি-লেন না। বৃদ্ধ মাতা সশঙ্কচিত্তে দাঁড়াইয়া বালকের মহারুদ্রলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। কিন্তু মায়ের দিকে একটা অঙ্গুলিও উত্তোলিত হইল না। অবশেষে তিনি অঙ্গনে মাটিতে পড়িয়া গড়া-গড়ি দিতে লাগিলেন, এবং নিস্তব্ধ ভাবে নিদ্রিতের ন্যায় শান্তভাবে মাটিতে পড়িয়া রহিলেন।

শচীদেবী অতি ব্যস্তভাবে মালা আনাইয়া বলিলেন—"বাপ্, এই লও মালা,—এখন উঠ, গঙ্গা পূজা করগে বাপ্। দ্রব্যজাত ভেঙ্গেছ, বেশ করেছ, ওসব তোমার বালাই লইয়া যাউক।"

নিমাই উঠিলেন, লজ্জায় মায়ের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না। কিন্তু সে লজ্জা-মাখা ও ধুলিমাখা মুখখানি মৃদু মধুর হাসির কিরণে যে সুন্দর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, শচীদেবী তাহা

দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন—ইচ্ছা ছেলেটীকে একবার কোলে লইয়া চাঁদবদনে চুম্বন করেন, নিমাই মালা লইয়া সবেগে গঙ্গাঘাটের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তিনি মনের সাধে ভক্তিভরে সুন্দর মালায় গঙ্গাপূজা করিলেন, দুই হাত জুড়িয়া গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া নিমাই ঘরে ফিরিলেন। যখন নিমাই সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার এই গঙ্গাভক্তি হৃদয়ে জাগরুক ছিল। তিনি জননী ও জাহ্নবী দর্শন করার জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইতেন। তিনি আরও বলিতেন দারুব্রহ্ম ও দ্রবব্রহ্ম এই দুইই কলির জীবের নিস্তারের উপায়।

৪

কালিন্দীতটে যিনি রাখালগণের সহিত গোচারণ করিতেন, বাঁশী বাজাইতেন, খেলা করিয়া বেড়াইতেন, শিখিপুচ্ছের চুড়া মাথায় দিয়া বন্যফুলে ভূষিত হইতেন, ধরা পড়িতেন, আর বৈশ্য-সন্তানের প্রধান কার্য্য,—গো-রক্ষা করিতেন ; এখন সেই তিনি,—গঙ্গাতটে ব্রাহ্মণ কুমার, টোলের ছাত্র, বিদ্যারসে প্রমত্ত।

এখানে বৃন্দাবনের সে ধরণের উদ্দামভাব নাই, সেই দধি-ছানার দেশে, সেই সুকোমল কুসুমদামপূর্ণ লতাকুঞ্জের দেশে রাখাল সখাদের সাথে যে আনন্দ-লীলা হইত, নদীয়ায় সেই আনন্দ-উদ্দাম অন্যভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবদ্বীপ তখন বিবিধ বিদ্যার সমুজ্জ্বল কেন্দ্র। এখানকার গো-রক্ষকেরাও তখন হাতের পাচন ফেলিয়া রাখিয়া টোলের পাশে দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্যদের বিচার

শুনিতে প্রস্তুত থাকিত, বুঝুক আর না বুঝুক তাঁহাদের হাতনাড়া, মুখনাড়া ও টিকীনাড়া দেখিয়া এক প্রকার নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিত।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সকলেই তখন লেখাপড়া শিখিতেন। নবদ্বীপে পঠন-পাঠনের প্রচলন তখন অত্যন্ত বেশী ছিল। এই অবস্থায় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশ জন্মপরিগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনের গোপেন্দ্র-নন্দনকেও যে দেশে কালের উপযোগী অধ্যয়ন-শ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি ? কিন্তু প্রতিভাবান্ বালক কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার নহেন। বৃন্দাবনের বনে তিনি কেবল যে বেণু বাজাইয়া ধেনু লইয়া থাকিতেন, তাহা নহে। বৈশ্যরাজপুত গোপেন্দ্রনন্দন ধনু লইয়া দানব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন এবং বালক বয়সে কংস-প্রেরিত বহুল দৈত্যের প্রাণসংহার করিতেন। এখানে সেই সামরিক প্রবৃত্তি ও জিগীষা অপর আকার ধারণ করিয়াছিল।

শ্রীশচীনন্দন বিদ্যারসে প্রবৃত্ত হইয়া নিরন্তর প্রতিদ্বন্দী খুঁজিতে লাগিলেন, তাঁহার আটোপটঙ্কারে ছাত্র ও প্রবীণ অধ্যাপক-গণ ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থাকিতেন, পাছে বা নিমাইর নিকট বিদ্যা-বিচারে অপদস্থ হয়েন। এই ঘটনার ঈষৎ আভাস শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিম্নলিখিত পদ্যে বর্ণনা করিয়াছেন :—

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাত্রি দিনে বিদ্যারসে নাহি অবসর॥
উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্ব শিষ্যগণ সাথ॥

আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়॥

মহাপ্রভু বাল্যেও স্বীয় প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেন। তিনি যাঁহাদের জন্য আসিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাকে আনিয়াছেন, অবতারিত করিয়াছেন,—তাঁহারা তাঁহাকে চিনিয়া লউক—এই দয়া বাল্য হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা তাঁহার নিকট ব্যাখ্যাদি শ্রবণ না করিত, তিনি তাহাদিগকে অপ্রতিভ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন।

এই বিষয়ে মুরারি গুপ্ত তাঁহার অধিকতর অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই মুরারি গুপ্তই সর্ব্বপ্রথমে সুমধুর ভাষায় তাঁহার লীলাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। মুরারি গুপ্ত বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গের অনেক বড় ছিলেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গের পাঠারম্ভের বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু নিমাইচাঁদের ইচ্ছা, মুরারিকে তিনি কৃপা করিবেন, মুরারিকে আপন জন করিয়া লইবেন, মুরারিকে দাসানুদাস করিয়া শ্রীপাদ-পদ্মে স্থান দিবেন। কিন্তু মুরারি তাহা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই, নিমাই যে কি বস্তু মুরারির সে ধারণা তখনও জন্মে নাই। কিন্তু দয়াল প্রভু ভক্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন। অধ্যয়নকালেই তিনি মুরারিকে পাইয়া বসিলেন। মুরারি তাঁহার নিকট পাঠ বুঝিয়া লইতে আসেন না, আসিবেনই বা কেন,—তিনি গঙ্গাদাস আচার্য্যের টোলের প্রাচীন পড়ুয়া। নিমাইর জন্মের পূর্ব্ব হইতে

তিনি পড়িতেছেন, নিমাইর নিকট তিনি পাঠ জিজ্ঞাসিতে আসিবেন কেন? আত্ম-সম্ভ্রম-বোধ কাহারই বা না আছে?

একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নূতন পুরাতন সকল ছাত্রই উপস্থিত। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যোগপট্টছান্দে বস্ত্র বাঁধিয়া বীরাসন করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র। কপালে চন্দনের ঊর্দ্ধ তিলক, দন্তগুলি মুক্তার ন্যায় ঝক্‌ঝকে, সুন্দর নয়ন হইতে যেন প্রতিভার কিরণমালা প্রবাহিত হইতেছে। তিনি রাজাধিরাজের ন্যায় উপবিষ্ট; মুরারি গুপ্তও সেইখানে উপস্থিত। অপর অপর ছাত্রগণ উহার নিকট পাঠাদি বুঝিয়া লইলেন। মুরারি গুপ্ত নিজের পুঁথি হাতে লইয়া গভীর ভাবে একদিকে বসিয়া রহিয়াছেন, আর পাঠ চিন্তা করিতেছেন। তিনি আর কাহার নিকট পাঠ চিন্তিবেন? কেননা, তিনি এখানকার প্রবীণ ও প্রাচীন ছাত্র।

অন্তর্য্যামী প্রভু মুরারির অন্তরের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন :—

——ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥
সন্ধি কার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনি চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা॥
অহঙ্কার করি লোক ভাল মূর্খ হয়।
যেবা জানে তাঁর ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয়॥

মুরারি গুপ্ত প্রভুর প্রত্যেকটী বাক্য আপন মনে মন দিয়া শুনিলেন, কিন্তু কোনও কথার উত্তর না করিয়া নীরবে যেন গ্রন্থ-ছত্র দেখিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে:—

প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতাপাতা নিঞা আগে রোগী কর দড়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফপিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্তি তুমি কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দড় কর গিয়া॥

মুরারি গুপ্ত নবদ্বীপে তখন একজন সুশিক্ষিত ছাত্র। মুরারির প্রতিভায় ও বিদ্যাবত্তায় অন্যান্য ছাত্রগণ, এমন কি অধ্যাপকগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইতেন। বালক নিমাইর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মুরারি মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখেরদিকে চাহিয়া সে ক্রোধ রহিল না। তিনি তাঁহার নয়নে এক অমানুষিক প্রতিভা-জ্যোতি দেখিয়া মাথা তুলিয়া আবার অবনত হইলেন,—বলিলেন, "তুমি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই এরূপ বলিতেছ কেন, তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ,—কি আর বলিব ?"

তখন নিমাই ও মুরারিতে শাস্ত্রব্যাখ্যা হইতে লাগিল। মুরারি অতি পাণ্ডিত্য সহকারে তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দিতে লাগিলেন, নিমাই অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দেহে পদ্মহস্ত প্রদান

করিলেন, করস্পর্শে মুরারির দেহ আনন্দময় হইয়া উঠিল। মুরারি তাহাতে একবারে অভিভূত হইলেন, তখন বুঝিলেন—ইনি প্রকৃত মানুষ নহেন। সুতরাং ইঁহার নিকট পাঠব্যাখ্যা গ্রহণ করায় লজ্জার বিষয় নাই।

এরূপ শাস্ত্র বিচার করিতে করিতে প্রভু ও পড়ুয়াগণ স্নানার্থে জাহ্নবীতটে চলিলেন। প্রসন্নসলিলা ভগবতী ভাগীরথীর পুণ্যতটে আবার শাস্ত্রপর্য্যালোচনা আরম্ভ হইল। এবার মুরারি পড়ুয়া মাত্রকেই বুঝাইলেন যে, বালক শচীনন্দন মানুষ নহেন—স্বয়ং ভগবান্,—এখানে নররূপে **অবতীর্ণ**।

প্রবীণ মুরারির কথায় ছাত্র ও পণ্ডিতগণ মুগ্ধনেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিভা-সমুজ্জ্বল অনন্ত মাধুর্য্যের খনি,—মুখখানির দিকে স্তম্ভিত-ভাবে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভুবন-ভুলান হাসির ছটায় সকলকে লইয়া গঙ্গাগর্ভে অবগাহন করিলেন। ভাগীরথীর মনের সাধ এইরূপে প্রায় প্রতিদিনই সফল হইত। নিমাই দিনযামিনী শাস্ত্রচর্চ্চায় বিভোর থাকিতেন—

কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥

নিমাইর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সকলেই বিস্মিত হইতেন।



অধ্যাপক ও অধ্যাপনা

১

ষোড়শবর্ষেই নিমাইর অধ্যয়ন শেষ হইল। এই সময়ে শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য তদীয় কন্যা স্বয়ং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে উদ্বাহ-সূত্রে নিমাই পণ্ডিতের শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিলেন। অতীব সমারোহে শুভ-বিবাহ-ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল। এবার শচীমাতার গৃহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর সমাগমে গৃহ আনন্দময় হইয়া উঠিল। লোকে এবার প্রকৃত পক্ষেই দেখিতে পাইল, শচীর গৃহে—**স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ**।

বৃদ্ধ শচীমাতা, সুপণ্ডিত পুত্র ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্মী বধূ মাতাকে পাইয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিলেন। ক্রমে নিমাইর পাণ্ডিত্য-প্রতিভার গৌরব দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অধ্যয়নার্থিগণ দলে দলে নিমাই পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করার জন্য সমাগত হইলেন। মুকুন্দ-সঞ্জয় নামক জনৈক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তখন নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল—বাড়ীতে অনেক ঘর ছিল। তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় প্রসরতর চণ্ডীমণ্ডপ আর কাহারও ছিল না। মুকুন্দ-সঞ্জয়ের একটি পুত্র ছিল। মুকুন্দ-সঞ্জয় অতীব ভক্তি সহকারে নিমাই পণ্ডিতের শ্রীচরণে নিজের পুত্রটীকে সমর্পণ করিয়া দিয়া বলিলেন—"আমার এই সুপ্রসর চণ্ডীমণ্ডপ আপনার চতুষ্পাঠীর জন্য ছাড়িয়া দিলাম। দেশ বিদেশ হইতে অধ্যয়নার্থীরা আপনার

নিকট আসিতেছে, এই খানে চতুষ্পাঠী করুন আমার বালকটীকে দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্যাদান করুন।”

নিমাই পণ্ডিত আগ্রহের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপ তখনই ছাত্রগণ দ্বারা পরিপূরিত হইল এবং তাঁহাদেব অধ্যয়ন-রবে মুখরিত হইয়া উঠিল। যদিও এই স্থানে প্রধানতঃ কলাপ ব্যাকরণেরই অধিকতর চর্চ্চা হইত,কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস ছিল,—নিমাই পণ্ডিত সর্ব্ব শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত। নিমাই বিদ্যা-যুদ্ধে কাহাকেও ছাড়িতেন না। দর্পহারী ভগবান্ সকলেরই বিদ্যা-দর্প চূর্ণ করিতেন। পণ্ডিত মাত্রেই নিমাই পণ্ডিতকে দেখিলে ভীত-ভীত ভাবে সরিয়া পড়িতেন—পাছে বা নিমাই তাঁহাকে অপ্রস্তুত করেন। কিন্তু নিমাইর হাত ছাড়িয়া কাহারও যাইবার উপায় নাই।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত হইয়াছে—

হেন মতে বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ।
বৈসেন সভার করি বিদ্যা-গর্ব্বপাত॥
যদ্যপিহ নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ।
কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্ররাজ॥
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো নাহি কোনো কার্য্য॥
যদ্যপিহ সবেই স্বতন্ত্র সভাজয়ী।
শাস্ত্র-চর্চ্চা হইলে ব্রহ্মারও নাহি সহী॥

এই অসাধারণ পণ্ডিত-সমাজকে যুবক নিমাই পণ্ডিতের নিকট

সর্ব্বদাই অবনত মস্তকে থাকিতে হইত। নিমাই পণ্ডিতের সম্মুখে সকলেরই পাণ্ডিত্য-প্রতিভা মলিন হইয়া পড়িত।

তথাপিহ হেন জন নাহি প্রভু প্রতি।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো কভু নহে মতি॥
হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সভেই যায়েন এক দিকে নম্র হইয়া॥
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেই জন হয় যেন অতি বড় দাস॥

এইরূপ পাণ্ডিত্য গৌরব-প্রভায় অচিরে নিমাই পণ্ডিতের নিকট সহস্র সহস্র শিক্ষার্থী সমাগত হইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত হইয়াছে :—

কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হইয়া পড়ে ঠাঞি ঠাঞি॥

*   *   *   *

সর্ব্বদাই পরিহাস-মূর্ত্তি বিদ্যা বলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে যায় প্রভু চলে॥

নিমাই পণ্ডিতের রূপ ও বিদ্যা-প্রতিভা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন।

পণ্ডিত অথচ ভক্তগণ নিমাই পণ্ডিতের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতে প্রয়াস পাইতেন। ভক্তগণ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা কৃষ্ণ-কথা শুনিতে অধিকতর প্রয়াসী। নিমাই পণ্ডিতের নিকটে গেলে কেবল

শাস্ত্রের পূর্ব্বপক্ষ হইবে, কৃষ্ণকথা হইবে না এই আশঙ্কায় তাঁহারা নিমাইর নিকটে ঘেসিতেন না।

মুকুন্দ দত্ত নামক এক ব্যক্তি যেমন ভক্ত, তেমনি সুগায়ক—আবার তেমনই সুপণ্ডিত। মুকুন্দের প্রতি নিমাইর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। মুকুন্দ তখন তাহা বুঝেন নাই কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে এই মুকুন্দ প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। একদিন নিমাই মুকুন্দকে ধরিয়া বসিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে মুকুন্দ দত্তের অসাধারন পাণ্ডিত্য। তাঁহার ধারণা ছিল,—নিমাই ব্যাকরণের পণ্ডিত, অলঙ্কার জানেন না, কিন্তু সেদিন নিমাই পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া মুকুন্দের সে দর্প চূর্ণ হইল। মুকুন্দ দত্ত কেন পলাইতেন, নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ঃ—

প্রভু বলে জানিলাম যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ-সম্ভাষ করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি পুঁথি টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥

প্রভু ভক্তকে কখনও ত্যাগ করেন না। মুকুন্দ দত্তকে ধরিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচারে মুকুন্দ দত্ত পরাজিত হইলেন। নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "মুকুন্দ! পালাইয়া পার পাইবে কি, ? আমার ফাঁদে তোমাকে পড়িতেই হইবে ঃ—

"এমত বৈষ্ণব মুঞি হইব সংসারে
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে ॥"

আর একদিন গদাধরকে ধরিয়া বলিলেন,—"গদাধর! তুমি নাকি ন্যায় পড়িতেছ? তোমাদের ন্যায়শাস্ত্রে মুক্তির লক্ষণ কাহাকে বলে, বলিতে পার।" গদাধর নম্রভাবে যথাশাস্ত্র উত্তর করিলেন। নিমাই পণ্ডিত এমনভাবে গদাধরের বাক্য খণ্ডন করিলেন যে, গদাধর নিমাইর মুখে নব্যন্যায়ের জটিল ভাষার ঝটিকা-প্রবাহে একবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। সুবিখ্যাত দীধিতিকার শ্রীমৎ রঘুনাথ শিরোমণিকেও একদিন নিমাই পণ্ডিত এইরূপে নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারে বিস্মিত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি সেই দিন বুঝিয়া ছিলেন, নিমাই পণ্ডিত মানুষ নহেন—**স্বয়ং ভগবান্‌**।

আর একদিন নিমাই ও রঘুনাথ যখন গঙ্গাপার হইতে ছিলেন রঘুনাথ সহসা নিমাই পণ্ডিতের নিকট তাঁহার স্বলিখিত একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ দেখিলেন, রঘুনাথের মুখ মলিন হইল। নিমাই বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"ভাই, তোমার মুখে সহসা বিষাদের ভাব দেখা দিল কেন?"

রঘুনাথ বলিলেন "ভাই গঙ্গাবক্ষে বসিয়া মিথ্যাকথা বলিতে নাই, তুমি ন্যায়ের যে গ্রন্থখানি লিখিতেছ, জগতে উহা প্রকাশিত হইলে আমার পরিশ্রম বিফল হইবে। আমিও এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছি।"

নিমাই রঘুনাথের হস্ত হইতে গ্রন্থখানি লইয়া সহাস্যমুখে

উহা গঙ্গাস্রোতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"যা'ক্ এবার উৎপাত গেল।"

রঘুনাথ কাঁদিয়া বলিলেন—"ভাই কেন এ সর্ব্বনাশ করিলে—এমন অমূল্যধন কেন গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলে ?"

নিমাই বলিলেন—"তোমার গৌরবেই আমার গৌরব। জগতে তুমি যশস্বী হও, ইহাই আমার একান্ত বাসনা।" রঘুনাথ এবার খাটিভাবে বুঝিলেন,—নিমাই পণ্ডিত প্রকৃতপক্ষেই,—**প্রেমের দেবতা।**

আর একদিন শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য পরমপণ্ডিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিলেন, নিমাই পণ্ডি-তের পরিচয় লাভ করিলেন। তিনি গোপীনাথ আচার্য্যের বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলেন, গদাধর বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত। ঈশ্বর-পুরী গদাধরকে দেখিয়া অতি প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি গদাধরকে স্বরচিত সংস্কৃতভাষায় লিখিত "কৃষ্ণলীলামৃত" গ্রন্থ পড়াইতেন।

নিমাই পণ্ডিতের সহিত আলাপ পরিচয়ের পরে ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে বলিলেন "পণ্ডিত! আমি এই কৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থ লিখিয়াছি, ইহাতে যদি কোন দোষ থাকে, আমাকে দেখাইয়া দিলে আমি বাস্তবিকই সুখী হইব।"

নিমাই বলিলেন—"সন্ন্যাসীঠাকুর! সে কি কথা ? আপনি একে পণ্ডিত, তাহার উপরে পরমভক্ত, তায় আপনি শ্রীকৃষ্ণচরিত লিখিয়াছেন, ইহাতে যে দোষ দেখাইবে, সেতো মহাপাপী।"

ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেন নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়॥
ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন-মাত্রে কৃষ্ণের সন্তোষ॥

ঈশ্বরপুরী এই কথায় আনন্দলাভ করিয়া বলিলেন—"সে কথা থাকুক, আমি সরলভাবে বলিতেছি, গ্রন্থখানির দোষাদি থাকিলে আমাকে বলিতেই হইবে।"

নিমাই পণ্ডিত গ্রন্থ লইলেন, পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন হাসিয়া বলিলেন—"আপনি একটা পরস্মৈপদী ধাতুকে আত্মনে-পদীভাবে ব্যবহৃত করিয়াছেন।"

ঈশ্বরপুরী চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন যে, ঐ ধাতু আত্মনেপদীতেও রাখা যায়। নিমাই তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। পরে এই ঈশ্বরপুরীর নিকটেই নিমাই দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রবীণ শিক্ষার্থীরাও এই তরুণ যুবক অধ্যাপকের অতুল বিদ্যা-প্রতিভা ও বিচক্ষণতা দেখিয়া তাঁহার পদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু নিমাইর চাঞ্চল্য তখনও কমে নাই। যে মুখমণ্ডলে পরবর্ত্তী সময়ে জাহ্নবী ধারার ন্যায় অবিরাম নয়ন-সলিল বহিয়া চলিয়াছিল, এক্ষণে তাহা চিরপ্রফুল্ল, চির স্ফূর্ত্তিময়। নিমাই বাহু দোলাইয়া দোলাইয়া পথে চলিতেছেন, মুখের দিকে চাহিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন, নিমাই যেন বলিতেছেন, "আমি ভুবন-বিজয়ী, আমার সহিত লড়িতে পারে এমন কে আছে?" তখন তাঁহার শ্রীমুখ খানি দেখিলেই এইরূপ মনে হইত।

শ্রীবাস আসিতেছেন, তিনি বয়সে নিমাইর অনেক বড়, সুপণ্ডিত, উদার ও মহাভাগবত। নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া মৃদু-মধুরস্বরে বলিলেন—"নমস্কার।"

শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন, "চিরজীবী হও। উদ্ধত-চূড়ামণি, যাচ্ছ কোথা? দিনযামিনী কেবল ত ছাত্র পড়াইয়াই অতিবাহিত করিতেছ। কৃষ্ণ-ভজনা না করিয়া বৃথা সময় কাটাইতেছ কেন? লোকে পড়াশুনা করে কেন? কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্য তো? তাহা যদি না হইল, তবে বল দেখি সে পড়ার প্রয়োজন কি? ঢের পড়া হইয়াছে! আর পড়ায় প্রয়োজন নাই, এখন কৃষ্ণভজন কর।" যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

হাসিয়া শ্রীবাস বলে "কহ দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের শিরোমণি॥
কৃষ্ণ না ভজিয়া আর কি কার্য্যে গোঙাও।
রাত্রিদিন নিরবধি কেন বা পড়াও॥
পড়ে লোক কেনে? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥
এতেক সর্ব্বথা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা তো,—এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥

যদি অপর কোন পণ্ডিত নিমাইকে এইরূপ ভাবে উপদেশ দিতে আসিতেন, তবে নিমাই হয়ত তর্কের জোড়ে তখনই তাঁহাকে নিরস্ত ও অপ্রতিভ করিয়া দিতেন, কিন্তু শ্রীবাস মহাভাগবত, তাঁহার সহিত তর্ক চলে না। নিমাই উদ্ধত চূড়ামণি হইলেও ভক্তের

প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে তাঁহার কখনও আন্তরিক ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

নিমাই শ্রীবাসের বাক্যে একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, তোমার কৃপায় তাহাও হইবে।" প্রভু হয়ত এই মনে করিয়া হাসিলেন যে, তুমি আমায় কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দিতেছ, তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই যে, আমি কৃষ্ণভক্তির মূর্ত্তিরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছি। "থাক না দুই দিন,—ভক্তির বিশাল বন্যায় দেখিবে তোমায় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইব।"

উদ্ধত চূড়ামণির মুখে একটা আশার কথা শুনিয়া শ্রীবাস আশা-বিভাসিত হৃদয়ে কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে আপন পথে গমন করিলেন।

[২]

এদিকে শিষ্যগণসহ নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। আজ গঙ্গাতীরেই অধ্যাপনা হইবে। শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন :—

গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বসিল শিষ্যগণ॥
কোটি মুখে সেই শোভা না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥

এই শোভা বর্ণনা করার জন্য পূজ্যপাদ ব্যাসাবতার কবিবর উপমা খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু যিনি নিরুপম, তাঁহার কি কখনও উপমা মিলে? তাই কবিবর বলিতেছেন :—

চন্দ্রতারাগণ বা বলিব সেহ নহে।
—সকলঙ্ক,—তার কলা ক্ষয় বৃদ্ধি হয়ে॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক,—তেই উপমা দূরে গেলা॥

চন্দ্রের উপমা ব্যর্থ হইল। কবি বৃহস্পতির সহিত তুলনা করিতে যাইয়া লিখিতেছেন :—

বৃহস্পতি উপমা দিতেও না জুয়ায়।
তেঁহ একপক্ষ,—দেবগণের সহায়॥
এ প্রভু সভার পক্ষ, সহায় সভার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইঁহার॥

বিদ্যা প্রতিভা ছাড়িয়া দিয়া রূপের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কবি অমনি কামদেবের কথা মনে তুলিলেন—কিন্তু সে তুলনাও অসঙ্গত বোধে কবি বলিতেছেন :—

কামদেব-উপমা বা দিব, সেহ নহে।
তিঁহ চিত্তে জাগিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়ে॥
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে সর্ব্ববন্ধ-ক্ষয়।
পরম নির্ম্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয়॥

কোনও দৃষ্টান্ত যোগ্য হইল না। ইহার পরে ভাবিতে ভাবিতে একটি উপমা তাঁহার মনে আসিল। কবি এবার মন খুলিয়া লিখিতেছেন—

কালিন্দীর তীরে হেন শ্রীনন্দকুমার।
গোপবৃন্দ মধ্যে বসি করেন বিহার॥

সেই গোপবৃন্দই, সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ॥
গঙ্গাতীরে যে জন দেখে মহাপ্রভুর মুখ।
সেই পায় অতি অনির্ব্বচনীয় সুখ॥

"তার তুলনা তার সনে"—এবার উপমা ঠিক হইল। নিমাই নবীন অধ্যাপক,—তরুণ যৌবন,—তাঁহার রূপে কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্য্যও পরাজিত, বিদ্যা-প্রতিভায় স্বয়ং সরস্বতীও বিস্মিতা ও বিমুগ্ধা। পণ্ডিত-প্রধান নবদ্বীপের প্রাচীন ও প্রবীণ পণ্ডিতগণ গঙ্গাঘাটে আসিয়া সারস্বত-শক্তির পূর্ণ প্রকাশ—নিমাইর শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন—কি শাস্ত্রব্যাখ্যা, কি যুক্তিচাতুর্য্য, কি বাগ্বিন্যাস কৌশল, কি বিপুল বিশাল ও সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান, দেহের কি সৌন্দর্য্য আর বাক্যেরই বা কি মাধুর্য্য—প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন—নয়ন হইতে যেন অনন্তবিদ্যার তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ ঝলকে ঝলকে প্রবাহিত হইতেছিল, দেহ হইতে যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজ বিকীর্ণ হইতেছিল। অতি বড় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্দের হৃদয়েও একটা সন্দেহ আসিল—নিমাই কি মানুষ? গঙ্গাঘাটে সহস্র সহস্র লোক। দেবতা দর্শন করার ন্যায় স্ত্রী পুরুষ, বিদ্বান মূর্খ, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই নিমাইকে ভক্তিভরে দর্শন করিতে লাগিলেন—কাণাকাণি করিতে লাগিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি বিলক্ষণ।
গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে সর্ব্বজন॥
কেহ বলে "এত তেজ মানুষের নহে।"

কেহ বলে "ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অংশ হয়ে॥"
কেহ বলে "বিপ্ররাজ হইবেক গৌড়ে।
সেই হেন এই বুঝি কখনো না নড়ে॥
রাজচক্রবর্ত্তী চিহ্ন দেখিয়ে সকল।"
এই মত বোলে,—যার যত বুদ্ধি বল।

আধুনিক একদল ভালমানুষ লেখক শ্রীবৃন্দাবনদাসের উপর বড় চটা, কেননা, তিনি কেন জগদীশ্বরকে ঠিক আমার তোমার মত মানুষটী করিয়া বর্ণনা করেন নাই? তিনি কেন তাঁহার মানুষের অতিরিক্ত অলৌকিক গুণগ্রামের বর্ণনা করিলেন? এই সকল কৃপার্হ অজ্ঞ লেখকেরা জানে না যে, ঈশ্বর চিরদিনই ঈশ্বর, তিনি মানুষের ভাবে, মানুষের সমাজে, মানুষ সাজিয়া আসিলেও তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহবেশে আসিলেও তিনি ঈশ্বর। তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশ পাইবে, তাহাতে আর তোমার আপত্তি কি হইতে পারে? আর তুমি অবোধের ন্যায় তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেই বা ভগবতত্ত্ব বিশ্বাসী বুদ্ধিমান্ লোকেরা তোমার উন্মত্ত প্রলাপের প্রশ্রয় দিবেন কেন?

ঈশ্বর মানুষ নহেন, মানুষও ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর মানবের বেশে অবতীর্ণ হয়েন, তাই বলিয়া তিনি মানুষ নহেন। তাঁহার অলৌকিক অচিন্ত্যশক্তি প্রকাশ পায় বলিয়াই লোকে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করে। তুমি ভগবান্‌কে সাধু বলিয়া স্থির করিতে চাহ, কাজেই তাঁহার অলৌকিক শক্তির কথা শুনিলে তুমি

সহিতে পার না, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা কি তোমার মনোমত করিয়া গড়িবার জন্য ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি-প্রকাশ লুকাইবেন? ঈশ্বরের এরূপ লুকাইয়া বর্ণনা করা অবিশ্বাসী অজ্ঞ নাস্তিকদের পক্ষেই শোভা পায়। যাঁহারা ভক্তির দিব্যচক্ষে ব্রহ্মদর্শন করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি,—আর এই শ্রেণীর অজ্ঞ লেখকদের দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য। এখানে সে বিচারের অবকাশ নাই।

এখানে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই শ্রেণীর লেখকেরা বিষয়সুখে প্রমত্ত, ইহাদের দৃষ্টি অতি স্থূল, সূক্ষ্ম নিয়ম ও সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি ইহাদের নাই। ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মরূপৈশ্বর্য্য-প্রকটন, ভগবদাবির্ভাব প্রভৃতি তত্ত্বে ইহাদের প্রবেশাধিকার অসম্ভব। আপনি ইহাদের নিকট ভগবৎ-প্রকাশের বর্ণনা করিবেন, ইহারা তাঁহাকে মানুষরূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা পাইবে। যেখানে ইহাদের জড়বুদ্ধি প্রবেশ করিতে না পারে, সেই স্থলেই আপনার বর্ণনায় ইহারা দোষারোপ করিবে। বঙ্গসাহিত্যে কোন কোন লেখকের এইরূপ মূর্খতামগ্ন পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ-প্রদর্শনের প্রয়াস দেখিয়া আমাদের মনে যুগপৎ হাস্য ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছে।

গঙ্গাঘাটে মহাপ্রভুর লীলাবিলাস ভক্তজনগণের হৃদয়াকর্ষী। তাই শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

প্রভুর পাণ্ডিত্য বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।
সবাই জানেন গঙ্গাতীরে ভাল মতে॥

শ্রীভগবান গৌরসুন্দর নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি যদি আত্মপ্রকাশ না করিয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় কালাতিপাত

করিতেন, তবে তাঁহাকে কে জানিত, কে তাঁহাকে চিনিতে পারিত ?

তেঁহ যদি না করেন আপনা বিদিত।
তবে তানে কেহ নাহি জানে কদাচিত॥

শ্রীভগবান যখন আবির্ভূত হয়েন, তখন আত্মপ্রকাশ না করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কেন ? কাজেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও ভগবত্তা প্রকাশ করা প্রয়োজন, কাজেও তিনি তাহাই করেন।

৩

আর একদিনের আর একটা বিবরণ শুনুন। নবদ্বীপে তখন পাণ্ডিত্যের লীলাভূমি ছিল। সম্রাট যেমন দিগ্বিজয় করিতে বহির্ভূত হয়েন, এইরূপ প্রাচীনকালে যাঁহারা নিজদিগকে বিদ্যা-সম্রাট্ বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারাও তেমনি পণ্ডিত-সমাজকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় প্রতাপ ও প্রভাব জগতে প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেন। নবদ্বীপের বিদ্যা-গৌরবের এই শুভদিনে নবদ্বীপে নানাদিগ্‌দেশ হইতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ বিচারার্থ আগমন করিতেন। নিমাই যখন পণ্ডিত হইলেন, সেই সময়েও নবদ্বীপে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগমন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের আগমন ব্যাপারও কতকটা দিগ্বিজয়ী বীরের আগমনের ন্যায় মনে হইত। ইহারা লোকজন নিশান ডঙ্কা হাতী ঘোড়া লইয়া চলিতেন।

নবদ্বীপে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছেন এই সংবাদে চারিদিকে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পণ্ডিত মহলে একটা আশঙ্কার কারণ হইল। অনেকেই ভীত হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিতেরা প্রাণের

অপেক্ষাও মানের আদর করিতেন। তাঁহাদের ধন ছিল না। কেবল বিদ্যা-গৌরবকেই তাঁহারা প্রধানতম গৌরব বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং সকলেই ভয়ে শশব্যস্ত।

সহস্র সহস্র মহা মহা ভট্টাচার্য্য।
সবাই চিন্তেন মনে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য॥

নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণও এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাদের অধ্যাপকের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন—

"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি।
সর্ব্বত্র জিনিয়া বুলে জয়পত্র ধরি॥
হস্তী ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি।
সম্প্রতি আসিয়া হৈলা নবদ্বীপে স্থিতি॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয়পত্র মাগে সকল সভায়॥"

ছাত্রদের কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গসুন্দর একটুকু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"একি গর্ব্ব? তোমরা জানিয়া রাখ ঈশ্বর কখনও গর্ব্ব সহিতে পারেন না।"

যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
হৈহয় নহুষ বেণ নরক রাবণ।
মহা দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়ে।
সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সহে॥

এতেকে তাঁহার যত বিদ্যা অহঙ্কার।
দেখিবা এথাই সব হইবে সংহার॥

"ঈশ্বর দর্পহারী। তিনি কাহারও দর্প সহিতে পারেন না। যে, যে গুণে মত্ত হইয়া অহঙ্কার করে, ঈশ্বর অবিলম্বে তাহার সেই গুণ নষ্ট করেন। দেখ না কেন, হৈহয়, নহুষ, বেণ, ও নরক প্রভৃতি কত বীরদর্পী এ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিল, শ্রীভগবানের প্রভাবে কাহার দর্প অটুট রহিল? এই যে দিগ্বিজয়ী আসিয়াছে, ইহার দর্প এইখানেই চূর্ণ হইবে।"

কাহাদ্বারা কিরূপে দর্প চূর্ণ হইবে, তাহার লেশমাত্রও প্রভু ব্যক্ত করিলেন না। কেবল ইঙ্গিতে একটি কথামাত্র শিষ্যদিগকে জানাইয়া রাখিলেন, তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় কাহাকেও তিনি বুঝিতে দিলেন না।

সন্ধ্যার সময় তিনি শিষ্যদিগকে লইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গঙ্গাঘাট মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাসের এক প্রধানতম লীলাস্থলী। শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গা স্পর্শ করিলেন, গঙ্গা নমস্কার করিয়া গঙ্গাতটে উপবেশন করিলেন। শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে মণ্ডলী করিয়া বসিল। বিবিধ ধর্ম্মকথা ও শাস্ত্রকথা উত্থাপিত হইল। কত লোক আসিল, কত লোক চলিয়া গেল। শ্রীনিমাই পণ্ডিত প্রফুল্লমনে শাস্ত্রকথা ও শাস্ত্রবিচার তুলিয়া উপস্থিত লোকমাত্রকেই বিমুগ্ধ করিলেন।

অপরাপর পণ্ডিতগণের মধ্যে আজ অনেকেই অনুপস্থিত। তাঁহারা প্রতিদিন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা বন্দনা করেন, জাহ্নবীতটে

উপবেশন করিয়া ভগবৎচিন্তা করেন। কিন্তু এদিন আর তাহাতে তাঁহাদের মন বসিল না। কেননা অনেকেই ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিলেন। বড় বড় তার্কিক পণ্ডিতগণ বাড়ীর লোকদিগকে বলিয়া রাখিলেন যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিও,—পণ্ডিত মহাশয় স্থানান্তরে গিয়াছেন।"

এই বিষম ভয়ের দিনে কেবল একমাত্র নিমাই পণ্ডিত সর্ব্বজনসমাগমস্থল গঙ্গাঘাটে বীরপুরুষের ন্যায় নির্ভীকভাবে উপবিষ্ট। তাঁহার বদনকমল চিরপ্রফুল্ল, চিরসমুজ্জ্বল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, নিমাই পণ্ডিতটা কি নির্ভীক, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ভয়ে আজ নবদ্বীপের পণ্ডিতকুল আকুল হইয়া লুকাইতেছে, আর ইনি মহারাজ চক্রবর্ত্তীর ন্যায় প্রকাশ্যে গঙ্গাঘাটে উপবিষ্ট।

পূর্ণিমার চাঁদ উদিত করিয়া নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটে সন্ধ্যাদেবী দেখা দিলেন। নিমাই পণ্ডিত শিষ্যসহকারে সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিলেন। গঙ্গার মৃদুল তরঙ্গলহরে চাঁদের জ্যোৎস্না ঝিকিমিকি করিয়া খেলা করিতে লাগিল, রজতশুভ্র চন্দ্রকিরণ গঙ্গার ঘাটে ঘাটে বিচিত্র শোভার পসার খুলিয়া দিল। সমগ্র নীলাকাশ চাঁদের বিমল জ্যোৎস্নায় মনোরম হইয়া উঠিল।

পাঠক, পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতে কাহার সাধ না হয়? আর সে চাঁদ দেখিয়া কাহার চিত্তই বা আহ্লাদিত না হয়? কিন্তু আজ গঙ্গাঘাটে চলুন, আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ আপনার নিকট অতীব তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।

ঐ দেখুন যাঁহার পদনখের অতুল জ্যোৎস্নায় কোটীচন্দ্রের লাবণ্য-

জ্যোৎস্না লজ্জায় মলিন হইয়া যায়, সেই গোরাচাঁদের ভুবন-ভুলানো লাবণ্যমূর্ত্তি, মুখচন্দ্রের মনোরম অতুলনীয় শোভা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় রূপরাশি যেন ও মুখচন্দ্রে স্থান না পাইয়া চারিদিকে ফোয়ারার ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছে। ঐ হাসিমাখা বদনশোভায় কোটি চাঁদের উজ্জ্বল প্রভাও মলিন হইয়া যাইতেছে। চক্ষু দুইটী অনিন্দ্য পদ্মকোরকের ন্যায় সুঠাম ও আকর্ণ-বিস্তৃত,—আর উহা প্রতিভা-জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধলাবণ্যপূর্ণ,—দন্তগুলি মুক্তা-পাতিবিনিন্দি,—বিম্ববিনিন্দ্য ওষ্ঠাধর, সর্ব্বাঙ্গ সমস্ত সৌন্দর্য্যের আকর। শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা শুনুনঃ—

শিষ্য সঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপ সর্ব্বমনোহর॥
হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্রবদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্যদৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন॥
মুক্তা যিনি শ্রীদশন, অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব-কলেবর॥
সুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ।
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিলক্ষণ বেশ॥
সুপ্রকাশ শ্রীবিগ্রহ সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্ররূপে তহি অনন্ত বিজয়॥
শ্রীললাটে ঊর্দ্ধ সুতিলক মনোহর।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ-সুন্দর॥

যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম উরু মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
"হয়" "নয়" করে "নয়" করয়ে স্থাপন॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ।
চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন॥

নিমাই পণ্ডিত যখন এইরূপে গঙ্গাতটে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সহসা দিগ্বিজয়ী গঙ্গাতটে উপস্থিত হইয়াই এই দিব্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্রই তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—একি মানুষ? মানুষের এত রূপ, মানুষের এত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আরতো কখনো দেখি নাই। মানুষের দেহ হইতে এই স্নিগ্ধমধুর কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছে। দিগ্বিজয়ী এরূপ লাবণ্য দেখিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, সতৃষ্ণনয়নে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর কাণ পাতিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও শাস্ত্রবিচার শুনিতে লাগিলেন। তিনি দূরদেশ হইতে নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনিয়া-ছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন নিমাই পণ্ডিতের বয়স অল্প, তিনি ব্যাকরণের খুব ভাল অধ্যাপক। দূর হইতে দেখিয়া তিনি একটি শিষ্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনিই কি নিমাই পণ্ডিত?" উত্তর হইল—"হাঁ"।

দিগ্বিজয়ী সসম্ভ্রমে নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রসভায় উপনীত হই-লেন। সম্মান-মর্য্যাদা-সংরক্ষক নিমাই পণ্ডিত তাঁহার অভ্যর্থনা

করিলেন। নিমাই পণ্ডিতের নম্রতা ও বিনয় দেখিয়া দিগ্বিজয়ীর মনে বিপরীত ভাবের উদয় হইল। দিগ্বিজয়ী মনে করিলেন, নিমাই পণ্ডিত আপনাকে দুর্ব্বল মনে করিয়াই তাঁহার নিকট নম্রভাব প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক গর্ব্বভাব প্রবল হইয়া উঠিল। দিগ্বিজয়ী অবজ্ঞার সুরে বলিতে লাগিলেন—

"তোমার নামই কি নিমাই পণ্ডিত, তুমি বুঝি বাল্যশাস্ত্র ব্যাকরণের অধ্যাপক? এ সম্বন্ধে তোমার খ্যাতির কথাও শুনিয়াছি। তা ব্যাকরণের মধ্যে কেবল বুঝি কলাপ ব্যাকরণই তোমার অধীত?"

চির-নম্র নিমাই, মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন, "ব্যাকরণ পড়াই বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু কি যে পড়াই তা আমিও বুঝি না, ছাত্রেরাও বোঝে না। এ আমার এক মিথ্যা অভিমান। আপনার নিকট আমি কিছুই নহি। কোথায় বা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ প্রবল পণ্ডিত আপনি,—আর কোথায় বা নবীন পড়ুয়া আমি। আমি তো আপনার নিকটে সবে শিশু মাত্র। আপনার নিকট আমি আর কি পরিচয় দিব? শুনেছি আপনি শ্রেষ্ঠ কবি, দয়া করিয়া গঙ্গা মাহাত্ম্য-বর্ণনা করিলে শুনিয়া সুখী হই। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি সবে শিশু পড়ুয়া নবীন॥

তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥

শ্রীশ্রীনিমাই পণ্ডিতের শ্রীমুখনিঃসৃত প্রশংসার হিল্লোলে গর্ব্বস্ফীত দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ গঙ্গা-মাহাত্ম্যসূচক শ্লোকাবলী ঝটিকার ন্যায় বেগে দ্রুতরচন-নৈপুণ্যে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা দৃষ্ট হয়ঃ—

দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা।
কত রূপে বোল তার কে করিবে সীমা॥
কত মেঘ, শুনি, যেন করয়ে গর্জ্জন।
এই মত কবিত্বের গাম্ভীর্য্য-পঠন॥
জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান।
যে বোলয়ে সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ॥
মনুষ্যের শক্তি তাহা দুষিবেক কে।
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি বুঝিবেক যে॥
সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক্ হইলা সবে শুনিয়া বর্ণন॥

দিগ্বিজয়ী দ্রুত কবি, তিনি যে-সে রকমের কবি ছিলেন না। তাঁহার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার কবিত্বের শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের চমৎকারিত্বে পড়ুয়ামাত্রেই বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

সর্ব্বশাস্ত্রে মহাবিশারদ যে যে জন।
হেন শব্দ তাঁহাদেরও বুঝাও বিষম॥
এই মত প্রহর খানিক দিগ্বিজয়ী।
পড়ে দ্রুত বর্ণনা তথাপি অন্ত নাহি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিল।
ঘটি একে শত শ্লোকে গঙ্গারে বর্ণিল॥

চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে এইরূপ পাণ্ডিত্য-পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন সর্ব্বত্রই ধন-লালসার প্রবল প্রভাব। বিদ্যার আদর এদেশে আর নাই।

দিগ্বিজয়ী ঝটিকা বেগে অর্দ্ধ মুহূর্ত্তের মধ্যে গঙ্গা-মাহাত্ম্যসূচক কত শ্লোক বর্ণনা করিয়া সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া তুলিলেন।

সর্ব্বগুণের সমাদরকারী নিমাই পণ্ডিত উহাতে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া দিগ্বিজয়ীকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিলেন, "দ্রুত রচনায় আপনার বেশ ক্ষমতা আছে দেখিতে পাইলাম। আপনি যে সকল শ্লোক বলিলেন, উহার মধ্যে যেটি আপনার নিকট খুব ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইটির ব্যাখ্যা করুন, আমরা আপনার মুখে উহার ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।"

দিগ্বিজয়ী বলিলেন, "তুমি কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে চাও বল।" নিমাই পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন :—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়া শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

কেমন, এই শ্লোকটী আপনি বলিয়াছেন ত? দিগ্বিজয়ী বলিলেন, "ঠিক, আর এইটীই খুব ভাল বর্ণনা। কিন্তু আমি এতগুলি শ্লোক এত দ্রুতবেগে পড়িয়া গিয়াছি, তার মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শ্লোক তুমি ঠিক্ বুঝিয়া বাছিয়া লইয়াছ। কেবল তাহাই নহে, তুমি শ্লোকটি একবারে শুনিয়াই অবিকল মনে রাখিয়াছ। ধন্য তোমার প্রতিভা!"

নিমাই পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতে আর প্রতিভার পরিচয় কি আছে! আপনি যেমন দেবতার বরে দ্রুত-রচনাশক্তি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ দেবতার বরে অপরেও শ্রুতিধর হইতে পারে। ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? যাহা হউক আপনি ইহার ব্যাখ্যা করুন।"

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিমাইর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

নিমাই বলিলেন, "আপনার ব্যাখ্যা শুনিলাম। কিন্তু শ্লোকটির দোষগুণের সম্বন্ধেও কিছু বিচার শুনিতে চাই।"

দিগ্বিজয়ী রুষ্ট হইয়া তীব্র স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার রচিত শ্লোক! তাহাতে কি আবার দোষ থাকিতে পারে? ইহাতে দোষের কোনো লেশাভাস নাই। বরং ইহাতে যে সকল গুণ আছে

তাহাই তোমাকে শুনাইতেছি। ইহাতে উপমা অলঙ্কার আছে, গুণ আছে, অনুপ্রাস আছে। ইহার পরে আবার চাও কি ?"

দিগ্বিজয়ী কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি নিমাই পণ্ডিতকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ বাপু অলঙ্কার কাব্য-শাস্ত্রের উৎকর্ষ-সাধক। আমার এই শ্লোকে অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কার উভয়ই আছে। শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস এই শ্লোকে বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহার উপরে এই শ্লোকে মাধুর্য্যাদি গুণেরও অভাব নাই, সুতরাং কাব্য-বিচারে আমার-কৃত শ্লোকে চমৎকারিত্ব ভিন্ন দোষের লেশাভাসও পরিলক্ষিত হইবে না। উপমা কাহাকে বলে জান কি ? শাস্ত্রকার বলিয়াছেন ঃ—

প্রস্ফুটং সুন্দরং সাম্যমুপমেত্যভিধীয়তে।

দেখ দেখি "শ্রীলক্ষ্মীরিব"—এই স্থলে কেমন প্রস্ফুট সুন্দর সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কাব্যশাস্ত্রে গুণ কাহাকে বলে, হয়ত তুমি তাহা জান না ? গুণের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর ঃ—

যে রসস্যাঙ্গিনোধর্ম্মা শৌর্য্যাদয়ইবাত্মনাঃ
উৎকর্ষ-হেতবস্তেহস্যুঃ রচণস্থিতয়ো গুণাঃ।

ইহার অনেক বিচার আছে। কেহ কেহ বলেন, এই গুণ দশ প্রকার। যথা—শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য্য, সুকুমারতা, অর্থ-ব্যক্তি, উদারতা, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি। বৈদর্ভী রীতির এই দশ গুণ। সাহিত্য-দার্শনিক দণ্ডী এই মতের পোষক। আবার কেহ কেহ বলেন, মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই তিন গুণ মাত্র। এ সকল

তুমি ভাল বুঝিতে পারিবে না। আমার এই শ্লোকে কি কি গুণ আছে, আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতেছি।”

এই বলিয়া তিনি তাঁহার স্বকৃত শ্লোক হইতে কাব্যশাস্ত্রের পারিভাষিক গুণের উদাহরণ অভিব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

নিমাই বলিলেন, “আপনার আরও কিছু বক্তব্য আছে কি ?”

দিগ্বিজয়ী বলিলেন, “আছে বই কি ? অনুপ্রাসের কথাটা বলাই হয় নাই। কাব্যপ্রকাশে লিখিত আছে—“বর্ণসাম্যমনুপ্রাসঃ” দেখ দেখি সংস্কৃত শ্লোকের প্রথম চরণ হইতে চতুর্থ চরণ পর্য্যন্ত কত স্থলে বর্ণসাম্য আছে ? ইহা অতি সহজ কথা। যাহার বর্ণজ্ঞান আছে, সেই ইহা বুঝিতে পারে। একরূপ প্রতি পদেই অনুপ্রাস দিয়াছি।”

নিমাই বলিলেন, “আপনার আরও কিছু বলিবার আছে কি ? ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখুন।”

দিগ্বিজয়ী এবার গর্ব্বে গরম হইয়া উঠিলেন, রুষ্টভাবে বলিলেন “আমার শ্লোক দোষ-লেশ-পরিশূন্য এবং বেদবৎ অভ্রান্ত। তোমাকে কাব্যালঙ্কার বুঝাইলেও বুঝিতে পারিবে না! তুমি বৈয়াকরণ, শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ মাত্র পাঠ করিয়াছ, এবং শিশুদিগকে উহারই পাঠ দিতেছ—এই তো পণ্ডিত—তুমি! তুমি আবার কাব্যের বুঝিবে কি ? তোমায় কাব্যের কথা বুঝাইবই বা কি ?”

চিরবিনয়ী নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, “সেই জন্যইত আপনাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, একটুকু বিচার সহকারে, এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করুন। আমি অলঙ্কার শাস্ত্র না পড়িলেও যখন

নবদ্বীপে থাকি, অবশ্যই এ সম্বন্ধে আমার কিছু শুনা আছে। তাতেই মনে হয় আপনার শ্লোকে যেন কিছু কিছু দোষও আছে। তা আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হয়েন, এ বালকের কথায় ক্রুদ্ধ না হয়েন, তবে এক একটী করিয়া সে সকল কথা বলিতেছি।"

নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী বস্তুতঃই ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "তোমার যত বিদ্যাই জানা আছে, আমার শ্লোকের দোষ তুমি ধরিবে, তোমার মুর্খতাই ইহাতে প্রকাশ পাইবে। বল বল, তোমার মুর্খতাময়ী উক্তিই শুনা যাউক।"

নিমাই পণ্ডিত শান্তভাবে মৃদু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "যখন আপনার কৃপা আজ্ঞা হইল, তবে একবার কিঞ্চিৎ শুনুন। কিন্তু অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন" এই বলিয়া নিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীর শ্লোক-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীনিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "দিগ্বিজয়ী মহোদয়, আপনার পদ্যের দুই স্থানে "অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ"* দোষ আছে। আপনার এই পদ্যে "গঙ্গার মহত্ত্ব"ই বিধেয়। "ইদং" পদে কিন্তু অনু-

---

* শ্রীশ্রীনিমাই পণ্ডিত যেরূপ পাণ্ডিত্য সহকারে দিগ্বিজয়ীর শ্লোক-বিচার করিয়াছিলেন, সেই সকল উক্তি ও যুক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে উহার দুই একটি কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে তাহারই একটু আভাস দিতেছি। তিনি প্রথমতঃ এই শ্লোকের দুই স্থানে "অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ" দোষের উল্লেখ করিয়াছেন।

১। অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষের নাম কাব্যপ্রকাশেও দেখিতে পাওয়া যায় যথা :--

বাদ্যের ভাব নিহিত আছে। আপনার শ্লোকে অনুবাদ্যের পূর্ব্বেই বিধেয় বিন্যস্ত হইয়াছে। শাস্ত্রের নিয়ম এই যে,—

অনুবাদ্য + মনুক্ত্বৈব ন বিধেয় মুদীরয়েৎ।

অর্থাৎ অনুবাদ্য না বলিয়া বিধেয় বলিতে নাই। সুতরাং আপনার পদ্যের এই স্থল অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশদোষ-দুষ্ট। এই

সন্দিগ্ধমপ্রতীতম্
গ্রাম্যং নেয়ার্থমথ ভবেৎ ক্লিষ্টম্
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশম্

সপ্তম উল্লাস। ৩ শ্লোক।

অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেন অনির্দ্দিষ্টো বিধেয়াংশো যত্র।

অর্থ—যেস্থলে বিধেয়াংশের প্রাধান্য নির্দ্দেশ না হয়, সেই স্থলই অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ-দুষ্ট।

এস্থলে প্রাধান্য শব্দের অর্থ,—ত্রিবিধ-প্রতীতিযোগ্যতা।

\+ "অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিষ্ঠতি॥

অনুবাদ্য—শ্রীচরিতামৃতের কতকগুলি মুদ্রিত সংস্করণে এবং শ্রীচরিতামৃতের একখানি মুদ্রিত শ্লোকমালায় 'অনুবাদ্য স্থলে অনুবাদ পাঠ দৃষ্ট হইল। বলা বাহুল্য এ পাঠ ভ্রম। অনুবাদ্য ও অনুবাদ একার্থবাচক নহে। বিশেষতঃ এস্থলে "বিধেয়" পদের সহিত "অনুবাদ সামানাধিকরণ্যে সন্নিবেশিত করাও অসঙ্গত। ন্যায়সূত্রে অনুবাদ পদের অর্থ এই :—

বিধিবিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ।

অর্থাৎ বিধিবিহিত বাক্যের অনুবচনই অনুবাদ। বাৎস্যায়ন ভাষ্যে ইহার অর্থ বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন, বিধির অনুবচনও অনুবাদ, আবার

দোষটী—"দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী" এই স্থলেও আছে। "দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী" এই বাক্যে দ্বিতীয় পদটি বিধেয় কিন্তু আপনি উহাকে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত সমাসে যুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। উহার মুখ্য অর্থ স্থানে গৌণ অর্থ ঘটিয়াছে, তাহাতে অর্থ নষ্ট হইয়াছে।

বিহিতের অনুবচনও অনুবাদ। বিধির অনুবচনকে শব্দানুবাদ বলে, বিহিতের অনুবচন অর্থানুবাদ নামে অভিহিত। অর্থবান্ অভ্যাসই (পুনঃ পুনঃ বলা) অনুবাদ। যেমন "পচতু পচতু ভবান্" আপনি পাক করুন, পাক করুন। এইরূপ বলিবার একটা অর্থ আছে। যেখানে এইরূপে বাক্য অভ্যস্ত হয়, অথচ তাঁহার কোন অর্থ না থাকে তবে উহা পুনরুক্ত দোষ নামে অভিহিত হয়। বেদে বিধিবাদ অর্থবাদ ও অনুবাদ এই তিন প্রকার বচন-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই গৌতমের মত। তদ্‌যথা :—

বিধ্যর্থবাদানুবাদবচনবিনিয়োগাৎ।

গৌতমসূত্রে বিধি কাহাকে বলে, অর্থবাদ কাহাকে বলে, সংক্ষেপতঃ তাহার ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু মীমাংসকগণ ও নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সকল কথা লইয়া সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন।

আপোদেব-বিরচিত মীমাংসা-ন্যায়প্রকাশ, কৃষ্ণযজ্জকৃত মীমাংসা-পরিভাষা ও লৌগাক্ষি ভাস্কর কৃত অর্থসংগ্রহ গ্রন্থে বিধি ও অর্থবাদাদির যথেষ্ট আলোচনা আছে। নব্য ন্যায়বিশারদ মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশকৃত তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের শব্দখণ্ডে মহামহোপাধ্যায় শ্রীমথুরানাথ তর্কবাগীশ-রচিত উক্ত গ্রন্থের রহস্য নামক টীকায় ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীজয়দেব মিশ্র-রচিত আলোকাখ্য টীকায় এই সকল বিষয়ের প্রচুর আলোচনা আছে।

মীমাংসকগণ ন্যায়চার্য্য গোতমের সূত্র বাক্য হইতে ভিন্ন পথে বিচরণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে এখানে লৌগাক্ষি ভাস্করের অর্থসংগ্রহ ধৃত একটি কারিকার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

"দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব" এই বাক্যে "ইব" শব্দ দ্বারা লক্ষ্মীর সহিত যে সমতা দেখাইতে আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনার শব্দবিন্যাসে সে সমতা-অর্থ বিনষ্ট হইয়াছে, এখানেও আনুবাদ্যের পূর্ব্বে বিধেয় পদ বিন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলেও অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ঘটিয়াছে।

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানার্থবাদ স্ত্রিধামতঃ ॥

এখানে দেখা যায় অনুবাদ অর্থবাদের অন্তর্গত। অবধারণার্থে প্রকাশ অনুবাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। গোতম কিন্তু বিধি, অনুবাদ ও অর্থবাদ এই তিনের ভিন্ন সংজ্ঞা করিয়াছেন।

যাহা হউক, লৌগাক্ষিভাস্কর অনুবাদের যে অর্থ করিতেছেন তাহা এই :—

প্রমাণান্তরাবগতার্থাববোধকোঽনুবাদঃ।

অর্থাৎ অনুবাদ প্রমাণান্তর দ্বারা অর্থবোধ করায়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে অগ্নি হিঁমস্য ভেষজম্,—অর্থাৎ অগ্নি হিমের ভেষজ।

লৌগাক্ষি ভাস্কর লিখিয়াছেন :—

'অত্র হিম বিরোধিত্বস্য অগ্নৌ প্রত্যক্ষাবগমত্বাৎ।

অর্থাৎ অগ্নিতে যে হিমবিরোধী গুণ আছে, তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধ।

কৃষ্ণযজ্বাকৃত মীমাংসা-পরিভাষাতে লিখিত আছে :—

মানান্তরেণ প্রাপ্তার্থস্য পুনঃ শ্রবণমনুবাদঃ।

অর্থাৎ মানান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের পুনঃ শ্রবণই অনুবাদ।

অনুবাদ্য ও অনুবাদ্যম্—উদ্দেশ্য। প্রাপ্তস্য প্রাপ্তয়ে কথনমুদ্দেশ্যঃ। যে অর্থ বা বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপর ধর্ম্মদ্বারা সেই অর্থ বা বিষয়ের প্রাপ্তির যে কথন—তাহাই উদ্দেশ্য।

দিগ্বিজয়ীর মুখ পরিম্লান হইল।

এতদ্ব্যতীত "ভবানী ভর্ত্তুঃ" পদে আরও একটা দোষ সংঘটিত হইয়াছে। এই দোষটীর নাম—'অবিরুদ্ধমতিকৃৎ'। যে শব্দ-বিন্যাসে প্রকৃত অর্থে বিরুদ্ধ প্রতীতি জন্মে, তাহারই নাম—'বিরুদ্ধমতিকৃৎ'।

বিধেয়ম্ সাধ্যম্। অপ্রাপ্তস্য প্রাপয়ে কথনম্ বিধানম্। অপ্রাপ্ত অর্থের বা বিষয়ের প্রাপ্তির নিমিত্ত যে কথন, তাহাই বিধান।

অগ্রে অনুবাদ্যের (উদ্দেশ্যের) কথা না বলিয়া বিধেয়ের কথা বলিতে নাই। অলব্ধাস্পদ কোন বিষয় কোন স্থানে সন্নিবেশিত করা অসঙ্গত। অর্থাৎ যাহা অজ্ঞাত, তাহা পূর্ব্বে বলিতে নাই। কেন না, তাহা হইলে উহার অর্থবোধ অসিদ্ধ হইয়া উঠে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এই শ্লোকের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে তদ্‌যথা :—

অনুবাদ্য না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ্য কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥
বিধেয় কহি তারে যেই হয় অজ্ঞাত।
অনুবাদ্য কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরমপণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ্য ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য।
বিপ্রত্ব খ্যাতি তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাতে॥

যাহা খ্যাত তাহাই অনুবাদ্য। অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষের অপর নাম,—বিধেয়-বিমর্শ।

এখানে "ভবানীভর্ত্তা"; পদদ্বারা "শিবপত্নীর ভর্ত্তা", অর্থাৎ "দ্বিতীয় ভর্ত্তা" অর্থের প্রতীতি জন্মে।

ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তার ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি॥
শিবপত্নী ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধমতি শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ॥
ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান॥

ভবানীপতি পদটী বিরুদ্ধমতিকৃৎ-দোষের উদাহরণরূপে কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্য দর্পণাদি গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্যপ্রকাশকার লিখিয়াছেন :—

"ভবানীপতিশব্দোভবান্যাঃ পত্যন্তরে প্রতীতিং করোতি।"

অর্থাৎ "ভবানীভর্ত্তা" পদে ভবানীর পত্যন্তরে প্রতীতি জন্মায়। ভবের পত্নীই ভবানী। তাহার পরে আর "ভর্ত্তা" পদ ব্যবহার সুসঙ্গত নহে।

সাহিত্য-দর্পণকারও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন যথা :—

"ভবানীশঃ শব্দো ভবান্যাঃ পত্যন্তর প্রতীতিং কারয়িত্বা বিরুদ্ধমবগময়তি।" অর্থাৎ ভবানীশ পদ ভবানীর পত্যন্তরে প্রতীতি জন্মাইয়া বিরুদ্ধভাব জন্মাইয়া "বিরুদ্ধমতিকৃৎ" দোষ জন্মায়।

দিগ্বিজয়ী লজ্জায় ও অপমানে মস্তক অবনত করিলেন।

নিমাই বলিলেন, "মহাশয় আপনার পদ্যে আরও একটি দোষ

আছে—উহার নাম "পুনরাত্তদোষ। সমাপিত-বচনান্তর-কথনম্—পুনরাত্তম্। অর্থাৎ সমাপ্তবাক্যের পরে পুনশ্চ সেই বাক্যে শব্দ-বিন্যাস করাই পুনরাত্তদোষ।

এই পদ্যের চতুর্থ চরণে "বিভবতি" ক্রিয়া-প্রয়োগে বাক্য পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আবার তাহার পরে "অদ্ভুতগুণ" এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাই পুনরাত্তদোষ।

আর একটি দোষ—ভগ্নক্রম। এই পদ্যের তিন চরণে অনুপ্রাস আছে, কিন্তু এক চরণে অনুপ্রাস নাই। "ভগ্নঃ ক্রমঃ উদ্দেশানুগুণঃ প্রস্তাবো যস্মিন্ স ভগ্নক্রমঃ।"

অর্থাৎ যে ক্রমে বর্ণনা হইয়া আসিতেছে, যদি কোথাও তাহাতে কোনরূপে ক্রম-ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে উক্ত দোষ ভগ্নক্রম নামে অভিহিত হয়।

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, আপনার পদ্যটীতে প্রশংসার বিষয় যে না আছে তাহা নহে, কিন্তু পাঁচটি দোষে উহা দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। রসশাস্ত্রের আদি, গুরু ভরত মুনি বলেন :-

রসালঙ্কারবৎকাব্যঃ দোষযুক্চেদ্ বিভুষিতং
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্।

অর্থাৎ রসালঙ্কারবিশিষ্ট কাব্য নানা গুণে বিভূষিত হইলেও অল্পমাত্র দোষযুক্ত হইলেই তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, শ্বেতি-লেশযুক্ত দেহ সুন্দর হইলেও উহা দুর্ভগ বলিয়া অনাদৃত হইয়া থাকে।

দিগ্বিজয়ী নিতান্ত অপ্রতিভ ও অসহায়ের ন্যায় দীনাতিদীন

ভাবে নিমাই পণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরম করুণাময় বুঝিলেন, দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব একেবারেই বিচূর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীকে অপ্রতিভ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। নিমাইপণ্ডিত বালক হইলেও তাঁহার হৃদয়ে মায়ের মত স্নেহ। কোলের শিশুর মুখখানি মলিন দেখিলে মায়ের হৃদয়ে যেরূপ যাতনা হয়, দিগ্বিজয়ীর নিস্প্রভ বিমলিন মুখ দেখিয়া সদয়-হৃদয় নিমাই স্নেহস্নিগ্ধ মুখে বলিলেন,—"দিগ্বিজয়ী ঠাকুর, আপনার শ্লোকে প্রশংসার বিষয় অনেক আছে। ইহাতে শব্দালঙ্কার আছে, অর্থালঙ্কার আছে। ইহার দুই স্থানে শব্দালঙ্কার ও তিন স্থানে অর্থালঙ্কার দৃষ্ট হইতেছে।

শব্দালঙ্কারের মধ্যে প্রথমতঃ আমি অনুপ্রাসের কথাই বলিতেছি। আপনার শ্লোকের তিন পাদেই অনুপ্রাস আছে, প্রথম চরণে পঞ্চ তকার, তৃতীয় চরণে পঞ্চ রকার এবং চতুর্থ চরণে ভকার চতুষ্টয় বিদ্যমান থাকিয়া যথারীতি অনুপ্রাসের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অতি সুন্দর অনুপ্রাসে পদ্যের লালিত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মাতা যেমন শিশুর মনস্তুষ্টির জন্য অনেক প্রকার স্তোভবাক্য বলিয়া শিশুকে সান্ত্বনা প্রদান করেন, নিমাইসুন্দর ঠিক সেইভাবে দিগ্বিজয়ীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন:—দেখুন দিগ্বিজয়ী ঠাকুর "পুনরুক্তবদাভাস"—কাব্যের একটী প্রশংসনীয় শব্দালঙ্কার। "পুনরুক্তবদাভাস"—কাহাকে বলে—আপনার তো তাহা অবিদিত নহে।

আপাততো যদর্থস্য পৌনরুক্ত্যেনভাসনম্।
পুনরুক্তবদাভাসঃ স ভিন্নাকারশব্দগঃ॥

"শ্রীলক্ষ্মীঃ" পদে শ্রীশব্দের অপর পর্য্যায় লক্ষ্মী হইলেও এখানে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই। শব্দবিন্যাসটী পুনরুক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাকে পুনরুক্তি দোষ বলা যায় না।

শ্রীশব্দটী লক্ষ্মীশব্দের পর্য্যায়ভুক্ত, যথা অমরকোষে—

লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীর্হরিপ্রিয়া।
ইন্দিরা লোকমাতা, মা, ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমা॥

কিন্তু এতদ্ব্যতীত ইহার আরও অর্থ আছে। শ্রীশব্দটী ভগ ও নিরতিশয় শোভা অর্থও প্রকাশ করে। সুতরাং এখানে শ্রীলক্ষ্মী অর্থ,—পরম শোভাশালিনী লক্ষ্মী।

ইহাই পুনরুক্তবদাভাস! এইরূপ প্রয়োগ শব্দালঙ্কার বলিয়াই গণ্য।

এক্ষণে আমি আপনার শ্লোকের অর্থালঙ্কারের কথা বলিতেছি।

"লক্ষ্মীরিব" বাক্যে উপমা প্রদর্শিত হইয়াছে। এটী অবশ্যই সাধারণ অলঙ্কাররূপেই এখানে গণ্য, কিন্তু অপর যে একটি অর্থালঙ্কার আপনার শ্লোকে দেখিতে পাই, তাহা অতি চমৎকার। আমি এখানে "বিরোধাভাস" অলঙ্কারটীর কথাই বলিতেছি।

জলে কমলের জন্ম, একথা সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু কমলে গঙ্গার উৎপত্তি, একথায় চমৎকারিত্ব আছে। কমলে কি কখনও গঙ্গা জন্মিতে পারে? ইহা অসম্ভব—ইহা অতি বিরুদ্ধ। কিন্তু আপনি এই অসম্ভবকে প্রকৃত সত্যরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই

বিরোধ যে বিরোধ নয়, কেবল বিরোধ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়—আপনি তাহা সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন।

আপনি বলিয়াছেন বিষ্ণুচরণ কমল হইতে গঙ্গার উৎপত্তি। এ অতি চমৎকার বিরোধাভাস অলঙ্কার। ইহাতে বিরোধ নাই, কেবল বিরোধের আভাস মাত্র প্রতীয়মান হইতেছে।

"আভাসত্বাৎ বিরোধস্য বিরোধাভাস ইষ্যতে।"

আপনার শ্লোক শুনিয়া আমার মনে সহসা একটী ভাবের উদয় হইল :—

অম্বুজমম্বুনি জাতং
ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং
পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা॥

অর্থাৎ জলেই পদ্ম জন্মে, কমল হইতে কখনও জলের জন্ম হয় না। কিন্তু কমলপদ মুরারিতে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়, তাঁহার চরণকমল হইতেই পুণ্যতোয়া মহানদী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে।

আরও একটি অর্থালঙ্কারের কথা বলিতেছি। উহা—অনুমানালঙ্কার।" সাধন বা হেতু দ্বারা সাধ্যের জ্ঞানসূচক অলঙ্কারকেই অনুমানালঙ্কার বলা হয়।

এস্থলে গঙ্গার মহত্বই—সাধ্য।

আপনি তাহার এই হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন যে,—ইনি বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে উৎপন্না। বিষ্ণু-পাদপদ্ম নিরতিশয় মহৎ, যাহা বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত তাহাও মহৎ, গঙ্গা বিষ্ণু-পাদপদ্ম-সম্ভূতা,

সুতরাং অনুমিতি দ্বারা গঙ্গার মহত্ত্ব স্থিরীকৃত হইল। ইহাই অনুমানালঙ্কার।

আপনার কবিতা প্রতিভাময়ী, ইহাতে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির বহু পরিচয় পাওয়া যায়। সবিশেষ বিচার করিলে ইহাতে আরও বহু বহু গুণের নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ আপনি দেবতার বরে কবিত্ব শক্তি লাভ করিয়াছেন।

নিমাই পণ্ডিতের সান্ত্বনা বা স্তোভ বাক্য শুনিয়াও দিগ্বিজয়ীর মন প্রবোধ মানিল না। তিনি নিমাইর অপরিমেয় পাণ্ডিত্য প্রতিভা অপূর্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখে কোনও কথার স্ফূর্ত্তি হইল না। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তীব্রালোকে খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতি যেমন অদৃশ্য হইয়া যায়, নিমাইর সম্মুখে দিগ্বিজয়ীর দিগ্বিজয়িনী প্রতিভাও তেমনি ম্লান হইয়া পড়িল।

দিগ্বিজয়ী নিমাইর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—মুখখানি যেন চির সমুজ্জ্বল, চিরমধুর স্নিগ্ধ প্রতিভার আধার। এমন পাণ্ডিত্য এমন মাধুর্য্য ও এমন প্রসন্ন বাৎসল্যের এরূপ সংমিশ্রণ দিগ্বিজয়ী আর কোথাও দেখিতে পান নাই। দিগ্বিজয়ীর ইচ্ছা—তিনি নিমাই পণ্ডিতের চরণতলে পড়িয়া একবার কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করেন—"বল শুনি তুমি কে,—তুমি যে হও সে হও, কিন্তু তুমি যে মানুষ নও—ইহা নিশ্চয়। মানুষের মুখে আমি এমন ভাব আর কখনও দেখি নাই।"

কিন্তু দিগ্বিজয়ীর হৃদয় তখনও এত নির্ম্মল ও নরম হয় নাই যে ভক্তিভাবে মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিতে পারেন, অভিমানের লেশা-

ভাস তখনও উহার হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, না জানি কি অপরাধে সরস্বতী দেবী আমার প্রতি রুষ্টা হইয়াছেন, তাই আজ এই বালকের দ্বারা আমাকে অপ্রতিভ করিলেন।”

যাহা হউক, তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, “নিমাই পণ্ডিত, তোমার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। তোমার শাস্ত্রাভ্যাস নাই, অলঙ্কারশাস্ত্র-অধ্যয়ন নাই, কিন্তু অতি বিস্ময়ের কথা এই যে তুমি কোন্ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলে!

নিমাই পণ্ডিত অতি ভাল মানুষের ন্যায় শিষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন,—দিগ্বিজয়ী ঠাকুর, শাস্ত্রের বিচার বুঝি না, ভালমন্দও জানি না, সরস্বতী যাহা বলাইয়াছিলেন, তাহাই বলিয়াছি। এজন্ত আপনি কিছুই মনে করিবেন না।”

দিগ্বিজয়ীব চক্ষু দুইটী ছল্ ছল্ হইয়া উঠিল। বিস্ময়ের প্রভাব কমিল, আর অমনি পরাভবের প্রভাব তাঁহার হৃদয়ে নূতন বেগে উথলিয়া উঠিল। তাঁহার নিষ্প্রভ মলিন ও কাঁদ-কাঁদ মুখখানি দেখিয়া নিমাই পণ্ডিতের শিষ্যগণ হাসিবার উপক্রম করিলেন। মর্য্যাদা-রক্ষক অমানি-মানদ নিমাই পণ্ডিত ইঙ্গিত করিয়া শিষ্য-দিগকে বাধা দিলেন, আবার শ্রদ্ধাপূর্ণ অথচ সকরুণ নয়নে দিগ্বিজয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন :—

“দিগ্বিজয়ী ঠাকুর, আপনি মহাপণ্ডিত, কবি-শিরোমণি। আপনি যে সকল শ্লোক আজ শুনাইলেন, এরূপ দ্রুতরচিত শ্লোকাবলী রচয়িতা প্রকৃতই দুর্লভ। তবে দোষের কথা,—তা কোন্ কাব্যই বা

নির্দ্দোষ? বিচার করিয়া দেখিলে ভবভূতি কালিদাস ও জয়দেবাদির কাব্য হইতেও দোষ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। তাহাতে কি তাঁহাদের কবিত্ব গৌরবের ক্ষতি হয়? আপনার কবিত্ব-গৌরবে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেছি। দোষ-গুণ-বিচারশক্তি, আর কবিত্ব-শক্তি এক কথা নহে। দোষগুণ-বিচার সকলেই করিতে পারে, কিন্তু কবিত্বের শক্তি অতি দুর্ল্লভ। আমি আপনার নিকট শিশু মাত্র। আমার শৈশবচাপল্যজনিত অপরাধ লইবেন না, আমি আপনার শিষ্যের সমানও নই। আজ বাসায় গমন করুন। কল্য আবার দেখা হইবে, আবার আপনার মুখে শাস্ত্রবিচার শুনিব।

দিগ্বিজয়ী ও নিমাই পণ্ডিত আপন গৃহে গমন করিলেন। দিগ্-বিজয়ী সারা রাত্রি সরস্বতীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। সরস্বতী স্বপ্ন-যোগে তাঁহাকে জানাইলেন—নিমাই পণ্ডিত মানুষ নহেন, স্বয়ং ভগবান্। রাত্রি অবসান হওয়া মাত্রই দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর শ্রীচরণে শরণ লইয়া প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো, আর আমার নিকট আত্মগোপন করিও না। এখন আমায় কৃপা কর।" স্বয়ং সরস্বতী আমাকে জানাইয়াছেন,—**তুমি স্বয়ং ভগবান্**।

শ্রীশ্রীনিমাই পণ্ডিত তাঁহার চির-সঞ্চিত কর্ম্মবন্ধন ঘুচাইয়া দিয়া তাঁহাকে শ্রীচরণাশ্রিত করিয়া লইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জাহ্নবীতটে কতরূপ লীলা প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সেই সকল লীলার অল্পমাত্রই জীবগণের আস্বাদনের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দিগ্বিজয়ীর মুখেও তিনি গঙ্গামাহাত্ম্য প্রকাশ করাইলেন।

দিগ্বিজয়ীর শ্লোকের যে অংশ বিরোধভাস অলঙ্কারে বিভূষিত, করুণাময় সেই অংশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অর্থাৎ জলেই কমলের জন্ম, কিন্তু শ্রীভগবানের চরণ-কমলের এমনই মাহাত্ম্য, যে উহা হইতেই জাহ্নবীধারা প্রবাহিতা এবং সেই ধারা জীবগণের নিস্তারের উপায়রূপে বিরাজমানা।

জীবের চিরসুহৃদ্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দিগ্বিজয়ীকে গঙ্গাঘাটে দয়া করিলেন কেন? আর তিনি তাঁহার দ্বারা গঙ্গামাহাত্ম্যসূচক শ্লোকই বা বর্ণনা করিলেন কেন? দয়াময় এতদ্দ্বারা জীবগণকে বুঝাইলেন, জাহ্নবী পতিতপাবনী, কলুষনিবারিণী। যাঁহারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম খুঁজিতে যায়, তাহাদিগকে জাহ্নবীর শরণাপন্ন হইতে হইবে, ইহা একটী সাধনা-বিশেষ। অদৃষ্ট বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইলে তৎসংসৃষ্ট দৃষ্ট বস্তুর সাহায্য লইয়া তাহার অনুসন্ধান করাই সহজ উপায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ শ্রীভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন:—

মার্গন্তি যত্তে মুখপদ্মনীড়ৈশ্ছন্দঃসুপর্ণৈঃ ঋষয়ো বিবিক্তে
যস্যাঘমর্ষোদ-সরিদ্বারায়াঃ পদং পদং তীর্থপদঃ প্রপন্নাঃ।

অর্থাৎ "হে ভগবন্! আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মের শরণ লইলাম। ঋষিগণ তোমার শ্রীপাদপদ্মের অনুসন্ধান করার সুবিধাজনক প্রণালী অবলম্বন করেন। তাঁহারা জানেন, বেদরূপ-বিহঙ্গগণের আশ্রয় স্থান,—তোমারই শ্রীপাদপদ্ম। বৃক্ষাদি-বিবর্জ্জিত

নিরাশ্রয় প্রান্তরের পথিক যেমন গগনচর বিহগগণের সান্ধ্যগতি দেখিয়া বৃক্ষাদির অন্বেষণে সেই দিকে ধাবিত হয়, অসঙ্গচিত্ত ঋষিরাও ঠিক সেইরূপ বেদরূপ পক্ষিগণের অনুসরণ করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কিন্তু তোমার শ্রীপাদপদ্মলাভের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আরও সহজ উপায় আছে। তোমার শ্রীচরণ হইতেই যখন পতিতপাবনী জীবনিস্তারিণী জাহ্নবীর উদ্ভব, তখন সেই জাহ্নবীর সেবা দ্বারাও তোমার শ্রীপাদ-পদ্মের প্রান্তে উপস্থিত হওয়ার উপায় রহিয়াছে।"

জাহ্নবী পাপনাশিনী, নরকনিবারণী,—জাহ্নবী শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী। তাই কলিকলুষনিস্তারিণী জাহ্নবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাইয়া দয়াময় দিগ্বিজয়ীর চিত্ত সংশোধন করিলেন, তাঁহার পাপ নাশ হইল, তাঁহার হৃদয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপাদৃষ্টির উপযোগী হইল।

দুই চারি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহার হৃদয়ে শ্রীগৌরভক্তি উছলিয়া উঠিল। তখন দিগ্বিজয়ী গৌর-কৃপা বুঝিতে সমর্থ হইলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে চিরদিনের তরে আশ্রয় লইলেন।

ভক্তিলাভের প্রাথমিক অবস্থা সাধন-সাধ্য। সাধন দ্বারা চিত্ত ভগবদ্ভক্তি লাভের উপযোগী হয়। এস্থলে মহাপ্রভু দেখাইলেন শ্রীশ্রীগঙ্গামাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই পাপ-নাশের এক মহাসাধন। তাই শ্রীশ্রীগঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাইয়াই পরম করুণাময় ভগবান্ দিগ্বিজয়ীকে আপন শ্রীচরণের নিত্যদাস করিয়া লইলেন।

৪

দিগ্বিজয়ীর পরাজয়ের বার্ত্তা পরদিন রাত্রি প্রভাত হওয়ামাত্র সমগ্র নদীয়ায় প্রচারিত হইল—সর্ব্বত্রই এক কথা—"নিমাই পণ্ডিতের নিকট দিগ্বিজয়ী পরাস্ত হইয়াছেন—অত বড় দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। দশদিকে জয়-জয় রবের ধ্বনি উঠিল। সকলেই বলিতে লাগিলেন—"ভাগ্যে জগন্নাথ মিশ্র-নন্দন নিমাই, পণ্ডিত হইয়াছেন, তাই নবদ্বীপের মান রক্ষা হইল। নিমাই বিদ্যার গৌরব করেন, আর আমরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তাঁহার নিন্দা করি, এখন বুঝিলাম নিমাই পণ্ডিতের গর্ব্ব সার্থক। পণ্ডিতেরা সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"নিমাই সেদিনকার বালক কিন্তু কি অমানুষী প্রতিভা! আমরা কতজনকে কত পদবী দিয়া থাকি। এখন নিমাই পণ্ডিতকে "বাদিসিংহ" পদবী দেওয়া হউক। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

সকল লোকের হৈল মহাশ্চার্য্য জ্ঞান।
নিমাই পণ্ডিত হয় বড় বিদ্যাবান॥
দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিল যাঁর ঠাঞি।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাই॥
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাই পণ্ডিত।
এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত॥
কেহ কেহ বলে "ভাই মিলি সর্ব্বজনে।
বাদিসিংহ বলিয়া পদবী দিব তানে॥"

এইরূপে নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গের অমানুষী বিদ্যাবুদ্ধি-প্রতিভা-গৌরব প্রকাশ পাইয়াছিল।

শ্রীভগবানের অপর এক শক্তি—সর্ব্বলোকের চিত্ত-আকর্ষণ। তিনি জীবের চিত্ত স্বীয় চরণের দিকে আকর্ষণ করেন, এই অর্থে শ্রীভগবানের এক নাম কৃষ্ণ। গৌরাঙ্গসুন্দর নিমাই পণ্ডিতও কৃষ্ণ। তাঁহার লোকাকর্ষণ-শক্তি-লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি-লীলার দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্বলোকে হৈল ধ্বনি।
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি॥
বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।
নাম্বিয়া করেন নমস্কর বহুমতে॥

কেবল নমস্কারে নহে, সকলের গৃহ হইতেই প্রতিনিয়ত নিমাই পণ্ডিতের ঘরে ভক্তি-উপহারস্বরূপ যথেষ্ট ভোজ্য দ্রব্যাদি আসিত। নিমাই পণ্ডিত উহার এক তিলও স্বগৃহে রাখিতেন না! সকল বস্তু দীনদুঃখীকে বিলাইয়া দিতেন।

প্রভু সে পরমব্যয়ী ঈশ্বর ব্যাভার।
দুঃখিতের নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়া করে।
অন্নবস্ত্র কপর্দ্দক দেন পুরস্কারে॥

দীনের প্রতি দয়া করা করুণাবতারের চিরস্বভাব। অতিথি-সেবায় তাঁহার প্রীতি কেমন, তাহাও শুনুন :—

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সভাকারে॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশবিশ।
সভে নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ॥

অতিথি আসিলেই নিমাইর আনন্দ। ঘরে কি আছে, না আছে, তাহার খোঁজ নাই। নিমাই মাকে বলিয়া পাঠান, "মা আজ কুড়িজন সন্ন্যাসীর আগমন হইয়াছে, রন্ধন হউক।"

শচীমাতা ভাবিয়া আকুল, ঘরে কিছু নাই, রান্না হইবে কি? কিন্তু বিশ্বম্ভরের গৃহে অভাব কিসের? শচীমাতার চিন্তামাত্র সহসা বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইত। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ এইরূপেই প্রয়োজনীয় দ্রব্য জোটাইতেন, লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করিতেন। নিমাই স্বয়ং অতিথিদের নিকট বসিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেন। এইরূপে নিমাই গৃহস্থদিগকে আতিথ্যধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন :—

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূলকর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশুপক্ষী হইতেও অধম বলি তারে॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে।
সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥
সত্যবাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি অতিথিশূন্য না হয় তাহার॥

নিমাই পণ্ডিতের এইরূপ আচরণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দীনদুঃখিপরিত্রাণের জন্যই তিনি নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

লক্ষ্মীদেবীও স্বয়ং লক্ষ্মী। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিজহস্তে সংসারের কার্য্য করিতেন, দেবালয়ে যাইয়া দেবালয় মার্জ্জন করিতেন, দেবালয়ে শঙ্খ চক্র আঁকিতেন, স্বস্তিকমণ্ডলী আঁকিতেন, পূজার সাজ করিতেন এবং বৃদ্ধা শশ্রুমাতার সেবা করিতেন।

এইরূপে অধ্যাপন ও গৃহস্থধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ নদীয়ায় বিরাজ করিয়াছিলেন।

এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে গমনের জন্য তাঁহার মনে বাসনা হইল। মায়ের নিকট বিদায় লইলেন, প্রিয়তমা অঙ্কলক্ষ্মী স্বয়ং লক্ষ্মীকে বলিয়া গেলেন, "আমি সত্বরেই ফিরিয়া আসিব, তুমি আমার বৃদ্ধা মাতাকে দেখিও, সতত তাঁহার সেবা করিও।"

এই বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শিষ্যগণসহ পূর্ব্ববঙ্গাভিমুখে গমন করিলেন। পথে পথে নরনারীগণ তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি ধীরে ধীরে কয়েকদিন পরে পদ্মাবতী নদীতটে উপনীত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর পদ্মার পুলিন, পদ্মার জল ও পদ্মার তরঙ্গ দেখিয়া আনন্দলাভ করিলেন। পদ্মার পর পারে গিয়া কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থান করিলেন। এই সময়ে তিনি প্রতিদিন পদ্মায় স্নান করিয়া পদ্মাবতীকে প্রকৃতপক্ষেই পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতাকার বলেন :—

দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহাকুতুহলে।
গণসহ স্নান করিলেন তার জলে॥
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেইদিন হৈতে।
যোগ্যা হৈলা সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে॥

ফলতঃ মহাপ্রভুর শুভাগমনে বঙ্গদেশ ধন্য হইল, প্রত্যহ শত শত লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন, তাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেন—আমাদের মহাভাগ্য যে এদেশে আপনার শুভাগমন হইয়াছে, আমরা আপনার নাম শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, অর্থাদিসহ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া, অধ্যয়ন করিব, আপনি স্বয়ং শুভাগমন করিয়া আমাদের সে বাসনা পূর্ণ করিলেন। আপনি স্বয়ং বৃহস্পতি ;—তাই বা বলি কেন, আপনি ঈশ্বর। আমাদিগকে বিদ্যা দান করুন, আপনি যে ব্যাকরণের টিপ্পনী লিখিয়াছেন, সেই টিপ্পনী পড়িতে আমাদের ইচ্ছা।”

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ইহাদের বাসনা সফল করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সকলেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের শুভাগমে বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়াছিল।

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্যসঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রীপুরুষে॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দুই তিনমাসকাল পদ্মাবতীতটে অবস্থান করিয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য হইয়াছিল যথা :—

সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথায়।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ঠাঞি॥
মহাবিদ্যা-গোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে॥

এই সময়ে তপনমিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত হয়েন, তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ বারাণসীধামে প্রেরণ করেন। পরে এই তপনমিশ্র দ্বারা তিনি অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বিরহে লক্ষ্মীদেবী অন্তর্ধান করিলেন। সাধারণ লোকেরা জানিল কালসর্পদংশনে শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্কলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। শচীমাতার অবস্থা ইহাতে কিরূপ হইল, তাহা বর্ণনা করাই বাহুল্য মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে ফিরিলেন, শোকসংবাদ শুনিলেন। কিন্তু তিনি নিজের কথা ভুলিয়া বধূ-বিরহ-বিধুরা বৃদ্ধা মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া সুস্থির করিতে লাগিলেন।

প্রভুবোলে "মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্যে যে আছে সে ঘুচিবে কেমনে॥
এইমত কালগতি,—কেহ কারো নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন এই সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ,—কে বলিতে পারে আর॥"

মাতার মন ইহাতে প্রবোধ মানিল না। পাছে নিমাইর মনে কষ্ট হয় এই আশঙ্কায় তিনি মনের আগুন মনে চাপা

দিয়া সংসারের কার্য্য করিতেন। নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন-গম্ভীরভাবে অধ্যাপনায় মন দিলেন। কিন্তু শচীদেবীর চিত্তে শান্তি নাই,—আবার কবে তাঁহার ঘরে আর একটি বধূলক্ষ্মী দর্শন দিবেন, তাঁহার মনে কেবলই এই চিন্তাই জাগিয়া থাকিত।

এই সময়ে এই ভুবন-বন্দনীয় ভুবনবিজয়ী অধ্যাপক শ্রীগৌরাঙ্গের নাম-যশ দশদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নিমাইর তরুণ যৌবন, ভুবনমোহন রূপ,—অসীম পাণ্ডিত্য, দশদিক্-ব্যাপী অনন্ত যশপ্রবাহ ;—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল তাঁহার চরিত্রগৌরব। তাঁহার যত চাঞ্চল্য যত চাপল্য সকলই পুরুষের সহিত। স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি সলজ্জভাবে একদিক চলিয়া যাইতেন, কাহারও মুখপানে তাকাইতেন না, কাহারও সমক্ষে কোন অশিষ্ট বা অন্যায় কথা বলিতেন না—সেরূপ ভাবও তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার লিখিয়াছেন :—

এই মত চাপল্য করেন সভাসনে।
সবে স্ত্রীমাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টিকোণে॥
স্ত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণ না করিলা বিদিত সংসারে॥

প্রেম-পবিত্রতার অফুরন্ত উৎস,—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এই পুণ্যচিত্র অতি সুন্দর ও অতি পবিত্র।

তাঁহার ভাবগতি ও কার্য্য দেখিয়া সকলেই মনে করিতেন নিমাইপণ্ডিত মনুষ্য নহেন—**স্বয়ং পরমেশ্বর।**



শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

প্রিয়পাঠক, নিমাইর চাঞ্চল্য ও পাণ্ডিত্যপ্রভাবের মধুময়ী লীলা গঙ্গাঘাটে কিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। চাঞ্চল্য-ভাব,—উদ্যমেরই অভিব্যক্তি। নিমাইর চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়া একটা অলৌকিক শক্তি ক্রমেই অভিব্যক্ত হইতেছিল।

কিন্তু শক্তির সহিত শান্তির চিরসম্বন্ধ—সে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শক্তি বুঝিতে হইলে শান্তি বুঝিতে হয়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন, যে শক্তি জড়জগতে প্রকাশিত হইয়া অনন্ত পরিবর্ত্তন সংঘটন করে, সেই শক্তির সঞ্চয়-স্থান—ইথার। ইথারেই জড়শক্তিসমূহ গুপ্ত ও সঞ্চিত থাকে। কিন্তু সেথানে ইহার প্রকাশ নাই, বিকাশ নাই—সে এক মহানীরবতাময় ও মহাশান্তিময় স্থান। আমরা এইরূপে দেখাইতে প্রয়াস পাইব, শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দরেরও শক্তি-সংস্থানের একটা শান্তিময় আধার আছেন, একটা শান্তিময়ী মূর্ত্তি আছেন।

নিমাই যখন অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়া গঙ্গাতটে অনন্ত চাঞ্চল্যলীলায় মত্ত ছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে একটী শান্তিময়ী শ্রীমূর্ত্তি নবদ্বীপে নব-ইন্দীবর ন্যায় আবির্ভূতা হয়েন। শ্রীশ্রীলীলা-গ্রন্থ পাঠকগণ, প্রথমতঃ গঙ্গাঘাটেই সেই স্বর্ণলক্ষ্মীর শ্রীচরণ সন্দর্শন লাভ করেন।

ইনি নবদ্বীপনিবাসী শ্রীপাদ সনাতন নামক এক বিপ্রের গৃহে

আবির্ভূতা হয়েন। সনাতন পরম পণ্ডিত ছিলেন। সনাতন রাজপণ্ডিত,—যেমন বিদ্যা, তেমনই সম্মান—আবার তেমনই ঐশ্বর্য্য। তাঁহার বিদ্যা পর-পক্ষ-দর্প-দলনের জন্য বিনিযোজিত হইত না। বিদ্যার যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, সনাতনের বিদ্যা সেই ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হইত। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। একধারে এরূপ পাণ্ডিত্য ও এরূপ ভক্তি তখনও অতি বিরল ছিল। তাঁহার চরিত্র যেমন পবিত্র, তেমনই উদার ছিল। গর্ব্ব, অভিমান দ্বেষ, অসূয়া বিবাদ কলহের কথা, সনাতন একেবারেই জানিতে না। তিনি সদ্বংশজাত ছিলেন। বিদ্যা, বৈভব, আভিজাত্য রাজসম্মান প্রভৃতিতে অনন্য-সাধারণ সৌভাগ্য-সম্পন্ন হইয়াও সনাতন নিরভিমান ও অকিঞ্চন ভক্তের ন্যায় দিন যাপন করিতেন। তাঁহার ভাবের ভিতরে কোনও প্রকার কপটতার লেশাভাস পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহার কোমল হৃদয় জীবের কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখ দেখিলেও ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তাঁহার ন্যায় পরোপকারী নবদ্বীপে অতি কমই ছিলেন। আত্মীয় স্বগণ বন্ধুবান্ধবদের ত কথাই ছিল না, অপরাপর বহু লোক প্রতিনিয়ত তাঁহার আলয়ে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইতেন। অতিথি সেবা তাঁহার নিত্য ব্রত ছিল। ইহার উপরে নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও যথেষ্ট সমারোহে সুসম্পন্ন হইত। সনাতনের প্রশান্ত সুন্দর গম্ভীর মুখচ্ছবিতে সর্ব্বদাই ভক্তিভাব বিকশিত থাকিত।* তাঁহাকে যে দেখিত, সেই তাঁহার সমক্ষে ভক্তিভরে অবনত হইত।

* শ্রীপাদ সনাতন মিশ্রের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে কোনও কথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি প্রচলিত প্রমাণ্য গ্রন্থে নাই। লোকমুখে জনশ্রুতিতে অনেক

সনাতন বিষ্ণু ভক্তিতে বিভোর থাকিতেন, বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতেন, অনুক্ষণ বিষ্ণু এই বর্ণদ্বয় তাঁহার জিহ্বায় নৃত্য করিত, এই নাম তাঁহার নিকট মধু হইতে ও মধুর বলিয়া মনে হইত। এই সদাশয় মহাপুরুষের ঔরসে মূর্ত্তিমতী ভক্তিশক্তি আবির্ভূত হইয়া সহসা তাঁহার গৃহ খানিকে অধিকতর সমুজ্জ্বল ও সমলঙ্কৃত করিয়া তোলেন। তাঁহার গৃহিণী সর্ব্বতোভাবে পতির অনুরূপা ছিলেন—পতিব্রতা, ভক্তিমতী, গৃহকার্য্যে দক্ষা-বিনীতা সনাতন-গৃহিণী আদর্শ মহিলা বলিয়া নারী-সমাজে সম্মানিতা হইতেন। সাধারণতঃ যে বয়সে সন্তান হয়, তিনি সে বয়স অতিক্রম করিলেন, গর্ভ লক্ষণ তখন ও দৃষ্ট হইল না। সততই সন্তান কামনায় তিনি বিষ্ণু পাদপদ্ম স্মরণ করিতেন, দয়াময় বিষ্ণুর কৃপা হইল, তাঁহারই প্রীতি-শক্তি সনাতন-গৃহিণীর উদরে আবির্ভূতা হইলেন। গর্ভে যে সেই প্রীতি-শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছেন, তাঁহার বহুল নিদর্শন ও দৃষ্ট হইতেছিল। যথাসময়ে এক দিবস শুভক্ষণে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিলেন।

কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সে সকল কথা পরস্পরবিরুদ্ধ। কেহবা তদ্বংশ্য বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছুক, কেহবা তাহার বিপরীত বলেন। এই সকল কারণে আমরা প্রামাণ্য প্রচলিত গ্রন্থ ব্যতীত নাম ধাম ও বংশ-পরিচয়ের কথা উল্লেখ করিলাম না। বিশেষতঃ ভক্তিগ্রন্থে ভক্তিই প্রাধান্যরূপে বর্ণনীয়। কাল্পনিক নাম ধামাদির সন্নিবেশ নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং সে প্রয়াস হইতে বিরত হইলাম।

সনাতন প্রসব-গৃহের দ্বারে গিয়া দেখিলেন, একখানি সমুজ্জ্বল কনক-প্রতিমা, সূতিকা ঘর আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি মনে করিলেন, এ মূর্ত্তি কখনই নর-শিশু নহেন,—ইনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। এমন রূপ, মুখের এমন ভাবও কি মানুষের হয়! বিস্ময়ে ও আনন্দে সনাতন স্তম্ভিত ভাবে শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, ঐ মূর্ত্তিখানি মাথায় তুলিয়া লইয়া তিনি নৃত্য করেন। কি বর্ণ, কি লাবণ্য, কি সুঠাম সুকোমল দেহ—কি অরুণ-রাগরঞ্জিত হস্ত ও পদতল, কি মসৃণ পক্কবিম্ববিনিন্দি ওষ্ঠ, কি স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল সুন্দর নব-নলিন-নিন্দি নয়ন-যুগল,—যে অঙ্গে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সেই অঙ্গ হইতেই যেন বিষ্ণুভক্তির আনন্দময় কিরণ প্রবাহ বিচ্ছুরিত হইয়া তাঁহার নেত্র উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে লাগিল। রাজপণ্ডিত বুঝিলেন— বিষ্ণুভক্তির * ফল ফলিয়াছে, ইনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া,—বুঝিয়াই নাম রাখিলেন **শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া**।

শুক্লপক্ষের শশীর ন্যায় দিন দিন এই শ্রীমূর্ত্তির আকার ও শোভা-সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই কনক-প্রতিমার আকার দীর্ঘ ছাঁচের, ঢল ঢল লাবণ্যময় সুগোল গঠন। ইনি স্থূলাঙ্গী নহেন, অথচ নবনী-বিনিন্দি কোমলতায় শ্রীঅঙ্গের সর্ব্বত্রই যেন লাবণ্য খেলিয়া বেড়াইতেছে—মুখখানি দেখিলে মনে হয় যেন কত দয়া—কত স্নেহ, কত আনন্দ এবং কত শান্তি, লজ্জা ও প্রসন্নতা ঐ শ্রীমুখে বিরাজিত। যাহার দিকে উনি

---

* ভগবান্। শ্রীবিষ্ণুভক্তিঃ সম্ভবৎসু বর্ত্তত এব
অদ্বৈত। ইদানীং সৈব বিষ্ণুপ্রিয়া।—(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ২য় অঙ্কে)

কৃপা করিয়া দৃষ্টিপাত করেন, তাহারই মনে হয় যেন "মা" বলিয়া কোলে তুলিয়া লই। প্রায় সকলেই উঁহাকে মা লক্ষ্মী বলিয়া ডাকিতেন। যেদিন শ্রীবিশম্ভর-বিরহে শচীদেবীর গৃহ অন্ধকার করিয়া শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভরের অঙ্কলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন, সেই দিন হইতেই শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর মুখে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব দেখা দিল। উঁহার শৈশব নেত্রে অনুরাগের ভাব ফুটিয়া উঠিল, লজ্জার কোমলরাগে উহাতে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের রেখা টানিয়া দিল। ইনি শিশুকালে খেলার ছলে বিষ্ণুপূজা করিতেন, সে খেলা এখন প্রকৃত পূজায় পরিণত হইল।

শ্রীশ্রীপ্রিয়াজী মাতার সহিত সলজ্জচরণে গঙ্গাঘাটে স্নান করিতে যান, তাঁহার টুকটুকে রাঙ্গা পাখানি ভূমির উপরে পড়ে, দেখিলে মনে হয় ভূমির উপরে যেন কনকপদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। নবদ্বীপবাসীরা প্রতিদিন এই শোভা দেখিয়া কৃতার্থ হইতেন। কাহারও কাহারও মনে হইত, এই বালিকার গমন সময়ে ইহার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিই, আর তাহার উপরে যেন এই সুকোমল চরণকমল বিন্যস্ত হয়।

মায়ের সহিত প্রতিদিন শ্রীশ্রীপ্রিয়াজী গঙ্গাস্নান করিতেন, সলজ্জ ভাবে গঙ্গাঘাটে আসিয়া দাঁড়াইতেন, আর দ্রবব্রহ্ম গঙ্গাদেবী শান্তিময়ী স্বয়ং লক্ষ্মীর স্নিগ্ধ পদকমল,—স্বীয় তটের পরম অলঙ্কার মনে করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন।

যে ঘাটে রাজপণ্ডিত সনাতনের গৃহিণী স্নান করিতে আগমন করিতেন, শচীদেবীও সেই ঘাটেই স্নান করিতেন। ইঁহারা প্রায় এক সময়েই স্নানার্থ গঙ্গাঘাটে সম্মিলিত হইতেন।

লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের পর হইতেই শচীদেবীর হৃদয় একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার নিকট বাড়ী ঘর সততই শূন্য-শূন্য বোধ হইত। ছেলেটী পরম পণ্ডিত, জগৎমান্য, নবীন বয়স অথচ সংসারে উদাসী, তাঁহার উপরে আবার গৃহশূন্য। শচীদেবী পাগলিনীর মত গৃহে থাকিতেন, আর গঙ্গাঘাটে স্নানে আসিলেই বালিকাদের উপরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িত। তাঁহার পুত্রের উপযুক্তা একটি মেয়ে তাঁহার চক্ষে পড়ে কিনা, গঙ্গাঘাটে আসিয়া ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইত।

একদিন রাজপণ্ডিত-গৃহিণী তাঁহার কন্যার সহিত স্নানে আসিয়াছেন, কন্যাটি বৃদ্ধা শচীদেবীকে দেখা মাত্রই সলজ্জভাবে তাঁহার পদান্তিকে গিয়া প্রণত হইলেন। শচী মাতা মুখখানি ধরিয়া তুলিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন—"ওগো পণ্ডিত-গৃহিণী, মেয়েটী তোমার? কি সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়ে। এইত বয়স, কেমন স্নিগ্ধ-ভাব, কেমন লজ্জা ও ভক্তিমাখা মুখখানি। তুমি রত্নগর্ভা। ভগবান্ তোমায় বেশ মেয়েটী দিয়াছেন, বেঁচে থাকুক সুপাত্রের হাতে পড়ুক।

রাজপণ্ডিত-গৃহিণী। হাঁ মা, সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

শচী। এখন বিবাহ দিলেও হয়, এ বয়সে বিবাহ দেওয়া চলে।

প্রিয়াজী অধোবদনে সলজ্জচরণে একটুকু দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজপণ্ডিত-গৃহিণী। দিলে হয়, কিন্তু এখনও কোথাও কোন

কথা উঠে নাই। বিধাতা কোথায় কি লিখিয়াছেন, বলা যায় না। এখন আপনাদের আশীর্ব্বাদে উপযুক্ত পাত্রে মেয়েটী পড়ে, তবেই সুখের কথা।

শচীদেবী সতৃষ্ণনয়নে প্রিয়াজীর দিকে আবার তাকাইলেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তখনই কন্যাটীকে কোলে তুলিয়া গৃহ পানে চলিয়া যান। শচীদেবী প্রিয়াজীর নিকটে গিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "মা আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে," প্রিয়াজী সলজ্জভাবে মস্তক হেলাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

শচীমাতার প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এইরূপ ভাবের উদয় হওয়ার একটী কারণ নবদ্বীপবাসী মুকুন্দ পণ্ডিত প্রণীত "গৌরাঙ্গ-উদয়" গ্রন্থে আছে বলিয়া জানা যায়। উহাতে লিখিত আছে, শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীউ বিবাহের বহু পূর্ব্বে জাহ্নবী-ঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। প্রেমময়ের শুভ দর্শন মাত্রে তাঁহার হৃদয়ে নবানুরাগের উদয় হয়, সেই অনুরাগের সকল লক্ষণই তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু লজ্জা ও সংযমই তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গৌরব। তিনি মনের ভাবে চাপা দিয়া সলজ্জ ভাবে গঙ্গাঘাটে আসিতেন, কিন্তু তাঁহার অনুরাগময় নয়ন-যুগল সেই স্বর্ণগৌর বিশ্বম্ভরকে চকিতের ন্যায় অনুসন্ধান করিত।

নিমাই পণ্ডিতের নাম তখন সমগ্র নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহাকে সকলেই জানিত, প্রিয়াজীও মেয়েদের মুখে তাঁহার গুণগ্রামের কথা শুনিতে পাইতেন। শচীমাতা গঙ্গাঘাটে

স্নান করিতেন। তিনিই যে নিমাই পণ্ডিতের মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা জানিয়া তাঁহার নিকটে যাইতেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, তাঁহার মনে হইত তিনি বধূ হইয়া শচীদেবীর নিকটে থাকেন। তাঁহার হৃদয়ে এই বাসনা ক্রমশঃ বলবতী হইতে লাগিল, আর গঙ্গা-ঘাট তাঁহার নিকট ক্রমেই অধিকতর প্রিয়তর হইয়া উঠিল। রাত্রিতে তিনি মনে ভাবিতেন, কখন রাত্রি প্রভাত হইবে, আবার কখন গঙ্গাস্নান করিতে যাইবেন, তখন শচীমাতাকে দেখিতে পাইবেন কি না, দেখিতে পাইলে. তাঁহাকে প্রণাম করিবেন, আর সলজ্জ নয়নে ঘাটের এদিক ওদিকে যাইয়া দেখিবেন, তাঁহার চিত্তচোর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে আর একটি বার দেখিতে পান কি না ?

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নবানুরাগের ভাব-প্রকাশক একটি পদ বাসু-ঘোষের লেখায় প্রকাশিত আছে যথাঃ—

গোরারূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে সপনে।
যে দিকে ফিরাই আখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আখি।
কি ক্ষণে দেখিনু গোরা কিনা মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল।
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসুঘোষ বলে গোরা রমণী-মোহন॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গঙ্গাঘাটে শচীদেবীকে প্রায়শঃ দেখিনে পাইতেন, সলজ্জনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেন, সলজ্জ চরণে তাঁহার

নিকট উপস্থিত হইতেন ;—মুখখানি সরলতা ও প্রীতিমাখা, মস্তক অবনত করিয়া শচীমাতার চরণে প্রণাম করিতেন, আর মনে মনে বলিতেন "মা দয়াময়ি, তোমার পুত্র কি আমায় তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিবেন, আমি কি তোমার ঘরে গিয়া তোমাদের সেবাধিকার লাভ করিতে পারিব ?"

মনের কথা মনে থাকিত, কিন্তু শচীমাতার হৃদয়ে উহার তরঙ্গ পৌঁছিত। তিনি বুঝিতেন মেয়েটী তাঁহার শত জন্মের আপন ধন।

শ্রীশ্রীশচীদেবী ইতঃপূর্ব্বেও গঙ্গাঘাটে এই লক্ষ্মী প্রতিমা বালিকাটিকে দেখিতে পাইতেন, বালিকাটি তাঁহাকে দেখিলেই নিকটে আসিয়া প্রণাম করিতেন, স্নিগ্ধনয়নে আপন ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, কিন্তু অন্য কোন দিন তেমন লক্ষ্য করেন নাই। গঙ্গাঘাটে কত মেয়েই প্রতিদিন স্নান করিতে আইসে, শচীদেবী বৃদ্ধা, সকলেই তাঁহার সম্মান করেন। কিন্তু এই দিন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার নিকটে আইসামাত্রই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধা একবারে বিহ্বল হইলেন।

গঙ্গাঘাট হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য শেষ করিয়াই তিনি কাশীনাথ পণ্ডিতকে ডাকাইলেন। কাশীনাথ পণ্ডিত অতি সুজন, বিশেষতঃ ঘটকালিতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। কাশীনাথ তৎক্ষণাৎ আসিলেন। শচী বলিলেন, "বাবা কাশীনাথ, জানত আমার সোণার প্রতিমা বউমাকে হারা হইয়া আমি কি ভাবে আছি। বাড়ী ঘর সব যেন শূন্য-শূন্য। নিমাই

আমার একেই উদাসী। তাহাকে যেন এখন আরও উদাসী-উদাসী মনে হয়। এ দুঃখ আমি সহ্য করিতে পারি না। আজ গঙ্গঘাটে গিয়া রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যাটী দেখিয়া অবধি মনে হইতেছে, যদি এই মেয়েটিকে পাই, তবে আমার আঁধার ঘর আলোকিত হয়। মেয়েটী আমার নিমাইর ঠিক অনুরূপ। রং যেন কাঁচা সোণা। কেমন শান্ত ও সুশীলা। আর অতি ভক্তিমতী। দিনে দুই 'তিনবার গঙ্গাস্নান করে, দেব-দ্বিজে এমন অল্প বয়সে এত ভক্তি আমি আর কাহারও দেখি নাই। সনাতন বংশে ভাল,—সর্ব্বত্রই অতি সম্মানী। আমার নিমাই নব-দ্বীপ এখন প্রধান পণ্ডিত। বয়সই বা কি। তুমি একবার সনাতনের নিকটে যাইয়া বল, যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি আমার নিমাইকে কন্যাদান করিতে পারেন—যেমন মেয়ে তেমন ছেলে। বাবা কাশীনাথ, আর বিলম্ব করো না, এখনই যাও।

কাশীনাথ বলিলেন,—"একথা আমিও মনে মনে ভাবিতে-ছিলাম, আজ বলি, কাল বলি, বলিয়া আপনাকে বলিতে পারি নাই। আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। এতো ঘটাকার্য্য। কেবল বলার অপেক্ষা। রাজপণ্ডিত জগৎ ভ্রমিয়াও তাঁহার কন্যার জন্য এরূপ বর পাইবেন না। এই আমি এখনই যাচ্ছি।"

কাশীনাথ দুর্গা দুর্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিলেন, অনতিবিলম্বেই রাজপণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইয়া শুভ বিবাহের কথা তুলিলেন। বড় বেশী কথা বলিতে হইল না। শুনা মাত্রই রাজপণ্ডিত আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "আমার যে এমন ভাগ্য হবে, স্বপ্নেও তাহা

ভাবি নাই, আমি সর্ব্বদাই মনে করিতাম আমার মেয়েটিকে যদি নিমাইর হাতে দিতে পারি, তবে এ জীবনের একটি কার্য্য সম্পন্ন হয়। এ কার্য্যে শচীদেবীর অভিমত কি?" কাশীনাথ বলিলেন, "তাঁহার অভিমতি ও অনুমতি লইয়াই আমি আসিয়াছি।"

সনাতন বলিলেন, "আপনি এটুকু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আস্‌ছি।" এই বলিয়া সনাতন অন্তঃপুরে গিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে গৃহিণীর নিকটে এই কথা জ্ঞাপন করিলেন। সনাতন গৃহিণী হর্ষে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, "দয়াময় ভগবান্ সত্য সত্যই কি আমাদের এই সৌভাগ্য দিবেন? নিমাইর জননী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বড় ভালবাসেন, আজ গঙ্গাঘাটেও উহাকে কত আদর যত্ন করিলেন, আর এই মেয়েটীরও স্বভাবতঃই যেন উহার প্রতি টান। তা এ ঘরে পড়িলে, আমার মেয়ের ভাগ্যই বলিতে হইবে। নিমাইর মত রূপে, গুণে, মানে, সম্মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে সর্ব্বত্র পূজ্য বর কোথাও আছে বা থাকিতে পারে, বলিয়াই আমার মনে হয় না। অমন রূপ তো মানুষের হয় না। আর আপনিই তো কতদিন বলেছেন যে, নিমাই বালক বটে কিন্তু এমন পণ্ডিত কোন দেশেই নাই। আর অপেক্ষার প্রয়োজন নাই, যাহাতে অতি সত্বরে এই শুভ কার্য্য হয়, আপনি তাহার চেষ্টা দেখুন।"

রাজপণ্ডিত অপরাপর আত্মীয়গণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া কাশীনাথ পণ্ডিতকে বলিলেন, "যাহাতে এই শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, আপনাকে তাহা করিতেই হইবে।

অতি সত্বরে গিয়া নিমাইর জননী পূজনীয়া শচীদেবীকে আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করুন।"

কাশীনাথ প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে শচীদেবীর নিকট আসিয়া সকল কথা জানাইলেন। শচীদেবীর শোকাকুল ম্লানমুখে আনন্দের আলোক রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে আপন জনগণকে ডাকিয়া এই শুভ সংবাদ জানাইলেন। সংবাদ শুনিয়া সকলের হৃদয়ই ভাবি উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠিল।

শুভ বিবাহের প্রস্তাবে উভয় পক্ষের সম্মতি হইল। কিন্তু লক্ষ কথা না হইলে বিবাহ হয় না। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সহসা এই শুভ প্রস্তাবে এক বিষাদের ইঙ্গিত উপস্থাপিত করিলেন।

শ্রীপাদ মুরারি গুপ্ত তদীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীপাদ লোচনদাস উহারই মর্ম্মানুবাদ করিয়া বলেন :—

গণক কহিল শুন শুন হে পণ্ডিত।
আসিতে দেখিল গৌরচন্দ্রে আচম্বিত॥
তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন।
কৌতুকে তাহারে আমি যে কৈল বচন॥
কালি শুভ অধিবাস হইবে তোমার!
বিবাহ হইবে শুন বচন আমার॥
এ বোল শুনিয়া তেহো কহিল উত্তর।
কহ কোথা কার বিভা কেবা কন্যা বর॥

আমার সাক্ষাতে কথা কহিল যখন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর আচরণ॥

শ্রীপাদ সনাতন গণকের বাক্য শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি স্বভাবতঃই ধীর-প্রকৃতি, সুতরাং মাথায় হাত দিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি বিবাহের সবিশেষ উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছি, দ্রব্যাদিসংগ্রহও করিয়াছি। আমার কিছু ত্রুটি নাই। ইহাতে শ্রীমান্ গৌরসুন্দরের অভিমত হইল না—সকলই দৈবের হাত। আমার অপরাধ কি?" যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

গণকের মুখে শুনি এসব বচন।
ধৈর্য্য অবলম্বি কিছু না কৈল তখন॥
সনাতন পণ্ডিত সে চরিত্র উদার।
বন্ধুগণ লঞা করে অনুমান সার॥
নানা দ্রব্য কৈল নানা কৈল অলঙ্কার।
কাহাকে কি দোষ দিব করম আমার॥
আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি।
কি কারণে আদর ছাড়িলা গৌরহরি॥

এ দিকে শ্রীপাদ সনাতনের কথা শুনিয়া তাঁহার পত্নী মর্ম্মাহতা হইলেন। সনাতন-পত্নী সৎকুলজাতা, লজ্জাশীলা, বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তা ও পতিব্রতা। তিনি বুঝিতে পাইলেন, তাঁহার স্বামী পরম ধৈর্য্যশীল হইলেও মর্ম্মে মর্ম্মে ক্লেশ পাইতেছেন; আমার মনোবেদনায় তাঁহার হৃদয়ে আরও ক্লেশ হইল। তিনি বলিলেন—"এজন্য আপনার দুঃখ কি, লোক সমাজে নিন্দাই বা কি? নিমাই সুন্দর

নিজেই যখন এ বিবাহে অমত প্রকাশ করিয়াছেন, আপনার আর তাহাতে অপরাধ কি ? লোক-সমাজেই বা আপনার এজন্য কি নিন্দা হইতে পারে ? যাহা :শক্তির অতীত, সামর্থ্যের অতীত, তাহার জন্য দুঃখ করা কর্ত্তব্য নহে।”

পতিব্রতা, বুদ্ধিমতী পত্নীর মুখে এইরূপ সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া পণ্ডিত সনাতনের হৃদয় আশ্বস্ত হইল। তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত এই যুক্তি স্থির করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, “যখন বিশ্বম্ভরের এই কার্য্যে ইচ্ছা নাই, তখন আমার অপরাধ কি, কাজেই আমাকেও নবৃত্ত হইতে হইল।”

শ্রীপাদ সনাতন নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু এই ব্যাপারে ব্রাহ্মণ-দম্পতির হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা কাহাকে ও আর কোন কথা না বলিয়া গোপনে গোপনে মনের দুঃখ মনে মনে সহিতে লাগিলেন।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অন্তর্য্যামী ও পরম কারুণিক। যিনি জগতের জীবের উপর দয়া বৃষ্টি-সঞ্চার করিতেই অবতীর্ণ, তিনি কি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের হৃদয়ে দুঃখ যাতনা দিয়া স্থির থাকিতে পারেন ? কোন্ ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি গণকের নিকট ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাদৃশ গম্ভীর-চরিত্র বিশ্বম্ভরের হৃদয়ের কথা কে বুঝিতে পারে ?„এইরূপ উপেক্ষা ভগবানের লীলার এক বিশেষ-ভাব। বৃন্দাবন-লীলাতেও তাঁহার এইরূপ মর্ম্মান্তিক যাতনাদায়ক উপেক্ষার ভাব দৃষ্ট হয়। মহাজনগণ বলেন, নিজ-জনগণের প্রতি তাঁহার সাময়িক উপেক্ষা ভাব কেবল প্রেম-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যমূলক।

শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর দুঃখ-প্রশমনার্থ তখনই পরোক্ষে তাঁহাদিগকে জানাইলেন, তিনি কৌতুক-রভসে গণকের নিকট ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা কার্য্য বন্ধ রাখিলেন কেন? বিবাহ হউক না হউক, তাহাতে তাঁহার কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু এই বিবাহ না হওয়ায় পণ্ডিত সনাতনের মনে দুঃখ হইলে তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইবেন। বিশেষতঃ তাঁহার পরমারাধ্যা স্নেহময়ী জননীদেবী যখন কথা দিয়াছেন, তাহার উপরে তাঁহার নিজের কথা কোনও কার্য্যকরী হইতে পারে না। তিনি মায়ের কথা লঙ্ঘন করিতে একান্ত অসমর্থ। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

কৌতুক রভসে আমি গণকেরে বৈল।
না বুঝিয়া কার্য্যে কেনে অবহেলা কৈল॥
কার্য্য অবহেলা, তাহে নাহিক অধিক।
তা সভার চিত্তে দুঃখ এ নহে উচিত॥
মায়ে যে কহিল, তাহে আছে কোন কথা।
তাহার উপরে কেবা করয়ে অন্যথা॥
মিছা কার্য্য ক্ষতি, মিছে দুঃখ পাও চিতে।
করহ বিভার কার্য্য যে হয় উচিতে॥

ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরাঙ্গের এই কথাগুলি আপন ভাষায় শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে যাইয়া প্রকাশ করিলেন, বলিলেন—"আমি নিমাই পণ্ডিতের মনের কথা বুঝিয়াছি। তিনি কৌতুক করিয়াই গণকের নিকট ঐরূপ বলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ

নাই। তিনি অতি মাতৃভক্ত, সুপণ্ডিত, এবং পরম দয়াল। তিনি কি মায়ের কথা লঙ্ঘন করিবেন? আপনারা শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।”

২

রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র ইহাতে যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন, বিশেষ সংবাদ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। শুভ বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন পুর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইল।

শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরের শুভ পরিণয়-সংবাদ ভক্তগণের মধ্যে প্রচারিত হইল। সর্ব্বত্রই আনন্দের বন্যা প্রবাহ বহিয়া চলিল। বুদ্ধিমন্ত খাঁ প্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত, ইনি রাজসরকারে কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত বলিলেন, নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হইবে, “এ বড় আনন্দের কথা। এই বিবাহের ব্যয়ভার আমি একাই বহন করিব।” মুকুন্দসঞ্জয়েরও অবস্থা ভাল। তিনি বলিলেন, “আমাকে ছাড়িবে কেন, আমি কি একবারেই এই শুভ কার্য্যের কেহ নই?”

বুদ্ধিমন্ত বলিলেন, “আরে ভাই, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, “বামনিঞা” ভাবে এই শুভ ব্যাপার সম্পন্ন করা হইবে না। নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ এবার এমন সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিব, লোকে দেখিবে যেন রাজপুত্রের বিবাহ হইতেছে।” যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিঞা মত এ বিবাহে কিছু নাই॥

এ বিবাহ পণ্ডিতেরে করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥

শচীদেবীর আলয়ে বসিয়া ভক্তগণ ও আত্মীয় স্বজনগণ শুভ বিবাহের লগ্ন করিলেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ সনাতনও অতীব আহ্লাদের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিবাহ ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হইল, তাহার বিবরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহাতে চারিশত বৎসরের পূর্ব্বে বঙ্গে বিবাহের সমারোহ কি প্রকার ছিল, তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ জানা যায়। বিবাহ-উৎসবে যে কেমন ভরপুর আহ্লাদ আমোদ হইত, তাহারও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের উপরের কথা এই যে প্রিয়াজীর সহিত স্বয়ং ভগবানের বিবাহ-সম্মিলনের আনন্দময় ব্যাপারের বিবরণে ভক্ত চিত্তে আনন্দের যে উত্তাল তরঙ্গ লীলার উদয় হয়, আমরা সেই আনন্দসিন্ধুর কণামাত্র মানসনেত্রে সন্দর্শন করিলেও কৃতার্থ হইতে পারি। সেই শুভ সম্মিলনের সুখময় বিবরণ ভক্তমাত্রেরই পরম আস্বাদ্য। তাই এস্থলে আমরা আত্মতৃপ্তির জন্য উহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস আমাদের দরিদ্র ভাষায় অসমর্থ ভাবে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

বাড়ীর সাজসজ্জা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে কিছু আভাস পাওয়া যায়। প্রাঙ্গণে বড় বড় চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া সুপ্রসর চন্দ্রাতপ তলে লোকজনের উপবেশনাদির স্থান করা হইল, চন্দ্রাতপের চারিদিকে উৎসব-শোভার জন্য কদলী তরু রোপিত হইল। আঙ্গিনাগুলি বিবিধ চিত্রবিচিত্র আলিপনায় সুসজ্জিত হইয়া

উঠিল। কদলী মূলে পূর্ণঘট. ঘটের উপর অম্রপল্লব, এবং ঘটের গায়ে দধিমাখা। ধ্বজপতাকাদি,—মহোৎসবের চিহ্ন দূরে দূরে পরিস্ফুট করিয়া তুলিল।

এইরূপে বিবাহ বাড়ী সজ্জিত হইল। সায়াহ্নে অধিবাস। তৎপূর্ব্বেই নবদ্বীপ নগরের ব্রাহ্মণ ও সাধু বৈষ্ণব সজ্জনমাত্রেই অধিবাসে নিমন্ত্রিত হইলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

সভাবেই নিমন্ত্রণ করিলা সকলে।
অধিবাসে গুয়া আসি খাইবে বিকালে॥

অধিবাসে "গুয়া খাওয়ার" নিমন্ত্রণের প্রথা এখনও অনেক সুদূর পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রথা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। যাহা হউক, অপরাহ্ন হওয়ামাত্রই বাদ্যকরগণ আসিয়া বিবাহ-বাড়ীটীকে উৎসবময় করিয়া তুলিল, মৃদঙ্গ, সানাঞি, জয়ঢাক ও করতাল প্রভৃতি বাদ্যে শুভ বিবাহের উৎসবাঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিল। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

অপরাহ্নকাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া॥
মৃদঙ্গ, সানাই, জয়ঢাক করতাল।
নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি উঠিল বিশাল॥

এখন নূতন বাদ্যযন্ত্র, পুরাতন বাদ্যযন্ত্রের স্থান অধিকার করিতেছে। পল্লীতে সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যের ব্যব-

হার নাই। সহরে ইংরাজী বাদ্যের সহিত এক প্রকার করতালের বাদ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সানাঞি এখনও পুরা প্রভাবে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

ভাটেরা বিবাহ সময়ে বংশ-গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। যথা :—

ভাটগণ পড়িতে লাগিলা রায়বার।

এখন এই "রায়বার" পাঠের প্রথা একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। "রায়বার" ব্যাপরটা কি তাহা পর্য্যন্ত এদেশের লোক একবারে ভুলিয়া গিয়াছে। "রায়বার" শব্দটি এখন সাহিত্যিক-গণের শব্দ-ইতিহাস পর্য্যালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অধিবাস ব্যাপরটী কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাও শুনুন, অধিবাসের সময়ে ভাটগণ রায়বার পাঠ করিতে লাগিল। নারীগণ উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসন পরিগ্রহ করিলেন,—আর সকলের মধ্যে আমাদের চিরসুন্দর গৌরসুন্দর, তখন আপন রূপের ছটা বিকাশ করিয়া অধিবাস স্থান উজ্জ্বল করিয়া বসিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল ও মালা দান করার ব্যাপার আরম্ভ হইল। সে এক অতি সুন্দর উৎসব। ব্রাহ্মণগণের মাথায় ফুলের মালা ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দনে মাখিয়া দেওয়া হইল এবং এক এক বাটা করিয়া তাম্বুল দেওয়া হইল। কিন্তু এই ব্যাপার বড় ছোট খাট নয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন—

বিপ্রকুল নদীয়া—বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায় কত আইসে অবধি না পাই॥

ইহার উপরে আবার আরও এক কথা শুনুন—

তথিমধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লইঞা পুন আর কাচ কাচে ॥
আরবার আসি মহালোকের গহণে।
চন্দন গুবাক মালা নিঞা নিঞা চলে ॥

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রভুর অধিবাসে অসঙ্খ্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। লোকের এত সমাগম হইয়াছিল যে, কে আসিল, কে মালা চন্দন পাইল, কে পুনরায় আসিল, তাহার নির্ণয় করাই একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে বিতরণ-কারিগণ বুঝিতে পারিলেন যে লোভিষ্ঠ লোকেরা পুনঃ পুনঃ আসি-তেছে। কিন্তু ইহার প্রতিবিধানের উপায় নাই। তখন প্রভু এক ঔদার্য্যময় আদেশ প্রচার করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

সভেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা কহিলা আপনে ॥
সভারে তাম্বুল মালা দেহ তিনবার।
চিন্তা নাহি, ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার ॥

মহাপ্রভু পরম দয়াময়, তিনি মনে করিলেন, পাছে বা তাঁহার বাড়ীতে কাহারও অসম্মান হয়, পাছে বা কোন ব্রাহ্মণ ধরা পড়িয়া লজ্জিত হয়েন, পাছে বা লোকেরা শাঠ্য-দোষে দুষ্ট হয়,—এই অসুবিধার প্রতিকার করার জন্য তিনি তিনবার করিয়া মাল্য-তাম্বুল প্রদান করার আদেশ করিলেন।

ফলতঃ তাঁহার এই ব্যবস্থায় শাঠ্য ও লোভের যথেষ্ট প্রতীকার

হইল। এমন মুক্তহস্তে মাল্য তাম্বুল বিতরিত হইল যে, নদীয়ার রাজপুত্রের বিবাহেও কেহ কখন এমন মাল্য চন্দন বিতরণ দেখিতে পায় নাই। দান করা দূরের কথা, দান করার সময়ে মাটীতে যে সকল মাল্য চন্দন পড়িয়াছিল, তাহাতেও বড় বড় পাঁচ অধিবাসের কার্য্য কুলাইয়া যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন :—

সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥
লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে॥
এমত চন্দন মালা দিব্য গুয়া পান।
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান॥

বুদ্ধিমন্ত খান যাহা বলিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ ঠিক তাহাই হইতে চলিল।

শ্রীপাদ সনাতন পণ্ডিত এই সময়ে আত্মীয়গণসহ অধিবাস দ্রব্যাদি লইয়া উপনীত হইলেন, তিনিও অধিবাসার্থ মহাসমারোহে আগমন করিয়াছিলেন।

বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ সঙ্গে।
বহুবিধ বাদ্য নৃত্য গীত মহারঙ্গে॥
বেদ বিধি পূর্ব্বক পরম হর্ষ মনে।
ঈশ্বরের গন্ধ স্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে॥

শ্রীমৎ লোচনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন :—নারীগণ মুখে তৈল হরিদ্রা লেপন ও কপাল সিন্দুরে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং খই

কদলা সন্দেশ তাম্বুল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধিবাস-মঙ্গল-গান করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের শুভ অধিবাস সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ সনাতন এমনই সমারোহে প্রিয়াজীর অধিবাস সম্পন্ন করিলেন। সেই বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মী কনক-লতার অঙ্গযষ্ঠিতে অধিবাস-কালে এমন দিব্যশ্রী প্রকটিত হইয়া উঠিল যে, নরনারী মাত্রই তাঁহাকে দেখিয়া আর মানবী বালিকা বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

নিমাইসুন্দরের শুভ বিবাহে নদীয়া-নাগরীগণ জলশায়ী ব্যাপারের জন্য যেরূপ ঘটা করিয়াছিলেন, শচীমাতার নিকটে যুথে যুথে রমণীবৃন্দ যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতে করিতে সমবেত হইয়াছিলেন, শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থে নরহরি ঠাকুরের পদে তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই আনন্দোৎসবের বিন্দুমাত্র যাহারা আস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থে এ সম্বন্ধে পদাবলী পাঠ করিবেন।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ—

হেন মতে দুইজন অধিবাস কৈল।
বধূগণ রাত্রি শেষে জলকে সাহিল॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে জয় হুলাহুলী
রসভরে রমণী চলিল ঢুলাঢুলী॥
এই মতে পানি সাহিল বধূগণ।
প্রভাত সময়ে আইল শচীর ভুবন॥

আনন্দমূর্ত্তি শ্রীভগবানের শুভ বিবাহে পানি সাহি উৎসবে নদীয়া রমণীগণ যে আনন্দ-রসের আস্বাদ করিতে করিতে এই উৎসবময় ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণে ও অনুধ্যানে হৃদয়ে সেই রসময় ও আনন্দময়ের রসপ্রবাহ উথলিয়া হইয়া উঠে। রাত্রি প্রভাত হইল। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের যথাবিধি আয়োজন হইল, অতীব সমারোহে নিমাইসুন্দর দেবপূজা, পিতৃপূজা সমাধান করিলেন।

এদিকে বুদ্ধিমন্ত খাঁ প্রভৃতি অতি প্রত্যূষে আসিয়া সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। অর্থ দিয়া, শরীর দিয়া অকাতরে বিবাহোৎসবের সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বুদ্ধিমন্ত খাঁ একাই পাঁচশত। অর্থ-সম্পত্তিতে, মানে সম্ভ্রমে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে নবদ্বীপে তাঁহার অসাধারণ প্রভাব। ইঁহার সহিত মুকুন্দ প্রভৃতি বহু বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছেন, সুতরাং উদ্যোগে আয়োজনে ও সুবন্দোবস্তে লোকজনের আদর-আপ্যায়নে কোনও অংশে ত্রুটি হইল না।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র গৌরসুন্দর গঙ্গাস্নান করিলেন। বাড়ীতে আসিয়া বিষ্ণুপূজা সমাধান অন্তে নান্দীমুখ কর্ম্মাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহ-বাদ্যের সুমঙ্গল রোলে সমাগত নরনারী ও বালক বালিকাগণের কোলাহলে, মহিলাগণের উলু ধ্বনিতে শচীমার বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। এদিকে শচীমার আদর আপ্যায়নে ও সুমিষ্ট মধুর ভাষায় রমণীগণ পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া গঙ্গাঘাটে গিয়া

গঙ্গার অর্চ্চনা করিলেন, ষষ্ঠীস্থানে যাইয়া ষষ্ঠীপূজা করিলেন, সামাজিক লোকদের বাড়ীতে যাইয়া যথারীতি লোকাচার করিয়া ঘরে ফিরিলেন। তাহার পরে উপস্থিত স্ত্রীগণকে সেই সময়ের রীত্যনুসারে খৈ কলা তৈল তাম্বুল সিন্দূর প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই প্রায় ৫।৭ বার উক্ত দ্রব্য উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজ্য ও বস্ত্র প্রদান করা হইল। অপরাহ্ন বেলায় বিবাহ-স্নানের ব্যবস্থা হইল। এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন :—

অপরাহ্ন বেলা আসি লাগিল হইতে।
প্রভুর সভেই বেশ লাগিলা করিতে॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথিগন্ধ॥
অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর।
সুগন্ধি-মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে॥
ধান্য, দূর্ব্বা, সূত্র, করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভামঞ্জরী দর্পণ॥
সুবর্ণ কুণ্ডল দুই শ্রুতি মূলে সাজে।
নব-রত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু মাঝে॥

এই মত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে।
সকল ঘটনা সভে করিলেন রঙ্গে ॥
ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখি যত নরনারী।
মুগ্ধ হইলেন সভে আপনা পাসরি ॥

অনন্ত সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন, প্রেমমূর্ত্তি গৌরসুন্দরের স্বাভাবিক রূপের পরিমাণ করিয়া উঠাই অসম্ভব, তাহাতে উপরে আবার বিবাহ সময়ের সাজসজ্জা !—ইহাতে যে সেই রূপের কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা যদি অনুভব করিতে পারেন, প্রেমময় পাঠক তাহা অনুভব করুন, আমরা সে সৌন্দর্য্যের বর্ণন কারতে অসমর্থ।

অমর কবি শ্রীপাদ লোচনদাস ঠাকুর গৌরসুন্দরের বিবাহ-সাজ-সজ্জা ও তাঁহার রূপ-মাধুর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা একবার আস্বাদ করুন। কুলবধূগণ আমলকী তৈল হরিদ্রা দ্বারা কি প্রকারে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অঙ্গ-উদ্বর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সে বিবরণ প্রেমিক ভক্তগণের প্রাণের ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সে রসপিপাসু ভক্তগণ ঐ গ্রন্থ-পাঠে সে রস আস্বাদন করিতে পারেন।

বিবাহ-বাসরে ভুবনমোহন অনন্তসুন্দরের রূপ-মাধুর্য্যের বর্ণনা সকলেরই একান্ত চিত্তাকর্ষি হইয়াছিল। সে বিবরণ এইরূপ :—

দিব রত্ন অলঙ্কার রক্ত প্রান্তবাস।
মহ মহ করে গোরা-অঙ্গের বাতাস ॥
সহজে শ্রীঅঙ্গ গন্ধ আর দিব্যগন্ধ।
চন্দন-চন্দ্রক ভালে শ্রীমুখচন্দ্র ॥

নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
ঝলমল অঙ্গ তেজ চাহিতে না পারি॥

শাস্ত্র বলেন, শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; সে শ্রীমূর্ত্তি হইতে সততই আনন্দ-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে। আনন্দতনু শ্রীভগবানের এই রূপ-মাধুর্য্য ভক্তগণের উপাসনার বস্তু। এই রূপের আকর্ষণে সাধনা অতি সহজ হইয়া উঠে। তাই রূপমুগ্ধ প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীভগবানের রূপের বর্ণনা পাঠে এত আনন্দ লাভ করেন।

এদিকে রাজপণ্ডিত সনাতন-গৃহে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ-সজ্জার নিমিত্ত মহিলাগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে শোভা-বর্ণনে আমাদের শক্তি নাই।

গৌর-লীলার মাধুর্য্যাস্বাদী প্রেমিক-কবি শ্রীলশ্রীলোচনদাস ঠাকুর মহোদয় প্রিয়াজীউর বিবাহ-বাসরের সাজ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

পণ্ডিত শ্রীসনাতন হোথা নিজ ঘরে।
নিজ কন্যা ভূষা কৈল নানা অলঙ্কারে॥
গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
বিনি বেশে অঙ্গছটায় আলো করে দেশ॥

ধন্য কবি লোচনদাস! কবিবর, তুমি এক কথায় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অনন্ত উৎস উৎসারিত করিয়াছ।

"বিনি বেশে অঙ্গছটায় আলো করে দেশ।"

পাঠক মহোদয়গণ আরও শুনুন—

বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখবাণ সোণা।
ঝলমল করে যেন তড়িত প্রতিমা॥
ফণধর জিনি বেণী মুনি-মন মোহে।
কপালে সিন্দূর সে তুলনা দিব কাহে॥

বর্ত্তমান সময়ে সিন্দুর ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। সধবার এই সুমঙ্গল সিন্দূর-শোভা যে সভ্যতার প্লাবনে বিলুপ্ত হইতেছে, সে সভ্যতা অন্য ভাবে প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু-মহিলাগণের সৌভাগ্য-শোভার অতি বিরুদ্ধ। সংসারের শোভা-স্বরূপ ললনাগণের কপালে সিন্দুর-বিন্দু যে কিরূপ শোভাকর ও পবিত্র দৃশ্য, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। সিন্দুর বিন্দুতে মানবীর মুখে দেবীর সৌন্দর্য্য ও পুণ্যপবিত্রতা প্রকাশ পায়। জগজ্জননী স্বয়ং লক্ষ্মীর সিন্দুর-শোভা সম্বন্ধে কবিবর লোচনদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সত্য কথা। তারপরে আরও শুনুন:—

ভুরুভঙ্গ অনঙ্গ-সারঙ্গ মনোহর।
শুক ওষ্ঠ জিনি নাসা পরম সুন্দর॥
কুরুঙ্গ-নয়ন জিনি নয়ন-যুগল।
গৃধিনী-কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর॥
অধর বান্ধুলী যিনি অনুপম শোভা।
দশন-মোতিম জিনি ঝলমল আভা॥

শ্রীপাদ লোচনদাস এইরূপে প্রতি অঙ্গের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমিক পাঠক, মূল গ্রন্থে তাহা আস্বাদ করুন,

আমরা আমাদের চির-প্রলোভনীয় শিরোভূষণ শ্রীপাদপদ্মযুগলের কথাই বিশেষরূপে উদ্ধৃত করিতেছি।

ত্রৈলোক্য জিনিয়া পদ গড়িল বিধাতা।
ডগমগ করে পদতল পদ্মারাতা॥
নখচন্দ্র পাঁতি জিনি অকলঙ্ক চাঁদে।
তাহার কিরণে আঁখি পাইল জন্ম-আঁধে॥

কৃপাময় গ্রন্থকার অতি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন—প্রিয়াজীর পদনখচন্দ্রের কিরণে জন্ম-অন্ধও চক্ষু পায়, ইহাই আমাদের আশা ভরসা। আমরা এক জন্মের জন্মান্ধ নই, যুগ-যুগ সঞ্চিত মোহ-ঘন-তিমির আমাদিগকে জন্মে জন্মেই জন্মান্ধরূপে জগতে আনিয়া হাজির করিতেছে। অন্ধের ন্যায় দিশেহারা হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছি, পদে পদেই পদস্খলিত হইতেছি, সুপথ ছাড়িয়া বিপথে পদার্পণ করিতেছি, আর পদে পদেই কণ্টকপূর্ণ বিপদের কুগর্ত্তে পড়িতেছি,—শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীপাদপদ্ম সেবন ব্যতীত সুপথ পাইবার উপায় নাই।

সিদ্ধ কবি লোচনদাস ঠাকুরের উক্তিই আমাদের বেদ-বাক্য। এই বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যদি শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর শ্রীচরণ-যুগলের নখচ্ছটা ধ্যান করিতে পারি, তবে আশা আছে। আমরা জন্মান্ধেরা, দিব্য চক্ষু লাভ করিতে পাইব। তাঁহার নখচন্দ্রের কিরণে জন্ম অন্ধ আখি পায়, ইহা অপেক্ষা ভরসার কথাও সুখের সংবাদ আর কি হইতে পারে?

কনক প্রতিমা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে এইরূপে সুসজ্জিত করিয়া—

রমণীগণ শুভ-বিবাহের স্ত্রী-আচারের আয়োজন উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজপণ্ডিত সনাতনের বাড়ীখানি বিবাহ সাজে সুসজ্জিত হইল, এবং জন-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

এদিকে বরপক্ষে বরযাত্রার বিপুল আয়োজনে সমগ্র নগর একেবারে মাতিয়া উঠিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধিমন্ত খাঁ রাজপুত্রের বিবাহের ঠাটে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন করিবেন বলিয়া মনন করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব হইতেই বুদ্ধিমন্ত খাঁ বহু লোকজন লইয়া শচীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বরযাত্রার বিপুল সাজসজ্জা আরম্ভ হইল। বরের জন্য এমন সুসজ্জিত দিব্য দোলা প্রস্তুত করা হইল, যে নবদ্বীপবাসীরা রাজপুত্রের বিবাহেও সেরূপ দোলা দেখেন নাই।

ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৪ শত বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে যে বেদমন্ত্র উচ্চারিত ও গীত হইত, এই ব্যাপারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতঃপরে দলে দলে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া বাদ্যকরগণ উপস্থিত হইল। সে বাদ্যের তুমুল রবে সমস্ত নবদ্বীপ মুখরিত হইয়া উঠিল। বঙ্গদেশে ভাটের স্তুতিপাঠের কথা এখন আর শুনা যায় না, কিন্তু ৪ শত বৎসর পূর্ব্বেও বিবাহাদি উৎসবে ভাটগণ রায়বার পাঠ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বিবাহোৎসবে ভাটগণ যখন রায়বার পড়িতেছিলেন, তখন ভক্ত অভক্ত সকলের হৃদয়ে ভক্তির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

এইরূপ বিপুল আনন্দোৎসবের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর

বর-সাজে সজ্জিত হইয়া যে অচিন্ত্য রূপলাবণ্য প্রকটন করিয়াছিলেন, তাহা প্রেমিক ভক্তগণেরই ধ্যানের বিষয়। সে আনন্দ-মূর্ত্তি বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা এ জগতে একেবারেই নাই।

শ্রীগৌর ভগবান্ বরসাজে সজ্জিত হইয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিলেন। অতঃপরে দোলায় আরূঢ় হইলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল, কলকণ্ঠ নারীগণ সুধামধুর হুলুধ্বনিতে আনন্দ-প্রবাহ বিস্তার করিয়া তুলিলেন। সর্ব্বত্রই যেন এক আনন্দোজ্জ্বল মধুর-রস, ভরপুর উথলিয়া উঠিল। অধম আমরা সে আনন্দ-সিন্ধুর কণাবিন্দুও হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিতেছি না।

প্রথমে জাহ্নবী দর্শনের জন্য বরযাত্রা, গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন। সহস্র সহস্র দীপ উভয় পার্শ্বে বাহকগণের হস্তে শোভিত হইতেছে। বুদ্ধিমন্ত খাঁ মহাশয় প্রকৃতই রাজঠাটে ব্রাহ্মণ-পুত্রের বিবাহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। রাজ-পথের উভয় পার্শ্বে ধীরসঞ্চারী সুদীর্ঘ আলোক-পংক্তি। পদাতিক শ্রেণী,—দুইদিকে দুই সারি পাটোয়ার,—নানা বর্ণবিশিষ্ট পতাকা-বাহক শ্রেণী—বাদ্যকর শ্রেণী, বরযাত্রার শোভাসমৃদ্ধি এরূপ প্রবর্দ্ধিত করিয়াছিল যে নবদ্বীপের অতি প্রাচীন অধিবাসীরাও কখনও এরূপ সমারোহসমন্বিত বিবাহোৎসব দর্শন করেন নাই। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতকার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজী সব লাগিল করিতে॥

আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলিলা হইয়া দুই সারি পাটোয়ার॥
নানা বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে।
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাচে॥
নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়॥

ইহাদ্বারা জানা জাইতেছে, এখন যেমন বিবাহোৎসবে অগ্নি-ক্রীড়া (বাজী) হইয়া থাকে তখনও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ যাত্রার বিদূষক সকল কিরূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া পথে পথে নাচিতে নাচিতে যাইতে ছিল, তাহাদের মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গ দর্শনে দর্শকগণের হৃদয়ে কিরূপ আমোদ উল্লাস উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে বাস্তবিকই কৌতুহলের উদ্দীপনা হয়। কিন্তু সেদিন ও সে ভাব এখন আর নাই। তখনকার নর্ত্তক সম্প্রদায়ের নৃত্যই বা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এদেশে নৃত্য প্রথার যে যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতঃপরে বাদ্যের কথা শুনুন ;—

জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ কাহাল।
পটহ, ডগর, শঙ্খ, বংশী করতাল॥
ভোরঙ্গ, সিঙ্গা, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে যত।
কে লিখিবে বাদ্যভাণ্ড বাজি যায় কত॥

লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্য ভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥
সে মহা কৌতুক দেখি শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান সভে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায়॥

বরযাত্রার বাদ্য এমন এক আনন্দ তরঙ্গ তুলিয়াছিল, যে শিশুদের তো কথাই নাই, অতি বড় জ্ঞানবানেরা ভব্যতা ও লজ্জা ছাড়িয়া তালে তালে নাচিতে নাচিতে বরযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে ছিলেন। যিনি ইহারই পরবর্ত্তী লীলায় সঙ্কীর্ত্তনের উত্তালতরণ তরঙ্গ তুলিয়া মহৎ ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, এমন কি চণ্ডাল ও যবনদিগকেও একই আসরে সমভাবে নৃত্য করাইয়াছিলেন;—খোলাবেচা শ্রীধরের ন্যায় দরিদ্রতম দরিদ্র এবং ভুবনবিজয়ী রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র, অতি মূর্খ,—সমাজের অস্পৃশ্য ঘৃণিত চণ্ডাল এবং বিপ্রকুলাগ্রগণ্য অতি বড় দার্শনিক পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, যাঁহার অঙ্গুলী উত্তোলনে স্বীয় পদবী ভুলিয়া মান সম্ভ্রম ভুলিয়া সমভাবে সকলের সঙ্গে প্রেমানন্দে সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেন এবং পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন,—তাঁহারই বিবাহোৎসবে সুমঙ্গল বাদ্য-নিনাদে সভ্য-ভব্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণও যে নাচিতে নাচিতে বর-যাত্রার আনন্দবর্দ্ধন করিবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। ঠাকুর শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—

তবে পুষ্প বৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্করি।
ভ্রমেণ কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপপুরী॥

দেখি অতি অমানুষী বিবাহ-সম্ভার।
সর্ব্ব লোকে চিত্তে মহা পায় চমৎকার॥
"বড় বড় বিভা দেখিয়াছি" লোকে বলে।
এমত সমৃদ্ধ নাহি দেখি কোন কালে॥

ফলতঃ এমন ভরপূর আনন্দের বর্ণনা প্রকৃতই সুমধুর। শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস যথার্থই লিখিয়াছেন ;—

নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এসব আনন্দ দেখিবারে শক্তি যার॥

সংসারক্লিষ্ট জীব বিবিধ তাপে নিরন্তর পীড়িত। সংসার-সুখ-দুঃখ বিমিশ্রিত। এখানকার আনন্দোৎসবও দুঃখের পূর্ব্বরূপ মাত্র ; এই অবস্থায় নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানের নরলীলার আনন্দোৎসব-বৃত্তান্ত পাঠ করা এবং সেই সকল আনন্দলীলা হৃদয়ে ধারণ করা প্রকৃত পক্ষেই অতি মঙ্গলকর ও প্রীতিকর।

৩

আনন্দোৎসবময় বিবাহযাত্রা গোধূলি সময়ে কন্যাপক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সনাতন পণ্ডিতের ভবনে উপস্থিত হইলেন। দুই পক্ষের বাদ্যভাণ্ডে সমগ্র পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। সনাতন পণ্ডিত সসম্ভ্রমে বরের দোলার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুসজ্জিত বরের মুখপানে চাহিয়া তিনি বিহ্বল হইলেন। দেহের কনোকো-জ্জ্বল, কান্তি আকর্ণ বিস্তৃত স্নিগ্ধ মধুর জ্যোতি, প্রদীপ্ত নয়নযুগল, সুনীল নিবিড় সুচিক্কণ কুন্তল রাশি, অলকা-শোভিত কপালদেশ

চম্পক-কলিকা-কুলের ন্যায় সুঠাম হস্তে অঙ্গুলিগুলি সুশোভিত এবং শ্রীঅঙ্গ হইতে এক দিব্য সৌরভে মধুকরগণ আকৃষ্ট— পণ্ডিত সনাতন সেই রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি স্পষ্ট-রূপে বুঝিতে পারিলেন, ইনি মানুষ নহেন, স্বয়ং নারায়ণ। তাঁহার হৃদয়ের জামাতৃস্নেহ ভগবৎ-ভক্তিতে পরিণত হইল, তিনি বিস্ময়-বিহ্বলভাবে শ্রীগৌরাঙ্গকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

সনাতন ভক্তিপূরিতচিত্তে পাদ্য অর্ঘ্য এবং আচমনীয়, বস্ত্রা-লঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি বরণ-ব্যবহার করিলেন। সনাতনের মস্তক স্বভাবতঃই আনত হইয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহার ইচ্ছা যে ঐ শ্রীপদের রেণু ভক্তির সহিত তুলিয়া লইয়া মস্তকে ধারণ করেন। কিন্তু শ্রীভগবান তাঁহার হৃদয়ে লৌকিক ভাব জাগরিত করিয়া তুলি-লেন; তিনি আনন্দাশ্রুপাত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। সনাতন-পত্নী অন্যান্য নারীগণসহ জামাতাকে বরণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বর দেখামাত্রই তিনি স্তম্ভিত হইলেন। মনে করিলেন তাঁহার স্বামী কোথা হইতে এই দ্বিভুজ কনক-নারায়ণ তুলিয়া আনিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি প্রথম দর্শনে সনাতনগৃহিণী একবারেই চমকিত হইলেন। মানুষের এরূপ আকার ও এমন রূপ, তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তাঁহার সঙ্গীয় নারীগণও চমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের বোধ হইল যেন তাঁহারা দেবমন্দিরে ঠিক দেবতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। দেহ হইতে কনক-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বদনখানি অবনত করিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া

রহিলেন। পার্শ্বে থাকিয়া সনাতন বলিলেন, "ইনিই বর, আমি দোলা হইতে ইঁহাকে কোলে তুলিয়া আনিয়াছি, তোমরা বরণ কর।"

সনাতন গৃহিণী ধান্য দূর্ব্বা হাতে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তকে দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল; তখনও বিস্ময়ের প্রবল ভাব দূরীভূত হয় নাই, ঘৃতের সপ্তপ্রদীপে আরতি করিলেন,—বোধ হইল যেন দেবগৃহে দেবতার আরতি হইতেছে। রমণীগণের চিত্তে এমন এক বিস্ময়ের ভাব দেখা দিল, যে তাঁহারা একবারেই দেবভাবে বিভোর হইলেন, যেন কোন দেববিবাহের কার্য্যে তাঁহারা দেবলোক হইতে প্রেরিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গজ্যোতিতে উপস্থিত নারীগণের অঙ্গ কনকপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের হৃদয়ে পুণ্য-পবিত্রতা ও প্রেমের সুধাধারা উথলিয়া উঠিয়াছিল।

খৈ কড়ি নিক্ষেপ করিয়া মাঙ্গলিক লোকাচার কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। এদিকে রমণীগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সজ্জিত করিতে গিয়া দেখেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কান্তি-ঝলকে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বাভাবিক সুবর্ণবর্ণ যেন সহস্রগুণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যেন স্বয়ং বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মী, নারায়ণের সহিত পরিণয়োপলক্ষে মিলিত হইবার জন্য আনন্দমধুর সমুজ্জ্বলভাবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মীয়গণ তাঁহার আসন ধরিয়া প্রভুর সম্মুখে তুলিয়া আনিলেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইলেন; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঈষৎ নিমীলিতনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছিলেন। বিবাহের স্ত্রী-আচার অনুসারে অতঃপরে উভয়ে উভয়ের প্রতি পুষ্প বর্ষণ করিতে

লাগিলেন, সে দৃশ্য এমন মনোহর ও মধুর হইয়াছিল, যে দর্শকমাত্রেই সহস্র জন্মেও তাহা ভুলিতে পারেন না। সুখস্মৃতির সেই বিদ্যুৎপ্রভা যুগযুগান্তেও দর্শকগণের চিত্তের সমক্ষে স্ফুরিত হয়।

অতঃপর জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচরণে সুগন্ধি সুকোমল কুসুমমালা অর্পণ করিয়া ঐ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন, মনে মনে বলিলেন,—"প্রভু, চিরদিনই আমি তোমার চরণদাসী।" শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নয়নে বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসির রেখা স্ফুরিত হইল। তিনি অতি যত্নে মালাটী তুলিয়া লইয়া হর্ষিতভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার গলদেশে পরাইয়া দিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—"প্রিয়তমে, তুমিই আমার চিরদিনের হৃদয়বল্লভা। এ অবতারে তুমি প্রকৃতপক্ষেই আমার এক গূঢ় মহাশক্তিস্বরূপা। মহাসংরোধ ও মহাসংযম এবার এ লীলার প্রধানতম রহস্য। এ ব্রতে স্থির থাকিতে হইবে।"

অতঃপরে পুনশ্চ পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল। এবার দেবগণের বড় আনন্দ। তাঁহারা অলক্ষিত ভাবে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের আনন্দ-কোন্দল উপস্থিত হইল। তাহার পরে সহস্র সহস্র সহস্র মহাতাপ দীপ প্রজ্জ্বলিত করা হইল। অতঃপর মুখচন্দ্রিকার মহাবাদ্যের তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল, সেই বাদ্যধ্বনি যেন ব্রহ্মাণ্ড-ভেদ করিয়া উঠিল। মুখচন্দ্রিকার মধুর মিলন প্রেমিক ভক্তগণের চির-আস্বাদ্য। উহা ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে না, সে ভাবে যাঁহাদের হৃদয় পরিপূরিত, তাঁহারা সে মিলন-আনন্দের ধ্যান করুন, এবং সে রস আস্বাদন করুন।

শ্রীমতী স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা, তিনি মুখচন্দ্রিকার সময়ে প্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের মুখপানে চাহিতে পারিলেন না, লজ্জায় তাঁহার চক্ষুর পাতা নিমীলিত হইয়া পড়িল, কিন্তু মুখখানি আনন্দের মৃদুমধুর হাসিতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যাঁহার দর্শনলালসায় গঙ্গা-তট তাঁহার নিকট মধুময় বলিয়া মনে হইত, আজ সেই ভুবনমোহন প্রাণনাথকে নিকটে পাইলেন, চিরদিনের জন্য তিনি তাঁহার প্রাণ-বল্লভ হইলেন, ইহাতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার: হৃদয়ে যে কত আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনা প্রকৃতই অসম্ভব।

তাঁহার নয়ন-নিমীলন দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন, "নয়ন মেলিয়া চাও, মুখচন্দ্রিকার সময় চারি চক্ষুর মিলন করিতে হয়।" বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যুতের ন্যায় নয়ন মেলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন,—বিধাতা ত্রৈলোক্যের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ঐ মুখ-খানিতে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার দেহ বিবশ হইয়া পড়িল। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও শ্রীমতীর মুখপানে চাহিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল।

অতঃপরে রাজপণ্ডিত শ্রীপাদ সনাতন বিধিমতে বিষ্ণুপ্রাপ্তি-কামনায়,—যিনি কোটী কোটী বিষ্ণুর অবতারী,—সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের হস্তে স্বয়ং লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সমর্পণ করিলেন। সাময়িক রীত্যনুসারে দান ধ্যান হোমকর্ম্ম প্রভৃতি নির্ব্বাহিত হইল। বেদাচার লোকাচারের যাবতীয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। শ্রীমতী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে পাইয়া আত্মহারা হইলেন, তাঁহার নয়নে প্রেমধারা,—দেহে পুলক,—সে পুলকের বিরাম নাই,

আনন্দাশ্রুতে নয়নযুগল সজল,—ভালরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখখানিও দেখিতে পাইতেছেন না। এই আনন্দবিবশ অবস্থায় পতিসহ দেবী বাসরঘরে যাইতেছেন, তিনি নিজবশে চলিতে পারিতেছেন না, অন্তর্য্যামী রসময় বর তাহা বুঝিয়া তাহাকে টানিয়া লইতেছেন। এই সময়ে শ্রীচরণের অলঙ্কার-শিঞ্জিনীধ্বনি সহসা যেন একবার তীব্রতর শুনা গেল। অর্থাৎ তাঁহার পায়ে উছট লাগিয়াছে। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সহসা সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখে বিষাদের ভাব দেখা দিল। এই বিষাদ দৈহিক ক্লেশের জন্য নয়,—তিনি পতিসহ সুখময় বাসরঘরে যাইতেছেন, তাহাতে এ কি বাধা, একি অমঙ্গল? দূর্‌দুর্‌ করিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। দেবী বিপদের আশঙ্কা করিলেন।

তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ বর ভিন্ন এই ঘটনা অন্য কেহ জানিতে পারেন নাই। প্রেমময় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমতার মনের ভাব বুঝিয়া আনন্দময় শ্রীকরে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, ইঙ্গিতে-সঙ্কেতে জানাইলেন —"ও কিছু নয়।" দেবীর সন্দেহ ও ভয় দূরে গেল, আবার তাঁহার মুখখানি সুপ্রসন্ন হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "প্রাণ-বল্লভ, তুমিই এ দাসীর সর্ব্বমঙ্গল-নিদান, বিপদে আপদে সুখে সম্পদে এখন তুমি বিনে আমার আর কে আছে।" বাসর গৃহে যে রসের উৎস উথলিয়া উঠিয়াছিল, প্রেমিক পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অনুভব করুন। আমরা তাহার বর্ণনায় অনধিকারী।

সহস্র সহস্র লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বরকন্যা ও বিবাহ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা যে এই মরধামে বিবাহ

কৌতুকে যোগ দিয়াছেন, এমন কথাই তাঁহাদের মনে হইল না। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতাকার যথার্থই বলিয়াছেন :—

বৈকুণ্ঠ হইল রাজপণ্ডিত আবাসে।
ভোজন করিতে যাই বসিলেন শেষে॥
ভোজন করিয়া সুখ রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মীকৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতুহলে॥
নগ্নজিত, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে তারা যে হেন হইলা ভাগ্যবন্ত॥
সেই ভাগ্য এবে গোষ্ঠিসহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব বিষ্ণু-সেবার কারণ॥

রাত্রি প্রভাত হইল। লোকাচার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। অপরাহ্ণে আবার বিজয়-বাদ্যনির্ঘোষে পল্লী কোলাহলময় হইয়া উঠিল। মিশ্র মহাশয় বরকন্যা বিদায়কালে অধীর হইলেন, মিশ্রগৃহিণী ও অন্যান্য মহিলাগণ নয়নজলে পরিসিক্তা হইলেন। শ্রীমতী পিতা মাতা ও শৈশব সহচরীদিগকে ছাড়িয়া পতিগৃহে যাইতেছেন, তাঁহার চিত্তও একান্ত অধীর হইয়া উঠিল, মণিমুক্তার মোহনমালার ন্যায় নয়নাশ্রুতে শ্রীমুখখানি ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সনাতন বলিলেন, "মা কাঁদিও না, সত্বরেই তোমাকে লইয়া আসিব।" শ্রীগৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া সনাতন কাতর ভাবে বলিলেন,—"বাবা, তুমি জগৎপূজ্য, আমি তোমায় আর কি বলিব, নিজগুণে আমার কন্যা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করি-

য়াছ, আমি ধন্য হইলাম, তোমার আগমনে আমার গৃহ ধন্য হইল, আমার কন্যা পরম ভাগ্যবতী যে তোমায় পতিলাভ করিল।"

এই বলিয়া শ্রীমতীর হাত ধরিয়া তিনি শ্রীবিশ্বম্ভরের হাতে সমর্পণ করিয়া আরও দুই একটী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, বাক্য গদ্‌গদ হইয়া পড়িল, নয়নজলে তাঁহার মুখ ভিজিয়া গেল। শ্রীগৌর-সুন্দর স্মিত-গম্ভীরভাবে বলিলেন "আপনি পূজ্যপাদ, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।" এই বলিয়া সনাতনের পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং অন্যান্য নমস্য ব্যক্তিবর্গকে নমস্কার করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ দোলায় আরোহণ করিলেন।

পথে পথে নরনারীগণ বরকন্যা দর্শনের নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া ছুটিলেন। সকলের হৃদয়েই দেবভাব উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। কেহ বলিল, বরকন্যা যেন সাক্ষাৎ হরগৌরী; কেহ বলিল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ। এইরূপে যাঁহার যেরূপ ধারণা, সে সেইরূপ ভাষায় বিস্মিত ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। শুভক্ষণে বরকন্যা স্বভবনে শুভাগমন করিলেন।

এদিকে বৃদ্ধা শচীমাতা পতিব্রতাগণ সঙ্গে লইয়া হর্ষপ্রফুল্ল চিত্তে পুত্র ও পুত্রবধূ গৃহে আনিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি-মঙ্গল-ধ্বনি হইতে লাগিল। শচীমাতার চিরসঞ্চিত সন্তাপ প্রশমিত হইল। তিনি আজ পুনরায় তাঁহার গৃহে কল্যাণ-কল্পলতা-স্বরূপিণী স্বয়ং লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পাইয়া আবার যেন ঠিক সেই তিরোহিতা লক্ষ্মীদেবীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে পুত্রবধূর বিরহ-

রূপ যে অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইল এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী বলিয়াই কোলে তুলিয়া লইলেন। পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া শচীদেবী আনন্দে বিভোর হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এই মধুর মিলনকাহিনী এখনও ভক্তগণের প্রাণে শতমুখী জাহ্নবীর ন্যায় আনন্দের সুধাধারা বর্ষণ করে।

৪

চিরবাঞ্ছিত প্রাণের দেবতা, চিরসুন্দর গৌরসুন্দরের সঙ্গলাভ করিয়া প্রিয়াজীর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। তাঁহার নয়নে দিবানিশি গৌররূপের সুধাতরঙ্গ নাচিয়া বেড়াইত, শ্রীগৌরাঙ্গের নিগূঢ় প্রীতির ভাব ক্রমেই প্রিয়াজী স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিত দিবাভাগে অধ্যাপনে ব্যাপৃত থাকিতেন, কেবল স্নানাহার সময়ে তাঁহাকে দেখা যাইত।

এই সময়ে নবলক্ষ্মী নীরবে নীরবে তাঁহার সেবা করার অধিকার পাইতেন, তিনি তাঁহার পা ধোয়ার জন্য জল, খড়ম, গামছা, তৈল প্রভৃতি যোগাইয়া রাখিতেন, পূজা-গৃহে পূজার আয়োজন করিয়া রাখিতেন, ভোগমন্দিরে যাইয়া ভোগ রন্ধন করিতেন, শচীমাতা প্রথম প্রথম বৌমাকে এ সকল বিষয় দেখাইয়া দিতেন, কিন্তু এশিক্ষা অতি অল্পদিনই দিতে হইয়াছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া অনন্তলক্ষ্মীগণের মহাবতারিকা। কোটি লক্ষ্মী যাঁহার পদনখ হইতে অবতীর্ণা, তাঁহার অভাব কি, অজানাই বা কি? তথাপি লোকব্যবহারানুরোধে শচীমাতার আদেশ উপদেশ প্রতীক্ষায়

তাঁহাকে সাংসারিক কার্য্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত। অবশেষে তিনি নিজেই সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিষ্ণুর ভোগ শেষ হইলে, অতি যত্নসহকারে কনক-প্রতিমা মহালক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জগৎপতি শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর দেবের সমক্ষে অন্নাদি রাখিয়া অদূরে আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, শচীমাতা পুত্রের সম্মুখে বসিতেন। এদৃশ্য দেখিয়া প্রিয়াজীর কত আনন্দ হইত, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি আড়নয়নে ঘোমটার আড়ালে মৃদু মধুর হাসিতেন, হৃদয়-সখার মুখের দিক তাকাইতেন, রসময় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সে হাসি লক্ষ্য করিয়া অস্ফুট সুমধুর হাসিতে প্রিয়াজীকে বুঝাইতেন,—"তোমার ঐ হাসিটুকু, আর তোমার ঐ হাসিমাখা মুখখানি আমার সমস্ত জীবনের শোভাসম্পদ্।" বউমা নিমাইর নিকটে নিকটে থাকেন আর তিনি প্রাণভরিয়া বিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তিযুগল সন্দর্শন করেন,—শচীমাতার অনুক্ষণ এই বাসনা। কিন্তু আহারের সময় ভিন্ন দিবাভাগে প্রায়শঃই তাঁহার এই বাসনা পূরণ হইত না। তাই তিনি নিমাইর নিকট উপবেশন করিয়া নিমাইর ভোজন দেখিতেন,—আর নিষ্প্রয়োজনে এটুকু ওটুকুর জন্য ঘন ঘন বউমাকে ডাকিতেন।

নিমাই তখনও চঞ্চল। আহার শেষ হইতে না হইতেই,—ভোজনের সকল দ্রব্য পরিবেশন হইতে না হইতেই—নিমাই পাত্রত্যাগ করিয়া উঠিতে উপক্রম করিতেন। "আরে বোস্ বোস্,—উঠিস নে উঠিস নে—তুই গ্রাসপ্রসাদও মুখে দিস নাই, আমার মাথার দিব্যি উঠিস নে" শচীমা এই বলিয়া নিমাইকে

উঠিতে দিতেন না। নিমাই মায়ের অতি বাধ্য। নিমাই পেটে হাতবুলাইয়া দেখাইয়া বলিতেন, "দেখ মা কত খেয়েছি। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি রান্না দেখাইয়া দেও, নচেৎ আর কি কেউ এমন রান্না করিতে পারে?

শচী। বাবা, বউমা আমার লক্ষ্মী। কিছুই দেখাইতে হয় না,—যেন কত কালের গিন্নী। এখন আর কোন কাজই আমায় দেখতে হয় না। আমি কেবল তোমার খাওয়াটি দেখি। সংসারের সব কাজই বৌমা করেন। এছাড়া আমার সেবা তো আছেই। আমায় বাতাস করা—আমার পদসেবা করা,—ইহার নিত্য কর্ম্ম। বউমা নিজহাতে আমার কত সেবা করেন—আমার অত ভাল লাগে না। ছেলেমানুষ,—কোথায় আমি উহার যত্ন কর্‌ব। এক সন্ধ্যা দুই সন্ধ্যা না-হয়, আমিই রেঁধে দিলুম। তা বউমা আমার কোন যত্ন লইতে লজ্জা বোধ করে। আমি বা কোন কাজে হাত দি, এই ভয়ে রাত্রি ভোর না হইতেই উঠিয়া ঘর নিকানাদি সকল কার্য্য করে, বাড়ী ঘরের অবস্থা দেখেছ—যেন দেবালয়। সাজানো গোছানোতে বউমা অমন সিদ্ধ হস্ত—যেন স্বয়ং লক্ষ্মী। গঙ্গাস্নান করিয়া বিষ্ণুমন্দিরে শঙ্খাদি আঁকে, পূজার বাসন মার্জ্জনা করে, পূজার ও ভোগের সাজসজ্জা করে, নিজের বুদ্ধি মতে ভোগ রন্ধন করে, তোমার খাওয়া হইলে আমায় না খাওয়াইয়া কোন দিনও জলটুকু মুখে দেয় না।

নিমাই। সে আর একটা বেশী কথা কি? ঐ বিষ্ণু খট্টায় যিনি আছেন, তিনি অচল দেবতা, আর তুমি মা এ ঘরের প্রত্যক্ষ

সচল দেবতা। তোমার সেবা না হইলে এজীবনই মিথ্যা। মা, মা ছাড়া আর যে কোন দেবতা কোথায় আছেন, আমি তাহা ভালরূপ এখনও বুঝিতে পারি না। দেব-পূজা করিতে হয় বলিয়া করি, ভোগ দিতে হয় বলিয়া দি, কিন্তু তুমি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা। যে তোমার পূজা করে, আমি তাকে প্রাণদিয়া ভাল বাসিতে পারি।

নিমাই আড়নয়নে প্রিয়াজীর দিকে চাহিয়া এই কথা বলিতে ছিলেন। একথায় প্রিয়াজী ঘোমটার আড়ালে একটুকু মুখ লুকাইয়া প্রফুল্ল পদ্মপলাশলোচনে ঈষদ্ মধুর হাস্যে যেন নিমাইর কথায় সায় দিলেন ;—যেন নয়ন-ভঙ্গিতে বলিলেন—"এই তো ঠিক কথা।"

শচীমা। পূর্ব্বজন্মের তপস্যায় গোবিন্দ আমার ঘরে এমন রত্ন দিয়াছেন। আমি এখন সারাদিনই তাঁহার নাম করার সুবিধা পাইয়াছি। তোমার অতিথি সেবার জন্যও আর এখন আমার ভাবিতে হয় না। কুড়িজন, ত্রিশজন—যত মূর্ত্তিই অতিথি আসুন না কেন, দ্রব্যেরও অভাব নাই, তাঁহাদের সেবারও এখন ভাবনা নাই। ছেলেমানুষ বউমার পাছে বা কষ্ট হয়, এই জন্য আমি নিজে কোন কাজ করিতে গেলে, বউমা আমার পায়ে ধরিয়া সেই কার্য্য হইতে আমায় বিরত করে। আমার মনে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু কি করিব, উহার জন্য কোন কাজে হাত দিতে পারি না। আরও দেখিতে পাই, যে কাজ করিতে আমার দুইদণ্ড লাগে, বউমা এক মূহূর্ত্তে সে কাজ সারিয়া ফেলে। রাজ-পণ্ডিতের মেয়ে,—বাপের বাড়ীতে বিশেষ কোন কাজ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখানে এসেই যেন পাকাগিন্নী। ইহার উপরে এই

গ্রীষ্মের দিনে আমার শয্যার পার্শ্বেই বসিয়া আমায় হাওয়া করে কিসে আমার একটু আরাম হইবে, উহার সর্ব্বদা সেই চেষ্টা।

নিমাই। তা হইলেই হইল। আমি নিজ হাতে তোমার কোনও সেবা করিতে পারি না। তুমি যেমন আমার খাওয়ার সময় বসিয়া দেখ, আমার মনে হয়, আমিও তোমার খাওয়ার সময় তোমার কাছে থাকি, কিন্তু নানা কাজে তাহা ঘটে না। মা এ দেহ তোমা হইতেই পাইয়াছি, তোমার সেবা করাই এ দেহের প্রধান কাজ। তাহা যে পারি না—ইহাই দুঃখ।

শচী। তোমার তা করতে হবে কেন, বাবা! বউমার জন্য এখন আমার খাওয়া বাড়িয়া গিয়াছে। ঠিক্ মায়ের মতন আমায় যত্ন করে, আমার কত সেবা করে। প্রতিবেশিনী মেয়েদের কত যত্ন আদর করে। এমন বিনয় নরম ভাব আর দেখি নাই।"

নিমাই আহার করিতে বসিলেই শচীমাতা কথার উপরে উপরে কথা তুলিয়া কেবল বউমার প্রশংসাই করিতেন। নিমাই বলিতেন "মা তোমার মুখে নিত্যই ঐ এক কথা। আমি তোমার যে ধার ধারি, তার কি কিছুতে শোধ আছে? যে তোমার সেবা করিবে, সে আমায় কিনিয়া লইবে। আমি তোমার কোন সেবা করিতে পারি না, আর যে পারিব, সে ভরসাও নাই। যে আমার এই বাসনা পূরণ করিবে, আমি তাহার কাছে চির জীবন বিকাইয়া থাকিব, কখন তাহার ঋণ শোধিতে পারিব না।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এই কথায় যে কি এক নিদারুণ ব্যাপারের আভাস রহিল, পাঠকগণ তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন।

শচী। ছি বাছা অমন কথা কি বল্‌তে আছে! তোমরা বেঁচে থাক—তোমাদের দুইজনের মুখখানি দেখে যেন চক্ষু মুদিতে পারি। আমার মনের সাধ, তোমাদের দুইজনকে কোলে লইয়া যেন আমার সারাদিন কাটিয়া যায়। লোকে লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করে, কিন্তু আমি **বিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়া** দেখিয়া তাহা হইতে কোটিগুণে আনন্দ লাভ করি। তোমরাই আমার লক্ষ্মীনারায়ণ। আমার আবার সেবা কি? কত দুঃখের কথা আমার মনে জাগে। তোমাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে সকল আগুনেই জল দিয়াছি।

আহারের সময়ে একটুকু অবকাশ হইত। এই সময়ে মাতায় ও পুত্রে অনেক কথা :হইত। প্রিয়াজী দিবাভাগে প্রায়শই স্বামীর সহিত কথা বলিবার সুবিধা পাইতেন না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যখনই চারিচক্ষুর সম্মিলন হইত, তখনই লক্ষ কোটি সুমধুর প্রেম-আলাপের নীরব তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। সে আলাপ ভাষায় ফুটিবার নয়, তাই ভাষায় ফুটিত না। মিতভাষিণী বিষ্ণুপ্রিয়া কখনও মুখের ভাষায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে চাপা থাকিত, শত সুধামধুর নয়নের চাহনিতে সেই গভীর প্রেমের ভাব,—সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইত।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর প্রতিদানে তাঁহাকে অব্যক্ত ভাবে যে প্রেমের প্রতিদান প্রদান করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রেম তরল না হইয়া আরও গাঢ়তর এবং আরও গভীরতর হইয়া উঠিত। শ্রীরাধা-

প্রেম কেমন বস্তু, অতি উদার শ্রীগৌর ভগবান্ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, নিজে সে প্রেমের ভাব জগৎজীবকে দেখাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে তিনি যে প্রেমসুধা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার প্রকাশ নাই,—তাহার তুলনা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের অতি মর্ম্মী উপাসক ভিন্ন সেই প্রেম ও সেই ভাব অন্যের দুর্লক্ষ্য। অন্যে তাহা বুঝিতে পারিবে না।

মহালক্ষ্মী পরমব্যোমাধিপতিকে যেরূপ সেবা করেন, পুরাণে তাহার বিবরণ আছে। শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননে ব্রজবধূ-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা নিকুঞ্জবিহারীকে যে প্রেমে মুগ্ধ ও বশীভূত করেন, ভাগবতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদে,—আমরা সে প্রেমের ভাব, ভাষা ও ঝঙ্কারের লেশাভাসের প্রকাশ কিছু কিছু দেখিতে পাই, কিন্তু শ্রীনবদ্বীপে মহামহাশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম কোনও ভাষাতেই প্রস্ফুট হয় না,—সে এক মহাসংযমরূপ মহাগিরি-নিরুদ্ধ নিরাবিল অনন্ত মাধুর্য্যময় মহাপ্রেমের বিপুল উৎস। রজনীতে শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন হইত। খুব সম্ভব, তখনও ভাষায় সে প্রেমের তেমন আদান প্রদান হইত না। উভয় শ্রীমুখের দুই একটি কথা—উভয় নয়নযুগলের বিজুলি-সঞ্চারের ন্যায় হাস্যময় চাহনি, ও শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শ—এইরূপ ব্যাপারে যে মহাপ্রেমের আদান প্রদান হইত, কোটি কোটি ভাষার অনন্ত প্রবাহেও তাহা পরিস্ফুট হইবার নহে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব ক্রমশঃই অল্প অল্প করিয়া জগতে প্রকাশিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের দয়া ভিন্ন

সেই তত্ত্বলাভের অপর উপায় নাই। যে পরিমাণে নিষ্ঠাময়ী শ্রীগৌরসেবার অনুষ্ঠান হইবে, সেই পরিমাণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব প্রকটিত হইয়া সাধকদের ও তৎসম্পর্কে জগতের অশেষ কল্যাণের সূত্র-পাত হইবে। সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশকেই তজ্জন্য প্রস্তুত হইবে। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীস্বরূপিণী নারীগণের দ্বারা সেই সাধনার বিকাশ হইবে—অবশেষে সর্ব্বত্রই সেই শক্তির মহাপ্রভাব সঞ্চারিত হইবে, পুণ্য পবিত্রতা, জীবে দয়া, জীবে প্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতি প্রভৃতি অনন্ত মাধুর্য্যময় অনন্ত গাম্ভীর্য্যময় এই সকল ভাব-বিকাশ,—সেই সাধনার লক্ষণরূপে ক্রমশ পরিলক্ষিত হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পতি ভিন্ন অন্য দেবতা জানিতেন না, পতিভিন্ন অন্য দেবতার সেবাও করিতেন না, গৃহে নারায়ণ ছিলেন, তাঁহার সেবার নিমিত্ত তিনি সকল আয়োজন উদ্যোগ করিতেন তাঁহার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনও করিতেন,—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে- শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁহার প্রাণের দেবতা ছিলেন, তাঁহার নয়ন শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনের জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিত, তিনি নব নবভাবে শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সন্দর্শন করিতেন, তাঁহার কর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ কথা শুনিতেই প্রীতি লাভ করিত, শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গগন্ধে তাঁহার নাসিকা বিহ্বল হইত, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদিত অন্নই তাঁহার রসনায় মধুর বলিয়া বোধ হইত, অন্যকোন আহার্য্যদ্রব্য এক-মূহূর্ত্তের তরেও তাহার রুচি হইত না। শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গস্পর্শে তিনি আত্মহারা হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাই তাঁহার শ্রীকর-কমল যুগলের একমাত্র ব্রত ছিল, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে না দেখিলেই

তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইত, তিনি তাহাকে স্মরণ করিতেন, তাঁহার মধুমাখা নামটী অতর্কিতভাবে নীরবে নীরবে তাঁহার রসনায় জপের ন্যায় উচ্চারিত হইত।

এই অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ অধ্যাপনালয় হইতে সহসা গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতেন—আসিয়া বলিতেন,—"ওগো তোমার ঘন ঘন ডাকে আমি পাগলের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়াছি, তোমার মুখখানি সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে জাগে, তোমায় সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না, পারিবও না। তোমার পক্ষেও দেখিতেছি সেই কথা। এই ত তোমার ডাকে ছুটিয়া আসিয়াছি, কিন্তু একটুকু মৃদু-মধুর হাসি ছাড়া তোমার মুখে কোন কথা নাই, কি বলিবে বল?

প্রিয়াজী শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকরখানি স্বীয় শ্রীকরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মুখপানে সতৃষ্ণ ভাবে চাহিয়া রহিলেন,—নয়ন কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল—কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"নাথ, আমি তোমায় না দেখিলে ক্ষণার্দ্ধও থাকিতে পারি না,—দেখো যেন আমায় ভুলোনা। প্রাণের দেবতা, তুমি আমায় মনে রেখো" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্য গদ্গদ হইয়া পড়িল, নয়নের জল কনক-গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিবশ হইয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন,—তুমিই আমার দেহ, মন, প্রাণ ও আত্মা,—তোমায় আবার মনে রাখিব কি! শিষ্যদের অধ্যাপনা আমার এখন এক প্রধান কর্ত্তব্য। শত শত ছাত্রকে পড়াইতে হয়, তবে এখন যাই।"

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর গার্হস্থ্যজীবনে কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবহেলা করেন নাই। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামিদর্শনজনিত স্বীয় সুখ উপভোগ অপেক্ষা স্বামীর কর্ত্তব্যতার প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম কেবল তাঁহাকে লইয়াই দিনযামিনী অতিবাহিত করেন, ইহা তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা হইলেও স্বামীর কর্ত্তব্যতাকেই তিনি অধিক গুরুতর বলিয়া মনে করিতেন। সেই কর্ত্তব্যতার দিকে দৃষ্টি রাখার শক্তি ক্রমেই এত বিবর্দ্ধিত ও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল যে জীবোদ্ধারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তখন সর্ব্বপ্রকার শোকে পাষাণ চাপা দিয়া দুঃসহ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহ সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহিলা-হৃদয় চিরদিনই মহাশক্তির আশ্রয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এই মহাশক্তির পূর্ণতম আধার,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মহিলাকুলের মহা আদর্শ।*

---

* শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লেখকগণ চরিতাখ্যানের সকল দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। ভক্তিভাব পরিস্ফুট করিয়া তোলাই তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গের গার্হস্থ্য চরিত্রের কথা ইহাদের গ্রন্থে সবিশেষ আলোচিত হয় নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রেরও বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায় না। তথাপি দুই একটি বাক্যের তাৎপর্য্যেই সে সম্বন্ধে বহু কথার আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমুরারি গুপ্ত তদীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস-বিভ্রমৈঃ
ররাজ রাজদ্বরহেমগৌরঃ
বিষ্ণুপ্রিয়া-লালিতপাদপঙ্কজো
রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্রমৌলিঃ।

ভক্তি ও ভগবান্।

১

এইরূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আদর্শগৃহস্থভাব স্বীকার করিলেন। কিন্তু ইহজগতে তাঁহার অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য শ্রীরামাদির ন্যায় গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা দান নহে, তিনি রামলীলায় ও বাসুদেবলীলায় সে শিক্ষা যথেষ্টই বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের শ্যামযমুনার শ্যামলতটে মধু-নিধু-নিকুঞ্জবনে তিনি প্রেমলীলা প্রকটন করিয়াছেন, কিন্তু সে রসকেলি অতি গুপ্ত ও অপ্রকাশ্য,—সাধারণ মানুষের নয়নের অন্তরালে সেই লীলা প্রকটিত হয়, উহা অতি নিগূঢ়। অতি উদার গৌরলীলায় দয়াময় শ্রীভগবান্ পতিত পাষণ্ডের হৃদয়েও যেরূপ প্রেম-ভক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা নরনারীগণের পক্ষে মহাদান ও মহা আশীর্ব্বাদ।

এখন শ্রীগৌরসুন্দরের এই মহা-আশীর্ব্বাদের সূত্রপাত করার বাসনা হইল। শ্রীগৌরসুন্দরের সুখময় গৃহস্থলীলায় বৃদ্ধা শচী মাতার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। ভুবনমোহন পরম-প্রেমিক চিরসুন্দর পতি-দেবতার সহিত সহবাসে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াও সুখের পাথারে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। শত শত ছাত্র দূর দেশান্তর হইতে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিতেছেন, শত শত ধনী শ্রীগৌরাঙ্গের পাণ্ডিত্য

দেখিয়া, বসন ভূষণ ও অর্থাদি দ্বারা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছেন—চারিদিকে তাঁহার নাম যশ বিস্তারিত হইয়াছে সুখের সংসার কোনও অভাব নাই। ধনে মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও যশোগৌরবে বিশ্বম্ভর সর্ব্বত্রই সম্মানিত, মাতৃস্নেহে ও পতিব্রতা স্বয়ং লক্ষ্মীর প্রণয়ময়ী সুখ-সেবায় শ্রীগৌরাঙ্গের সংসার এখন পূর্ণ মধুময়।

এই মহাসুখের দিনে গৌরসুন্দর একদিন পরমারাধ্যা জননীর নিকটে গিয়া বলিলেন, "মা—এ সংসার অনিত্য, কখন কি ঘটে, কিছুই বলা যায় না। স্নেহময় পিতৃদেব আমায় কত ভাল বাসিতেন,—আমি তাঁহার কিছুই করিতে পারিলাম না—পাগলের ন্যায় বাল্যে আমি কত কি করিতাম, তাঁহাকে কত কষ্ট দিয়াছি। সে সকল কথা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমি পাগলের মত কোথায় ছুটিয়া যাইতাম, আর দারুণ রৌদ্রে তিনি আমায় খুঁজিতে বাহির হইতেন, আমার চাঞ্চল্যে কতজন তাঁহাকে কত কথা বলিত,—এখন সেই সকল কথা মনে পড়িতেছে, আর মনে বড় কষ্ট হইতেছে। তাঁহার জীবদ্দশায় আমি তাঁহার কিছুই করিতে পারি নাই,—তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আমি তাঁহার পদসেবা প্রাণ জুড়াইতাম।"

এই কথা বলিতে বলিতে গৌরসুন্দরের নয়নযুগল অশ্রুজলে প্লাবিত হইল, তাঁহার কথা গদগদ হইয়া গেল। তিনি পরিধেয় কাপড়ের কাণি হাতে লইয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন শচী দেবী নিজের নয়নজল মুছিয়া নিমাইর হাত ধরিয়া

বলিলেন—"নিমাই, আমি শোকে দুঃখে পাগলিনী। তোমার ও বউমার মুখ দেখিয়া সকল শোক ভুলিয়া আছি। ও কথা তুলিয়া আমায় আর আকুল করিও না। এক কথায় আমার কত কথা মনে পড়ে। বাবা আজ হঠাৎ একথা তুলিলে কেন?

নিমাই। মা, স্নেহময় জনকের কিছুই করিতে পারিলাম না, তাই মনে করিয়াছি, ৺গয়াধামে যাইয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে তাঁহার পবিত্রনাম লইয়া যদি কিছু করিতে পারি।

শচী। আরও কয়েকটাদিন যা'ক্,—আমার দিনও তো ফুরাইয়া এসেছে। তোমাকে রাখিয়া যদি চক্ষু বুজিতে পারি, তবে একবারে গিয়াই উভয় কার্য্য করিও।

নিমাই। ওকথা বল্‌বেন না,—আমার আর কে আছে? আপনি অনুমতি করুন, আমি পিতৃকার্য্য করিতে গয়া যাইব। আমি বংশের একমাত্র পুত্র। জীবন অনিত্য, কখন কি হয় বলা যায় না।

শচীমাতা অগত্যা সম্মত হইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আড়াল হইতে এই আলাপ শুনিয়া প্রথমতঃ বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আগ্রহে এবং তাঁহার সান্ত্বনায় তিনি কর্ত্তব্যতা বুঝিয়া নীরব হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর পুরোহিতাদি আহ্বান করিয়া যথাশাস্ত্র কার্য্যাদি সমাপনান্তে গয়াধামে যাত্রা করিলেন। কতিপয় ছাত্র তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। কোথাও পর্ব্বত,—কোথাও প্রান্তর, কোথাও বন-শোভা দেখিতে দেখিতে এবং শিষ্যদের সহিত নানা প্রকার কৌতুক-

জনক আলাপ করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দর মন্দারপর্ব্বত সমীপে উপস্থিত হইলেন, পরমানন্দে চৌরান্ধয়ক নদে স্নান ও দেব-পিতৃ-তর্পণাদি করিয়া তীর্থ-পুরোহিতের সহ মন্দারপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া শ্রীশ্রীমধুসূদন দর্শন করিলেন। দর্শনান্তে পর্ব্বতপ্রান্তে পুরোহিতের গৃহে পদার্পণ করিলেন।

তীর্থপুরোহিতদের ব্যবহারে শিষ্যগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ হইয়াছিল। ধর্ম্ম-বিশ্বাস-সংস্থাপক সর্ব্ববিদ্ গৌরহরি তাহা বুঝিতে পারিলেন, শিষ্য-দের শিক্ষার নিমিত্ত এই স্থলে তিনি এক অভূতপূর্ব্ব লীলা প্রদর্শন করিলেন,—অর্থাৎ তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইল। ইহাতে শিষ্যগণ বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আর কখনও তাঁহার অসুখ হয় নাই। জ্বর অতি প্রবল, কিছুতেই জ্বর ছাড়ে না। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, এই জ্বর পিতৃকর্ম্মের বাধা দিবে,—ইহা ভাবনার বিষয় বটে,—এক-টুকু ভাবিয়া বলিলেন,—ইহাতে কোন চিন্তার কারণ নাই। এই যে তীর্থ-পুরোহিতগণ আছেন, ইঁহারা সকলেই এই মধুসূদনকে আশ্রয় করিয়াই জীবন যাপন করিতেছেন—একমাত্র মধুসূদনই ইঁহাদের আশ্রয়, জীবিকার জন্য ইঁহারা কেবল মধুসূদনের পাদপদ্মই চিন্তা করেন, এই মধুসূদনভক্ত ব্রাহ্মণগণের পাদোদকই এই জ্বর-প্রশমনের একমাত্র উপায়। তোমরা এখনই আমাকে ইঁহাদের পাদোদক পান করাও, দেখিবে এখনই জ্বরের শান্তি হইবে।

শিষ্যগণ দ্বিধা না করিয়া গুরুর আজ্ঞা পালন করিলেন, আর তখনই জ্বর ছাড়িয়া গেল। নিমাই তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া

বলিলেন—"দেখ্‌লে তো, বিপ্র-পাদোদকের মাহাত্ম্য কেমন? ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা কর্‌তে নাই।"

শিষ্যগণ বুঝিলেন, তাঁহাদের শ্রীগুরু সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহারা আরও বুঝিলেন বিপ্রভক্তি শিক্ষাদেওয়াই এই লীলার অভিপ্রায়। পরে পুনঃপুনা তীর্থে স্নানাদি করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ রাজগৃহে ব্রহ্মকুণ্ডে পিতৃদেবতার পূজাদি করিলেন। *

গয়াধামে দর্শনমাত্রই শ্রীগৌরাঙ্গ হাত জুড়িয়া শ্রীধামকে প্রণাম করিলেন,—বিবিধ স্থানে যথাশাস্ত্র দেব পিতৃক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন এবং সহসা গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন। মুখে সে হাস্যকৌতুকের ভাব নাই, কথায় পাণ্ডিত্য নাই, গমনে চাঞ্চল্য নাই,—হৃদয় ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ, তাঁহার শ্রীকরকমল যুগল অঞ্জলিবদ্ধ, তিনি যেখানে যাহা পূজ্য দেখিতেছেন, তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছেন।

এইরূপে বিশ্বম্ভর গয়াধামের যাবতীয় তীর্থ-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু চক্রবেড়ে গমন করিয়া যখন তিনি শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার যে অভিনব ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। নিমাই চক্রবেড় মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বিষ্ণুপাদপদ্মকুণ্ডের চতুর্দ্দিক ঘেড়িয়া যাত্রিগণ দণ্ডায়মান। সেস্থানে দেউল পরিমাণে ফুলের মালা

---

* শ্রীপাদমুরারি গুপ্ত কৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই বিবরণ লিখিত আছে।

পড়িয়াছে, ধূপ দীপ বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা শত শত লোক সেই শ্রীচরণের অর্চ্চনা করিতেছেন, পুরোহিতগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীচরণ-মাহাত্ম্য শুনিতে শুনিতে নিমাই অতি ধীরে ধীরে কুণ্ড সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীপাদপদ্ম দর্শনমাত্রই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কদম্বকুসুমের ন্যায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তিনি স্থির দৃষ্টিতে পাদপদ্ম দর্শন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না—তাঁহার পদ্মপলাশের ন্যায় নয়নযুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইল, তিনি চক্ষু মুছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না, আবার চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, ফোঁটায় ফোঁটায় গণ্ড বাহিয়া নয়ন-জলধারা তাঁহার বক্ষ পরিসিক্ত করিল। এইরূপে নয়নজলের অবিরল ধারা মৃত্তিকায় গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, ওষ্ঠ যুগল কাঁপিতেছিল, তাহাতে নয়নের জল বর্ষার ধারার ন্যায় দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

নিমাই নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ ও নির্নিমেষলোচনে কেবল শ্রীচরণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সাত্ত্বিক ভাবে অধীর ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল হইতে এমন লাবণ্য এবং প্রেমের এমন স্নিগ্ধ-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল, যে শত শত যাত্রী শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন লালসা ত্যাগ করিয়া মন্ত্রাকৃষ্টের ন্যায় এই সুদীর্ঘ-সমুন্নত কনক-কান্তিযুক্ত অলৌকিকরূপলাবণ্যসম্পন্ন যুবকের শ্রীমুখচন্দ্রের লাবণ্য-সুধা-পানে বিভোর হইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত। নিমাইর শ্রীঅঙ্গ কাঁপিতেছে, তিনি যেন

আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। দর্শকমণ্ডলীর অনেকেরই ইচ্ছা,—নিমাইকে ধরিয়া দাঁড়ান, কিন্তু কাহারও সে সাহস হইল না।

দৈবযোগে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই সময়ে এইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে চিনিতেন। ভিড়ের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে গিয়া ভাবাবিষ্ট গৌরসুন্দরকে জড়াইয়া ধরিলেন। নিমাইর বাহ্যজ্ঞান হইল, চাহিয়া দেখিলেন—শ্রীপাদ-ঈশ্বরপুরী গোস্বামী তাঁহাকে ধরিয়া দণ্ডায়মান। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। পুরী বাধা দিয়া পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন। নিমাই বলিলেন, আজ আমার গয়া দর্শন সফল হইল। আমি আজ কৃষ্ণভক্তের দর্শন পাইলাম। শ্রীপাদ, আপনার চরণে আমার এই ভিক্ষা যে আমি সংসার-সাগরে মগ্ন,—আমায় উদ্ধার করুন। আমি এই দেহ আপনার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। আপনি আমায় শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সুধাপান করাইয়া কৃতার্থ করুন।

পুরীগোস্বামী গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তোমার চরিত্রে এবং তোমার পাণ্ডিত্যে আমি বুঝিয়াছি, তুমি মানুষ নও,—সাক্ষাৎ **ঈশ্বর**। আমি আর তোমার কি উদ্ধার করিব? তুমিই জগতেরই কোটী কোটী মনুষ্যকে উদ্ধার করিবে।"

শ্রীগৌরাঙ্গ যথাবিহিত কৃত্যাদি করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন, রন্ধন শেষ করিলেন। এই সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণ-নাম করিতে করিতে প্রেমাবেশে গৌরসুন্দরের নিকট উপস্থিত

হইয়া বলিলেন "পণ্ডিত, বেশ সময়ে তোমার বাসায় এসেছি।" নিমাই বলিলেন ইহা আমার পরম ভাগ্য।"

এই বলিয়া তিনি অন্ন নামাইয়া একখানি পাত্রে সাজাইলেন এবং বসিবার আসন দিয়া বলিলেন "প্রভো এইবার অনুগ্রহ করুন"। পুরী গোস্বামী বিস্মিত হইয়া বলিলেন "তবে তুমি কি খাইবে? এই অন্ন দুইভাগ কর।" নিমাই করযোড়ে বলিলেন—শ্রীপাদের পরিতৃপ্তি হইলেই আমার পরমানন্দ। আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার রন্ধন করিয়া লইতেছি।"

ঈশ্বর পুরী ভোজনে বসিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে নিমাইর রন্ধন শেষ হইল। নিমাই কোন বিষয়েই অদক্ষ নহেন। আলস্য কাহাকে বলে, নিমাই কখনও তাহা জানিতেন না। শ্রমে কখনও তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। তাঁহার মত দৌড়িতে কেহ পারিত না, সন্তরণে তিনি সকলকে পরাজিত করিতেন, বাক্‌চাপল্যে সরস্বতীও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন, পাণ্ডিত্যে ও প্রখর বুদ্ধি-প্রতিভায় তাঁহার অমানুষিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইত। গয়ায় সেই সকল ভাবের কোনও চিহ্ন নাই। এখানে তাঁহার বিপুল শক্তি ভক্তিভাব-প্রকটনে পরিণত হইয়াছে। এখানে তিনি দিন যামিনী ভক্তিভাবে বিভোর।

গয়াধামে কয়েক দিবস শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সঙ্গলাভ করিয়া গৌরসুন্দর তাঁহার নিকট দশাক্ষর গোপালমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে শ্রীগৌর-ভগবানের যে প্রবলতম প্রেমাবেশ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীমন্ত্র গ্রহণান্তে গুরুদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রার্থনা করিলেন "প্রভো আমি এই দেহ তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম, তুমি আমার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত কর, যেন আমি নিরবধি কৃষ্ণ প্রেমসাগরে ভাসিতে পারি", তদ্‌যথা,

তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বোলে "দেহ আমি দিলাম তোমারে।
হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥

পুরীগোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গকে বুকে লইয়া প্রেমে অধীর হইলেন, নয়ন জলে উভয়ের অঙ্গ ভিজিয়া গেল, উভয়ে প্রেমাবেশে কাঁপিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে এই সাত্ত্বিকভাব কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইল।

(২)

এই দিন হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমাবেশ ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। তিনি সততই ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন। গয়াধামে একদিন তিনি নিভৃতে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ধ্যানানন্দে মগ্ন হইলেন, সহসা তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল,— তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া তীব্র-মধুর-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, আর বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন—"হরি, আমার জীবনধন, এই না আমি তোমার দর্শন পাইয়াছিলাম, এই না আমায় দর্শন দিয়া তুমি আমায় প্রেমানন্দে মগ্ন রাখিয়াছিলে! হৃদয়-বিহারী প্রাণের হরি, আমার মনচুরি করিয়া এখন কোথায় পালাইলে,

প্রাণনাথ একবার দেখা দাও।” এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥
গড়াগড়ি করেন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন নিজ ভক্তি-বিরহ-সাগরে॥

শিষ্যগণ এই ভাবান্তর দেখিয়া স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন—প্রথমতঃ তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেক যত্নে শ্রীগৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন,—শান্ত হইয়াই তিনি মর্ম্মঘাতিকথা বলিতে লাগিলেন, “তোমরা বাড়ী চলিয়া যাও, আমি আর বাড়ীতে যাইব না। আমি শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতে মথুরায় যাইব, দেখি সেখানে তাঁহার দর্শন মিলে কি না।”

শিষ্যগণ বুঝিলেন গৌরসুন্দর ভক্তিরসে মত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে এখন সংসারে রাখা কঠিন। শিষ্যগণ অনেক প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা কেবল কথার কথামাত্র। রাত্রি-শেষে গৌরসুন্দর সজ্জাত্যাগ করিয়া প্রেমাবেশে মথুরার পথ ধরিলেন। শিষ্যেরা তখন নিদ্রায় বিভোর। কিছুদূরে যাইয়া তিনি সহসা এক দৈববাণী শুনিলেন,—“থাম, গৃহে ফিরে যাও, যখন সময় হইবে তখন মথুরায় যাইবে, এখন নবদ্বীপে যাও।” গৌরসুন্দর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, আকাশপানে চাইলেন—নীলাকাশে তখনও দুই চারিটী তারা দেখা যাইতেছিল, মাথার উপরে অনন্ত নীলনভঃস্থল—সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে ও বামে ধূ ধূ করিতেছে,—অনন্ত মাঠ। বিশাল

বিপুল প্রান্তরে দাঁড়াইয়া গৌরাঙ্গসুন্দর স্তম্ভিতভাবে আকাশপানে তাকাইয়া রহিলেন। আর কোনও শব্দ শুনিতে পাইলেন না। দুই চারিবার সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত করিলেন—কিছুই দেখিতে পাইলেন না—উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল—তাঁহার নয়নকোণে জলবিন্দু দেখা দিল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "কৃষ্ণ, তুমি জান, তবে কি এখন আমার আশা পূরিল না। শ্যামসুন্দর আবার কবে তোমার দর্শন পাব।" এই বলিয়া তিনি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন, আবার আকাশবাণী হইল ঃ—

এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি।
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনি॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ, লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ শচীর গর্ভেতে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি ধন॥
ব্রহ্মা শিব সনকাদি যে রসে বিহ্বল।
মহাপ্রভু অনন্ত গায়েন যে মঙ্গল॥
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে।
অবতীর্ণ হইয়াছ জানহে আপনে॥
সেবক আমরা প্রভু চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাম চরণে তোমার॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যেন দীর্ঘস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইলেন—বাসায়

আসিলেন, শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম ও গয়াতীর্থ প্রণাম করিয়া শিষ্যগণসহ নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(৩)

শচীমাতা ও প্রিয়াজী গৌরাঙ্গদর্শনে নবজীবন লাভ করিলেন, শিষ্যগণ প্রফুল্ল হইলেন। শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র ও অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন। নবদ্বীপে নবদ্বীপচন্দ্রকে পাইয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন। নবদ্বীপবাসীরা একটা বিষয় সবিশেষ লক্ষ্য করিলেন, তাহা এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ এখন পরমবিনয়ী ও সর্ব্বদা ভক্তিবিহ্বল। শ্রীমান্‌ পণ্ডিত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবান্তর স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলেন। পাদোদক তীর্থের কথা বলিতে গেলেই শ্রীগৌরাঙ্গ অঝোরনয়নে রোদন করেন, যেন নয়নযুগল দিয়া গঙ্গাপ্রবাহ বহিতে থাকে। সময় নাই, অসময় নাই, নিভৃতে বসিয়া কেবল "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া ব্রজবিরহিনীর ন্যায় বিনাইয়া বিনাইয়া রোদন,—এই ভাব দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, সদাশিব, মুরারিপণ্ডিত, শ্রীবাস শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গের এই ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু শচীমা ও শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে নিমাই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর পবিত্র গৃহেই অধিক সময় যাপন করিতেন, ভক্তগণ এইখানে আসিয়া মিলিত হইতেন,

কৃষ্ণকথার সুধাতরঙ্গ উঠিতে না উঠিতেই নিমাই প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, একবারে বাহ্যজ্ঞানহারা হইতেন। চেতনা পাওয়ামাত্র "কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন। অধ্যাপনা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। পড়াইতে আরম্ভ করিলে নিমাই কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনও কথাই বলিতেন না। শিষ্যগণের নিকট নিমাই একদিন কাতরভাবে বলিলেন, "ভাই সব. আমাদ্বারা আর কোন আশা নাই, যা হইবার হইয়াছে। কৃষ্ণভিন্ন আর আমি কোন পাঠই দেখিতে পাইতেছি না,—কৃষ্ণ ভিন্ন সকলই মিথ্যা,—একমাত্র কৃষ্ণই সকল পাঠের সারসত্য। যদি ইহাতে তোমাদের মন তুষ্ট না হয়, তবে অন্য গুরুর শরণ লও।" শিষ্যগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া নীরব হইলেন। এইদিন হইতেই নিমাই পণ্ডিতের টোলে দরজা পড়িল। ছাত্রগণও গুরুর সহিত কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন, এবার প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা নরজীবন লাভ করিলেন।

এদিকে শচীদেবী ব্যাকুল হইলেন। ভক্তগণের নিকট মনোদুঃখ বলিয়া লাভ নাই, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে পাগল, নিমাই এখন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু পুত্রবধূটী লইয়া কেবল একমাত্র তাঁহারই অনুপায়। নিমাইকে শচী যদি বলেন, "বাপ এমন হইলি কেন",নিমাই বিনয়নম্র কাতরস্বরে বলেন,"তাইতো মা, কেন যে এমন হইলাম বলিতে পারি না, কৃষ্ণছাড়া আমার আর কিছুই ভাল লাগে না, আর কিছুতেই আমার মন প্রবোধ মানে না; বল মা, এখন আমি কি করি?" বৃদ্ধা শচীমাতা বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

স্বামী নিলা, কৃষ্ণ! মোর নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥
অনাথিনী মোরে, কৃষ্ণ! এই দেহ বর।
সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর॥

শচীমাতা মনে করিতেন, ভুবনমোহিনী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার মধুর দর্শনে যদি বিশ্বম্ভরের মন স্থির হয়,—এইজন্য বধূকে গোপনে ডাকিয়া তিনি বিশ্বম্ভরের গৃহে পাঠাইতেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার চরণসমক্ষে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু ভাবে ভোরা বিশ্বম্ভর ফিরিয়াও তাঁহার প্রতি দৃক্পাত করিতেন না। তিনি সজলনেত্রে গৃহ হইতে বাহির হইয়া শাশুড়ীর কাছে আসিতেন। প্রিয়াজীর মুখমণ্ডল দেখিয়াই শচীমাতা বুঝিতেন, তাঁহার বিরাগী পুত্রের চিত্তে স্ত্রীর প্রতিও মমতা নাই। শচীমাতা কোন কথা বলিলে, গৌরসুন্দর তাঁহাকে সংসারের অনিত্যতা ও কৃষ্ণপ্রেমের সারসর্ব্বস্বতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ উপদেশ দিতেন। শচীমা নীরবে নীরবে নিমাইর কথা শুনিতেন, কিন্তু তাহাতে নিমেষের তরেও তাঁহার মন বসিত না। কথন কথন তিনি বিকট গর্জ্জন করিতেন তাহাতে শচীদেবী ও প্রিয়াজী ভয়ে ভীতা হইতেন। নিমাই সারা রাত্রি কেবল হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া উঠ্‌বোস্ করিতেন, তাঁহার একপলও নিদ্রা হইত না।

এই নিদারুণ ভাব দেখিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে নীরবে তাঁহার সেবা করিতে প্রয়াস পাইতেন, তাঁহার পদমূলে বসিয়া তাঁহার পদসম্বাহন করিতেন, কথন বা ব্যজন লইয়া বাতাস দিতেন

কখন বা মৃদুমধুর ভাবে দুই একটি কথা বলিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যুত্তরে কেবল এইমাত্র বলিতেন,—"আমার এখন আর কোন কথা বলিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণনাম শুনাইয়া আমায় শীতল কর"।

প্রিয়াজী তাঁহার কথার উত্তরে মৃদু মধুরভাবে বলিতেন,—আমি কেবল তোমার নামই জানি, তোমাকেই চিনি, আর কিছু জানি না। তুমি শান্ত হও, তুমি যে মাকে এত ভালবাস এত ভক্তি কর, মায়ের যে কত দুঃখ, হইয়াছে তাহা বুঝিতে পার কি ?" নিমাই প্রত্যুত্তরে কাতরকণ্ঠে বলিতেন, "মাকে কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন, শান্তি দিবেন, তুমি মায়ের সেবা করিও, মাকে দেখিও,—আমি এখন আমাতে নাই, আমায় ক্ষমা কর।" এই বলিয়া আপন মনে "হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাত করিতেন।

দিবাভাগে কত লোক আসিত, মহামহা পণ্ডিতগণ তাঁহাকে শান্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দিতে আসিলে তাঁহাদিগকে তিনি এমন করিয়া কৃষ্ণকথা বুঝাইয়া দিতেন যে তাঁহারা তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে বিশ্বম্ভর পরমব্রহ্ম ও শব্দ মূর্তিময়, তাঁহার বাক্যই বেদ।

পরম ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ-মূর্ত্তি হয়।
যে শব্দে যে বাখানেন তাই সত্য হয়॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া নানা প্রকার কৃষ্ণ-ভক্তির উপদেশ দিতেন যথা:—

বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান॥
যাবত আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবত্ত কৃষ্ণের পাদপদ্মে কর ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণ ধরিয়া বলি, কৃষ্ণ—দেহ মন॥
যত শুনি শ্রবণে—সকলি কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম॥
তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণ নামে পূর্ণ হউক সবার বদন॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউক তোমা সভাকার ধনপ্রাণ॥

এইরূপে তিনি শিষ্য ও পণ্ডিতগণের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণের আনন্দের আর পার নাই, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—নদীয়ায় কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণভক্তির বন্যা-তরঙ্গ আসিয়াছে, নদীয়ার সর্ব্বপ্রধান মহাশক্তিশালী তরুণযুবক পণ্ডিতাগ্রগণ্য গৌরাঙ্গসুন্দর এখন সকল ছাড়িয়া কৃষ্ণনামে উন্মত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করিলেন, এবার—

খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ॥
যে প্রভু আছিলা ভোলা মহা বিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি বাসে॥

গৌরসুন্দর এইরূপে কৃষ্ণনামের বন্যাতরঙ্গে সমগ্র নবদ্বীপে পরিপ্লাবিত করিয়া তুলিলেন। শিষ্য ও ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন, কলিকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বস্বার্থ লাভ হয়—"এস আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন করি,—যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লঞা॥
আপনে কীর্ত্তননাথ করয়ে কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥

এইটীই—আদি সঙ্কীর্ত্তন। এই দিন হইতেই সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি। গৌরসুন্দর আবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তন করিতেন বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন, আবার উঠিয়া কীর্ত্তন করিতেন, পুনর্ব্বার বিবশ হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইতেন। এই সকল ব্যাপারে সমগ্র নদীয়ায় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল—নিমাই পণ্ডিতের এই মহাভাবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ইহাতে দর্শক ও শ্রোতামাত্রেই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। সকলের মনেই নানা প্রকার সন্দেহের কারণ হইতে লাগিল। অতি বড় পাষণ্ডীরও মনে হইতে লাগিল, নিমাই পণ্ডিত মানুষ নহেন—এমন ভাবাবেশ মানুষে সম্ভবে না—আর মানুষ কথনই এমনভাবে কৃষ্ণনামে মত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সুখসম্পদ্ ত্যাগ করিতে পারে না। ভগবৎশক্তি ভিন্ন মানুষের এ শক্তি হয় না—পাষণ্ডদের মনেও এই ভক্তিবিশ্বাস সঞ্চারিত হইল।

মহাপ্রকাশ

(১)

শ্রীগৌরসুন্দরের চরিতে তিনটি ভাব প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়,—ভক্ত-ভাব, গোপীভাব ও স্বয়ং ভগবদ্ভাব। গয়া হইতে আগমনের পরেই প্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তভাব ও গোপীভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ভক্তভাব ও গোপীভাবের আভাস দেওয়া হইয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার এই ভাব-সন্দর্শনে আশান্বিত ও আনন্দান্বিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রধান প্রধান কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস প্রভৃতির নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপাদ অদ্বৈতের সভায় এই সংবাদ প্রচারিত হইল। শ্রীভগবান্ যে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অদ্বৈত তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন—তবে বোধ হয় আমার স্বপ্ন সফল হইবে। আমি একদিন গীতার কোন শ্লোকাংশের অর্থ ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মনোদুঃখে উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিলাম। এই অবস্থায় রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইল। সহসা আমার গৃহে যেন একব্যক্তি প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আচার্য্য, তুমি যে শ্লোকের অর্থ ভাবিতেছ, তাহার অর্থ এইরূপ। তুমি উঠ, উঠিয়া ভোজন কর। তুমি আমার পূজা করিও। যাঁহার জন্য এত সঙ্কল্প ও এত আরাধনা করিয়াছ, সেই আমি

তোমার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি। যে মূর্ত্তি ব্রহ্মারও দুর্লক্ষ্য সেই মূর্ত্তিতে আমি আসিয়াছি, তোমার অনুগ্রহে জগতের জীব আমার এই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ ॥

তুমি উঠিয়া আহার কর, আবার আহারের সময়ে আমার দেখা পাইবে।" মনে ভাবিলাম—একি স্বপ্ন—না জাগরণ। চাহিয়া দেখি—সম্মুখে শ্রীশচীনন্দন,—**বিশ্বম্ভর।**

দেখিতে দেখিতেই—অমনি অদর্শন! স্তম্ভিত হইলাম। মনে ভাবিলাম কৃষ্ণের একি লীলা। তোমরা বলিতেছ বিশ্বম্ভর এখন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল। তা হইতে পারে। বড় মানুষের পুত্র,—নীলাম্বরের দৌহিত্র,—নিজেও সর্ব্বগুণে উত্তম। পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণভক্তি হওয়াই তো উচিত। তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর।"

এদিকে নিমাইর আর সে ঔদ্ধত্য নাই, গর্ব্ব নাই, পাণ্ডিত্যাভিমান নাই। নিমাই এখন দীনাতিদীন,—ভক্ত দেখিলেই তাঁহার পায়ে পড়েন, ধূলায় গড়াগড়ি দেন, কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করেন, কেহ গঙ্গা স্নানে গমন করিলে তাহার গামছা ও বস্ত্রাদি বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন।

ভক্তগণ নিমাইর ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, প্রায় সকলের মনেই আশা হইল,—এবার পাষণ্ডিদলন হইবে। নিমাই সর্ব্বতোভাবে ক্ষমতাশালী—যেমন রূপ, তেমনই প্রতিভা। নিমাইর ন্যায় পণ্ডিত যদি কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন, তবে সে ব্যাখ্যা খণ্ডনে

কাহারও ক্ষমতা থাকিবে না ;—ভক্তগণ এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু নিমাইর ভক্তি-বিকার ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিল। তিনি কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, কখন নয়ন মুদিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কোনও কথা বলেন না, কখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেন, কখন বা এমন ভাবে দন্ত কড়মড়ি করিতে আরম্ভ করেন, যে তাহা দেখিয়া শচীমা ও প্রিয়াজী পর্য্যন্ত ভীত হয়েন।

শচীমা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন, সোনার প্রতিমা বউমার মুখ খানি শুকাইয়া গেল, তাঁহার হাসিমাখা প্রসন্ন মুখমণ্ডলে বিষাদের কালিমা দেখা দিল। শচীমা ও বউমা এদশা দেখিয়া একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। একশ্রেণীর বুদ্ধিমান্ লোক পরামর্শ দিলেন, নিমাই বায়ুরোগগ্রস্ত—উন্মত্ত। বাঁধিয়া না রাখিলে চিকিৎসাই চলিবে না, শিবাঘৃত ও পাকতৈল ব্যবহার করিতে হইবে। যে যা বলে শচীমা তাই বিশ্বাস করেন আর কায়মনবাক্যে কেবল শ্রীগোবিন্দের নিকটে প্রার্থনা করেন— "দীন দয়াময় আমার ছেলেটীকে ভাল কর।"

শচী জানিতেন শ্রীবাস তাঁহাদের পরম হিতকারী, সুধীর ও বুদ্ধিমান্ লোক। শ্রীবাসকে ডাকাইয়া তিনি পুত্রের অবস্থা জানাইলেন। শ্রীবাস আসিলেন, নিমাই তখন তুলসী প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। ভক্ত দেখা মাত্রই ভক্তির সাত্ত্বিক বিকার বাড়িল, নিমাই কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীবাসের পদমূলে পড়িয়া গেলেন। শ্রীবাস

নিমাইর প্রকৃত রোগ বুঝিয়া বলিলেন, "এ তো রোগ নয়—এ যে মহা ভক্তিযোগ।" নিমাই বলিলেন, আপনার এই কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম।" শ্রীবাস শচীমাকে বলিলেন—"ঠাকুরাণি, আপনার কিসের ভাবনা? এসকল ভাব বাহিরের লোকেরা বুঝিবেনা—ইহা কৃষ্ণভক্তির লক্ষণ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ক্রমে ইহার পরিণাম দেখিতে পাইবেন।" ক্রমেই ভাবের বিকাশ হইতে লাগিল। গদাধর ও অদ্বৈতাচার্য্য একদিন একত্র নিমাইকে দেখিতে গেলেন। সে দিনকার ব্যগ্রভাব ও তৎপরে বিষম মূর্চ্ছা ও মুখ-মণ্ডলের ভাবভঙ্গি দেখিয়া অদ্বৈত স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিলেন, যাঁহার জন্য তাঁহার এত প্রার্থনা,—এই সেই **তিনি**।

অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ পাদ্য অর্ঘ আচমনীয় গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গচরণ পূজা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ প্রবীণ সুপণ্ডিত ও ভক্তরাজ কমলাক্ষ আজ নদীয়ার ব্রাহ্মণ যুবক বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং ভগবান্ জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে গঙ্গাজল ও সচন্দন তুলসী দিয়া "আমারই **প্রাণনাথ**" বলিয়া পূজা করিলেন। পূজান্তে বৃদ্ধ অদ্বৈত নিমাইর শ্রীচরণমূলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

গদাধর দাঁতে জিভ কাটিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আচার্য্য দেব, আপনি আমাদের সকলের আরাধ্য। নিমাইপণ্ডিত বটেন,—এখন ভক্তও বটেন; কিন্তু এই বালককে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করা কি আপনার পক্ষে শোভা পায়?"

আচার্য্য বলিলেন—বালক! বালকই বটে, আর কতদিন পরে—এই বালকটীকে চিনিতে পাইবে।

গদাধরের প্রবোধ হইল—বিশ্বম্ভর স্বয়ং ভগবান্। এই সময়ের মধ্যে বিশ্বম্ভরের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। তিনি করযোড়ে আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দয়াময় আমায় কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরণ হয়।"

আচার্য্য একটুকু হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "আমার কাছেও তোমার চতুরতা? আমি কি আর তোমায় চিনিতে পারি নাই? প্রকাশ্যে বলিলেন—বিশ্বম্ভর সকল লোক অপেক্ষা তুমি আমার আপনার। তোমায় যেন সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন বৈষ্ণব মাত্রেরই মনের সাধ।

নিমাইর সাত্ত্বিক বিকার উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল, শ্রীকীর্ত্তনের তরঙ্গরোল ক্রমেই সমগ্র নবদ্বীপ ব্যাপিয়া পড়িল, কি-জানি-কি আকর্ষণে নদীয়ার সভ্য ভব্য লোকেরাও ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। অপর দিকে পাষণ্ডীরা ইহাতে উত্তেজিত হইয়া নানা কথা বলিতে লাগিল, নানা প্রকার রাজভয় দেখাইতে লাগিল। তখন মুসলমান রাজা। ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভয় পাইলেন।

(২)

ভক্তগণের এই ভয়ের দিনে নির্ভীক গৌরসুন্দর ক্রমশঃই স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শ্রীবাস নৃসিংহ পূজা করিতেছিলেন, গৌরসুন্দর পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বীরাসনে উপবেশন করিয়া সিংহ-রবে গর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "আরে ব্রাহ্মণ, তুই চক্ষু মুদিয়া

কার পূজা করিস! এই ত্থাখনা আমি স্বয়ং এসেছি। শ্রীবাসের ধ্যান ভঙ্গ হইল, তিনি চাহিয়া দেখেন বিশ্বম্ভর চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া বীরাসনে উপবিষ্ট,—তাঁহার হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। শ্রীবাস স্তম্ভিত হইলেন,। গৌরসুন্দর বলিলেন, "শ্রীবাস তোর উচ্চ কীর্ত্তনে, আর নাড়ার হুঙ্কারে আমি স্বধামে থাকিতে না পারিয়া এখানে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার পূজা কর—আমার স্তব কর।" শ্রীবাস কর জুড়িয়া বিশ্বম্ভরের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌর সুন্দর যে মহা মহাবতারী শ্রীবাস এই ভাব ব্যক্ত করিয়া তাঁহার স্তব করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "শ্রীবাস তুমি সস্ত্রীক ও সর্ব্বপরিবারসহ আমার পূজা কর।" তাঁহার আদেশ সেই মুহূর্ত্তেই প্রতিপালিত হইল। বিষ্ণু পূজার সচন্দন ফুল তুলসী শ্রীগৌর-চরণে অর্পিত হইল। পরিবারসহ শ্রীবাস শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্ম সমর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সকলের মস্তকে স্বীয় রাতুল চরণ অর্পণ করিয়া সকলকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন,—বলিলেন—"তোমরা নাম সঙ্কীর্ত্তনে ভয় করিও না। রাজা ইহাতে বাধা দিবে না। আমি সকলের অন্তর্য্যামী। আমি তাহার ভিতর দিয়া যে বাক্য বলিব, রাজা সেই কথা বলিবে। তোমরা এ কথা না বুঝিয়া ভয় কর কেন? রাজাকে কীর্ত্তনে হাসাইব, নাচাইব, কান্দাইব, নয়নজলে ভাসাইব। এমন কি সেই কীর্ত্তনানন্দে রাজার হাতী ঘোড়া পশু পাখী লোক জন সকলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিবে, এবং সঙ্কীর্ত্তনে নাচিবে। এ সকল তোমরা দেখিতে পাইবে। আমার কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা

কি এখনই বুঝিতে চাও? আচ্ছা তাহা হইলে তোমার ভ্রাতুস্পুত্রী নারায়ণীকে ডাক, এই চারি বৎসরের শিশুতে কৃষ্ণপ্রেমের খেলা দেখ। নিমাই নারায়ণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "নারায়ণী একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" নারায়ণী কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে কান্দিতে অধীর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়নজলে ভূমি সিক্ত হইল, নারায়ণীর দেহে ও কথায় কৃষ্ণপ্রেমের বহুল সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশিত হইল। ভক্তগণ চমৎকৃত হইলেন।

নিমাই বলিলেন—এখন বুঝিতে পারিলে তো? তবে আর ভয় কি? দিবানিশি কৃষ্ণকীর্ত্তন কর।"

শ্রীবাসের বাড়ীর এই ঘটনা অচিরে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ভক্তমাত্রেই তখন বুঝিতে পাইলেন,—আর ভয় নাই—এবার স্বয়ং ভগবান্ আসিয়াছেন।"

মুরারিগুপ্তকে এইরূপে একদিন নিমাই যজ্ঞবরাহরূপ দেখাইয়া ভীত, বিস্মিত ও বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অন্যান্য ভক্তগৃহেও গৌরসুন্দর ভক্তগণের ভাবানুযায় মূর্ত্তি দেখাইয়া ছিলেন।

[৩]

এই সকল ঘটনার কিছু পূর্ব্বে ভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম হরিদাসও নদীয়ার বৈষ্ণব সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য বহুভক্ত বহুদেশ হইতে অতর্কিত ভাবে নদীয়ায় আসিয়াছিলেন। এতদিন পরে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীপাদ নিত্যানন্দের শুভাগমন হইল। যমুনা জাহ্নবী সরস্বতীর ত্রিধারা সম্মিলিত হইলেন—নবদ্বীপে

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রেম-ভক্তির ত্রিধারারূপে প্রকাশিত হইলেন। গদাধর শ্রীনিবাস হরিদাসাদি ভক্তবৃন্দ ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ তুলিলেন। এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বড়্‌ভুজরূপ প্রকট করিয়া ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ সেরূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরকেই একমাত্র সেব্য বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ স্বরূপের এই বাক্য মন।
চৈতন্য ঈশ্বর, মুঞি তার একজন॥

তিনি পথে ঘাটে ও লোকের দ্বারে উপদেশ করিতেন :—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চন্দ্র সেই মোর প্রাণ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্তগণ এই সময়ে শ্রীবাস ভবনে সমবেত হইয়া কীর্ত্তনানন্দ করিতেন।

অদ্বৈতের নবদ্বীপে ও এক বাড়ী ছিল, তিনি কখনও নবদ্বীপে কখনও শান্তিপুরে থাকিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন প্রকাশ্য ভাবে আপন ভগবত্তা জনসমাজে প্রকটন করিতেছিলেন, এবং এইরূপে যখন প্রায় প্রতিদিনই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার এক একটি অতি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছিল, অদ্বৈত প্রভু নিজেও তাহার কিছু কিছু দেখিয়া গিয়াছিলেন। সংপ্রতি তিনি শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া নিভৃত ভাবে এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এই সময়ে একদিন শ্রীবাসের অনুজ রামাই

পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, "রামাই, তুমি শান্তিপুরে গিয়া আচার্য্যকে বল যে তুমি যাঁহার জন্য এত আরাধন করেছ, যাঁহার জন্য এত রোদন করেছ, যাঁহার জন্য কত উপবাস করেছ, তিনি এসেছেন। তুমি বলিও,—তিনি আমায় বলিয়া দিয়াছেন, যে পূজার সাজসজ্জ লইয়া ঠাকুরাণীসহ নবদ্বীপে যাইয়া তোমার নিজের আনীত ঠাকুরটীর পূজা কর।"

সংবাদ পাইয়া আচার্য্য প্রভু সস্ত্রীক সন্দিগ্ধমনে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতের এ সন্দেহ কেবল ভঙ্গিক্রমে অপরের সন্দেহ নিরসনের জন্য। অদ্বৈত গৃহিণী শ্রীমতী সীতাঠাকুরাণী আচার্য্য পুত্র অচ্যুতানন্দ প্রেমে অধীর হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। দাসদাসী পর্য্যন্ত এই প্রেম-পাথারে নিমজ্জিত হইল। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য পরম পণ্ডিত। যাঁহাকে তিনি পূজা করিতে যাইতেছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কিনা, তিনি যে নবদ্বীপে আসিয়াছেন, ইহা তিনি আপন মনে জানিতে পাইয়াছেন. আচার্য্য গোপনে গোপনে প্রথমতঃ তাহার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন পরীক্ষায় তাঁহার নিশ্চিত প্রতীতি হইল যে শ্রীশচীনন্দন সর্ব্বজ্ঞ; তখন তিনি পূজার যাবতীয় সাজসজ্জ লইয়া সহধর্ম্মিণী সহ পরমানন্দে শ্রীগৌরাঙ্গচরণ অর্চ্চনা করিতে গমন করিলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া আচার্য্য দেখিতে পাইলেন, শ্রীশচীনন্দন বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট; ভক্তগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া চারিদিকে দণ্ডায়মান। সস্ত্রীক আচার্য্য দূর হইতেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে উপনীত হইয়া দেখিলেন :—

জিনিঞা কন্দর্প-কোটি-লাবণ্য-সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক-সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন করুণা প্রচুর॥
কোটি মহাসূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা ; ছত্র ধরেন অনন্ত।

ইহা ছাড়া তিনি আরও দেখিতে পাইলেন,—স্বর্গীয় দেবগণ সমবেত হইয়া এখানে উপস্থিত। ব্রহ্ম মহেশ প্রভৃতি দেবতাগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরের স্তব করিতেছেন। জ্যোতির্ম্ময় আকার ভিন্ন তিনি এখানে পার্থিব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে ও নীচ ভাগে যতদূর অদ্বৈতের দৃষ্টি চলিল, তিনি জ্যোতির্ম্ময় দেবগণের সমাগম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না—দেখিলেন, এই সকল দেবগণ করজোড়ে শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরের স্তুতি করিতেছেন। অদ্বৈত এই অশ্রুতপূর্ব্ব, অচিন্ত্য, অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মুখে কোনও বাক্য সরিল না, তিনি নির্ব্বাক্ ও বিহ্বল হইয়া শ্রীগৌরচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন।

পরম করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন—"আচার্য্য তোমার আরাধনায় আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, আর আমাকে ভুলিয়া তুমি ঘরে রহিয়াছ? এখন সস্ত্রীক আমার পূজা কর।"

আচার্য্য প্রেমভরে কাঁদিতে লাগিলেন, শ্রীসীতাঠাকুরাণীর আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া গলায় বসন লইয়া প্রণত হইলেন। আচার্য্য

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ গঙ্গাজলে শ্রীচরণ ধৌত করিয়া উহাতে সচন্দন তুলসী পত্র অর্পণ করিতে লাগিলেন। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া আরত্রিক করিলেন, চারিদিক্ মঙ্গল বাদ্যনিনাদে মুখরিত হইল। জয়জয়ধ্বনির তুমুল রবে ভক্তগণের হৃদয় মাতিয়া উঠিল। অদ্বৈত প্রভু ষোড়শ উপচারে শাস্ত্রদৃষ্টে পটল বিধানে বিশ্বম্ভর দেবের শ্রীচরণ পূজা করিলেন।

শ্রীগৌর-পূজকাগ্রগণ্য অদ্বৈত প্রভু পূজা শেষ করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্য" দেবায় এই প্রসিদ্ধ প্রণতি-শ্লোকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে "শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্র অনুসারি।" শ্রীল অদ্বৈতকৃত স্তবের আরম্ভ এইরূপ ঃ—

জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ **বিশ্বম্ভর**। *
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর॥
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু **মহা-অবতারী**।

---

* সর্ব্ববেদজ্ঞ শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের বিশ্বম্ভর নাম উল্লেখ করিয়া স্তব করেন। শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন, তাঁহার এই স্তব শাস্ত্রসম্মত। প্রকৃত পক্ষে এই বিশ্বম্ভর নামটী শ্রীভগবানের বৈদিক নাম। অথর্ব্ববেদ সংহিতায় বিশ্বম্ভর নামীয় মন্ত্র স্পষ্টতঃই দৃষ্ট হয় তদযথা ঃ—

"বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা।"

(দ্বিতীয় কাণ্ড ৩ অঃ ১৭ সূ ৫ মন্ত্র।)

জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস॥

* * * *

তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন॥

* * * *

হে বিশ্বম্ভর, (বিশ্বং সর্ব্বং প্রাণিজাতং বিভর্ত্তি অনুপ্রবিশ্য ভক্তিরসেন পোষয়তীতি বিশ্বম্ভরঃ।) সংজ্ঞায়াং ভৃতৃ বৃজি ইত্যাদিনা খচ্। "অরুদ্বিষদজন্তস্য মুম্" ইতি মুম্। তাদৃশস্তং বিশ্বেন কৃৎস্নেন ভরসা পোষণশক্ত্যা, ডুভৃঞ্ ধারণ-পোষণয়োরিত্যস্মাৎ "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন" (১৪, ১৮৮) ইতি অসুন্। মা মাং পাহি রক্ষ ইত্যর্থঃ।

মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করা হইল, উহা আমাদের কল্পিত নহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সিদ্ধ গ্রন্থকার-মহোদয় শ্রীশ্রীমদনগোপালদেবের কৃপা-প্রসাদে বেদের সার-মর্ম্মই তদীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর নামের নিরুক্তি-প্রকটন-প্রয়াসে তিনি লিখিয়াছেন :—

প্রথম লীলায় তার বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥

যাহারা শ্রীশচীনন্দন বিশ্বম্ভর নামটীর শব্দ প্রমাণ দেখিতে পান না, ইহাতে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। সমুজ্জ্বল প্রেমানন্দরসময় কনককান্তি শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরদেবের এই উপাসনা-মন্ত্র অতি স্পষ্টতঃই শ্রুতিতে নিহিত রহিয়াছে। দয়াময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই গৌরমূর্ত্তিতে তাঁহার ভক্তগণকে আরও কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

এই তোর দুই খানি চরণ কোমল।
ইহারি সে রসে গৌরী শঙ্কর বিহ্বল॥ *

এইরূপ স্তব করিতে করিতে নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া অদ্বৈত প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। পরম করুণাময় শ্রীগৌর ভগবান্ কৃপা করিয়া অদ্বৈত প্রভুর মস্তকে শ্রীচরণ তুলিয়া দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন।

সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত মাথায়॥

এইরূপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তদীয় পারমৈশ্বর্য্য প্রকটন করিয়া ভক্তবর্গকে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস ও প্রেমমূর্ত্তি আনন্দকন্দ স্বয়ং শ্রীমন্নিত্যানন্দ নবদ্বীপের কেন্দ্রে কেন্দ্রে শ্রীকৃষ্ণ নামের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে ছিলেন। কীর্ত্তনানন্দের তুমুলরবে সমগ্র নদীয়া মুখরিত হইয়া উঠিতে ছিল। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শ্রীবাসের ভবনে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রেত কীর্ত্তনানন্দের প্রচারের প্রধানতম সহায় হইলেন। তাঁহার

---

* এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে শ্রীপাদ অদ্বৈত ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতা, ঈশান সংহিতা প্রভৃতি শ্রীগৌর-উপাসনার তন্ত্রনিচয় পাঠ করিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গের স্বীয় মন্ত্রধ্যানাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

অপিচ তাহাতে কখনও শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি, কখনও শ্রীরামমূর্ত্তি কখনও বা যুগপৎ ষড়ভূজমূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়াই শ্রীগৌরসুন্দরকেই শ্রীপাদ অদ্বৈত মহাবতারী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

প্রেমোচ্ছ্বাস ও প্রেমশক্তি মহাবন্যায় মহামহা নাস্তিক পাষণ্ডী গণ্ড-শৈলকেও ব্রজরসে নিমজ্জিত করিয়াছিল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ দ্বারাই মহাপ্রভু মহাদস্যু জগাই মাধাইর উদ্ধার করেন।

শ্রীবাস-অঙ্গনে সর্ব্বদা কীর্ত্তন হইত, আবার কোন কোন দিন চন্দ্রশেখরের ভবনও কীর্ত্তন-নাদে মুখরিত হইয়া উঠিত। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, পুণ্ডরীক. বিদ্যানিধি, মুরারিগুপ্ত, হিরণ্য-গর্ভ, হরিদাস, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দনাচার্য্য, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, নারায়ণ, কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়ধ্বজ, গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয় প্রভৃতি শত শত ভক্ত অহর্নিশ নামকীর্ত্তনে নবদ্বীপে হরিনামের তরঙ্গ প্রবাহ তুলিয়া জনসাধারণকে নবজীবন প্রদান করিতে ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার স্বীয় হ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপ মহা-প্রেম শক্তিশালী ভক্তগণের সহিত যে কীর্ত্তনানন্দের সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন, তাহার প্রভাব বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই নৃত্য কীর্ত্তনের প্রভাব বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

চতুর্দ্দিকে শ্রীহরিমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার রসে নাচে শিব, সে নাচে আপনে॥
যার নামে বাল্মীক হইল তপোধন।
যার নামে অজামিল পাইল মোচন।

যার নাম শ্রবণে সংসার বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতার কলিযুগে নাচে॥
যার নাম লইয়া শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র বদন প্রভু যার নাম গায়॥
সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নয়নে দেখে কত ভাগ্যবান্॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় শত শত পদাবলী আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যে গোলক মাধুরী প্রকাশিত হইত, ভক্তগণ তাহা নেত্র ভরিয়া পান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। সে মাধুরী ভাষায় ফোটে না, উপদেশে তাহা অভিব্যক্ত হয় না। দয়াময় নিজে নৃত্য করিয়া সে মাধুরী দেখাইতেন, সে নৃত্যমাধুরী-সন্দর্শনে নাস্তিক পাষণ্ডীর হৃদয়েও গোলক-বৃন্দাবনের প্রেমরস সঞ্চারিত হইত। সে নৃত্য —সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের আনন্দেরই অভিব্যক্তি। সচ্চিদানন্দের আনন্দ-শক্তির প্রবাহ ভক্ত-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে ভক্তদেহ স্বভাবতঃই অধীর হয়—নৃত্য সেই আনন্দশক্তি-প্রবাহেরই কার্য্য মাত্র। দয়াময় নিজে নৃত্য করিয়া ভক্তগণকে এই ভাব শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তভাব অপেক্ষা ভগবদ্ভাব-দর্শনেই অধিকতর সুখী হইতেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ ভক্তগণের অভিলাষ পূরণের জন্য একদিবস পারমৈশ্বর্য্যময়ী এক মহালীলা প্রকটন করিয়াছিলেন। এই লীলা (মহাপ্রকাশ) বা (সাতপ্রহরিয়া) ভাব নামে খ্যাত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে—শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ রীত্যনুসারে নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন, কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি সহসা বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া উপবেশন করিলেন। অন্যান্য দিন কখন কখন আবিষ্টভাবে এই-রূপ ঘটনা ঘটিত। এদিন আবেশের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। ভক্তগণ দেখিলেন সহস্র সূর্য্যকিরণের ন্যায় গৃহখানি সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উহারা চাহিয়া দেখেন—শ্রীশচীনন্দন বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি হইতেই এই অপূর্ব্বজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিয়াই ভক্তগণের প্রতি তিনি আদেশ করিলেন—"তোমরা অভিষেক-কীর্ত্তন কর।"

অমনি অভিষেক-কীর্ত্তন ও অভিষেক-কার্য্য আরম্ভ হইল। শ্রীল অদ্বৈত মহামন্ত্রবিদ্। তিনি মন্ত্রের ব্যবস্থা করিলেন। ভক্তগণ বেদের পুরুষ সূক্তের মন্ত্র পাঠ করিয়া কলসে কলসে গঙ্গাজলে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ প্রভৃতি গায়কগণ অভিষেক-মঙ্গল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নারীগণ উলুধ্বনি করিতে লাগি-লেন। মহা স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করা হইল। তাঁহার সমুজ্জ্বল কনককান্তি-কিরণে শ্রীবাস-মন্দির কনকিত হইয়া উঠিল, এমন জ্যোতি ও এত তেজ পূর্ব্বে কখনও কেহ সন্দর্শন করেন নাই। কিন্তু ইহাতে কেহই বিস্মিত হইলেন না। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে জানিতে পাইয়াছেন যে শ্রীশচীনন্দন—**স্বয়ং ভগবান্।**

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণের প্রতি কৃপা করার জন্য বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলেন। তেমন মহাজ্যোতির্ম্ময় শ্রীমূর্ত্তির কথা তাঁহারা

আর কখনও কোন শাস্ত্রে দেখেন নাই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকের উপরে ছত্র ধরিলেন। ভক্তগণ **মহা-অবতারী** শ্রীগৌরদেহে আপন আপন ইষ্টমূর্ত্তি দেখিয়া সেই সেই রূপের ধ্যানমন্ত্রে পূজা করিতে লাগিলেন, কেহবা তাঁহার দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে, কেহবা রামমন্ত্রে কেহবা নৃসিংহমন্ত্রে ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বৈতাদি প্রধান প্রধান পার্ষদগণ শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। এমন কি স্বয়ং শচীদেবীও এই সময়ে শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরদেবের পূজা করিয়াছিলেন।

সকলের নয়নেই প্রেমধারা। সকলেই মনের সাধে প্রভুর হাতে নানাবিধ ভক্ষ দ্রব্য প্রদান করিতে লাগিলেন, করুণাময় প্রভু মহাযোগেশ্বরভাবে সহস্র সহস্র ভাণ্ড দধিদুগ্ধ ক্ষীর, সহস্র সহস্র কদলী, রাশিকৃত মুদ্গ, পুঞ্জীকৃত নারিকেল, রাশি রাশি সন্দেশ, ও ফলমূল ভক্ষণ করিলেন। ভক্তগণ চমৎকৃতভাবে প্রভুর সেই মহাপ্রকাশ লীলা সন্দর্শন করিলেন। ইহার পরে তিনি ভক্তগণকে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রতিজনের জীবনের এক একটি গুহ্যতম ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। একজনকে বলিলেন, "ওরে, তোর মনে আছে কি, একদিন তোর ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল, আমি নিশীথে বিপ্ররূপে তোর কাছে বসিয়া সে রোগের শান্তি করিয়া দিয়াছিলাম।" শুনিয়া সে ভক্তটী অমনি মস্তক অবনত করিয়া প্রভুর চরণতলে প্রণত হইলেন।

গঙ্গাদাসকে বলিলেন, "গঙ্গাদাস একদিন রাজভয়ে নিশাকালে তুই সর্ব্বপরিকরসহ পালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলি, কিন্তু গঙ্গাঘাটে

আসিয়া খেয়ানৌকা না পাইয়া, মহাসঙ্কটে পড়িয়া আমার স্মরণ গ্রহণ করিয়াছিলি; তোর তখন এমনও মনে হইয়াছিল, যে যবনের ভয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবি। তখন সেই রাত্রিশেষে খেয়া-নৌকা লইয়া তোকে পার করিয়া দিয়াছিলাম, মনে আছে কি?"

গঙ্গাদাস বলিলেন—"ঠিক কথা। সে কি **তুমি**?" এই বলিয়া "তুমি" "তুমি" বলিতে বলিতে গঙ্গাদাস মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। সারাদিন এইরূপ বিবিধ অর্চ্চনায় ও অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনায় অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যা দেখা দিল। আরত্রিক আরম্ভ হইল। শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝর, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গের বাদ্য ও জয় জয় নিনাদে শচীনন্দনের আরত্রিক-সমারোহে শত শত ভক্ত মাতিয়া উঠিলেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে বৈকুণ্ঠ-ঐশ্বর্য্য ও বৈকুণ্ঠ-বৈভব প্রকাশ পাইল।

আরত্রিক অন্তে শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে বর প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীবৃন্দাবন-মাধুর্য্য, কেহ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠবৈভব প্রভৃতি স্বস্বভাবানুযায়ী রূপ-লীলাধামাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যে ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন অপর কোন বর কেহই গ্রহণ করিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বিস্মিত করিতে-ছিলেন, তখন সেই রূপ দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "সখে, আমি তোমার এই রূপ দেখিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, অস্থির হই-তেছি। তুমি এই রূপের উপসংহার কর। মহাপ্রকাশ দর্শনে গৌরভক্তগণের মধ্যেও সেই ভাবের সঞ্চার হইল। রাত্রিশেষে

আচার্য্যপ্রভু বলিলেন, "ঠাকুর যথেষ্ট হইয়াছে, আর তোমার এই পারমৈশ্বর্য্য আমরা সহিতে পারি না, আমরা ক্ষুদ্র মানব,—ভজন-সাধনবিহীন—তোমার এ জ্বলন্তপ্রভাবে আমরা অধীর ও অস্থির হইয়া পড়িতেছি। প্রভো, শীঘ্র এ রূপ পরিহার কর।"

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন "তথাস্তু"।—এই কথা বলিতে না বলিতেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলেই তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন—দেখিলেন চেতনার লেশ নাই। ইঁহারা তখন এক নূতন বিপদে পড়িলেন। দণ্ডের পর দণ্ড যাইতে লাগিল, নিমাইর শ্বাস আর বহিল না, দেহ নিস্পন্দ, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। রাত্রি প্রভাত হইল, নিমাইর নাড়ী-স্পন্দন পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। ক্রমে বেলা হইল, ভক্তগণ নানাপ্রকার যত্ন করিলেন, কিন্তু নিমাইর চেতনা ফিরিয়া আনিতে পারিলেন না। ভক্তগণ বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তপদ অসার অবশর ন্যায় পড়িয়া রহিল। ভক্তগণ যেখানে যে অবস্থায় হস্তপদ রাখিলেন, সেইখানে তেমনি পড়িয়া রহিল—সর্ব্বাঙ্গ একেবারে অসার। ভক্তগণের তখন আর বিন্দুমাত্রও আশা রহিল না, সকলেই স্থির করিলেন,—নিমাই তাহাদিগকে চিরদিনের তরে ছাড়িয়া গেলেন,—চারিদিকে শোকের হাহাকার উঠিল। অনেকেই 'হা নিমাই, হা বিশ্বম্ভর' বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলিলেন,—"আমি কিন্তু এখনও নিরাশ হই নাই, এই যে আড়াই প্রহরকাল ইনি মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন,

কিন্তু ইঁহার মুখমণ্ডলের লাবণ্য যেমন ছিল তেমনই আছে। কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে ইঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়, ইহা দেখিয়াছি। একবার কৃষ্ণকীর্ত্তন-করিয়াই দেখা যাউক।” তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণ সমবেত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নাম শুনিয়া শ্রীঅঙ্গে পুলক দেখা দিল, ভক্তগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া পুলকিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল, ধীরে ধীরে নিমাই উঠিয়া বসিলেন— বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে লইয়া তোমরা এত ব্যস্ত কেন? আবার কি আমার মূর্চ্ছা হইয়াছিল? তোমাদিগকে না জানি কত কষ্টই দিয়াছি। তোমরা আমায় ক্ষমা কর।”

অদ্বৈত বলিলেন “তোমার রঙ্গ তুমিই জান। তুমি এই ভক্ত,— আবার এই ভগবান্। তোমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, এখন গৃহে চল।” এই বলিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

এই মহাপ্রকাশে ভক্তমাত্রকেই প্রভু আপন আপন ইষ্টমূর্ত্তি দেখাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

যার যেন মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই বিশ্বম্ভর দেখে সেই অবতার॥
মহামহা পরকাশ ইহারে সে বলি।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥

সাত প্রহর ব্যাপিয়া মহামহা প্রকাশে ভক্তগণ ও জন সাধারণ বিস্মিত, স্তম্ভিত, চমৎকৃত ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

পতিত-উদ্ধার।

জীবের প্রতি করুণা-প্রকাশই,—দয়াময় শ্রীভগবানের অবতারের এক প্রধান কারণ। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মহাপ্রকাশের পর হইতে জীবের প্রতি অধিকতর দয়ালু হইলেন। তারকব্রহ্ম হরিনামে পতিত পাষণ্ডীদিগকে উদ্ধার করার জন্য তিনি মহাশক্তিশালী শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমদ্ ব্রহ্মহরিদাসের প্রতি ভার অর্পণ করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
"কৃষ্ণভজ, কৃষ্ণবোল, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥"

বিশ্বম্ভর বলিয়া দিলেন, "ইহা ব্যতীত আর কিছু বলিবে না, কোথায় কি ভাবে তোমাদের কার্য্য হইল, দিবা অবসানে আসিয়া আমাকে সে সংবাদ প্রদান করিও।"

আদেশ পাইয়া নিত্যানন্দ হরিদাস রাজপথে বাহির হইলেন, মুখে,—কেবল ঐ এক বোল :—

কৃষ্ণপ্রাণ, কৃষ্ণধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হঞা এক মন॥

দ্বারে দ্বারে দাঁড়াইয়া নিতাই ও হরিদাস এই মহামন্ত্র প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের রূপে, ভাবে, সরস ও সুললিত নাম-

উচ্চারণে নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইলেন। ঘরে ঘরে কৃষ্ণকথার সূত্রপাত হইল—হরিনামের বীজ পবিত্রধামে অঙ্কুরিত হইল। প্রভু নিতাই ও ঠাকুর হরিদাস এইরূপে প্রতিদিন নাম প্রচার করিতেন এবং দিবা অবসানে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে আসিয়া দিনমানের কার্য্যবিবরণ বলিতেন।

কিন্তু একদিন বড় বিপত্তি ঘটিল। নিতাই ও হরিদাস যদিও অনেকদিন ধরিয়া নবদ্বীপে রহিয়াছেন কিন্তু স্থানীয় অবস্থা ইঁহাদের বড় ভাল জানা ছিল না। জানিবার কারণও ছিল না। প্রেমিক ভক্তের সহিত বহির্জগতের সম্বন্ধ-চিরদিনই অল্প। এইদিন যখন ইঁহারা হরিনাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, সহসা দেখিতে পাইলেন—সম্মুখে দুইটা মহাদস্যু ; অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন ;—দস্যু দুইটা মদ্যপানে উন্মত্তপ্রায়, হেলিয়া টলিয়া চলিতেছে, বিকট শব্দ করিতেছে, চক্ষু দুইটা আরক্ত, ঠোঁঠের প্রান্ত বহিয়া ফেন পড়িতেছে, চকার বকার শব্দে শিষ্ট লোকদের ত্রাস জন্মাইতেছে, সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইতেছে, তাহার দিকেই ধাইয়া আসিতেছে।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস জানিতে পাইলেন,—ইহারা দুইটী সহোদর ভাই, নাম জগাই মাধাই ; ভালনাম—জগন্নাথ ও মাধব। ভাল ব্রাহ্মণকুলে ইঁহাদের জন্ম। কিন্তু মদ্যমাংস এমন কি গোমাংস পর্য্যন্ত ইহাদের উদরে ঢুকিয়া ইহাদিগের সর্ব্বধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছে। চুরি ডাকাতি, গৃহদাহ, পরের জাতিনাশই ইহাদের জীবনের কার্য্য। ইহাদের ভয়ে নদীয়ার নরনারী সর্ব্বদাই বিকম্পিত। রাজ সরকারের লোকেরা ইহাদের বাধ্য। নিত্যানন্দ

এই বিবরণ শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন "ঠিক হয়েছে পাপীদের উদ্ধারের জন্যই আমার প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, আজ ঠিক উপযুক্ত পাত্রই পাওয়া গিয়াছে :—

পাপী উদ্ধারিত প্রভু কৈল অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥

প্রভু যদি এই দুই জনকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবে সকলেই তাঁহার প্রভাব বুঝিতে পারিবে।" নিতাই মনে মনে বলিতে লাগিলেন, প্রভো যদি তুমি এই দুই উন্মত্ত আত্মাহারা মদ্যপকে কৃষ্ণ নামে উন্মত্ত ও আত্মহারা করিয়া তুলিতে পার, তবে বুঝিব তুমি প্রকৃতই আমার প্রভু। এই নদীয়ার পথে পথে জৈষ্ঠ্যের নিদারুণ রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, যদি এই দুই দস্যু উদ্ধারলাভ করে, তবে সকল শ্রমই সফল হইবে।" যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবত—

তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এই দুইরে করো যদি চৈতন্য প্রকাশ॥
এখন যে মদে মত্ত আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
"মোর প্রভু" বলি যদি কান্দে দুই জন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু বস্তুটি কি, পাঠক ইহাতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ মনের কথা হরিদাসকে বলিলেন। উভয়ে স্থির করিলেন—এই দুই জনকে হরিনাম দিতে হইবে। এই বলিয়া উহাদের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সভ্যভব্য লোকেরা বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন—"বিদেশী সন্ন্যাসী ঠাকুর, ওদিকে কোথা যাচ্ছ—ওখানে আর কেহ নয়,—জগাই মাধাই! উহারাই নবদ্বীপের রাজা, উহাদের হাতে পড়িলে এমন কেহ নাই যে রক্ষা করে।" নিতাই বলিলেন—"রক্ষাকর্ত্তা এক মাত্র মধুসূদন। কৃষ্ণই সকলের রক্ষক, আমরা উহাদিগকে হরি নাম শুনাইব।" দুষ্টলোকেরা মনে মনে হাসিয়া ভাবিতে লাগিল "এবার বেশ রঙ্গ দেখা যাবে।"

নিতাই ও হরিদাস দুই দস্যুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন :—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণভজ সব ছাড় অনাচার॥

মদের নেশায় জগাই মাধাইর একটুকু ঝুম ধরিয়াছিল,—নাম শুনিয়া ঝুম ভাঙ্গিয়া গেল,—আরক্তলোচনে মাথা তুলিয়া চাহিয়া মাধাই গর্জ্জিয়া উঠিল—"কে-রে ব্যাটা—কেষ্ট কেষ্ট,—এখনি তোদের কেষ্ট দেখাচ্ছি,—এই ছাখ" এই বলিয়া দুই ভাই দুই ভীষণ লগুড় লইয়া দাঁড়াইল এবং "ধর ধর" বলিয়া পশ্চাৎ ছুটিল। নিত্যানন্দ স্বভাবতঃই চঞ্চল ও বলবান্, হরিদাস ধীর, বয়োবৃদ্ধ ও দৌড়িতে অসমর্থ। নিতাই হরিদাসের হাত ধরিয়া উঁহাকে টানিয়া লইয়া অনেকদূরে আসিলেন। জগাই মাধাই স্থূলকায়, দৌড়িতে অসমর্থ, তাহাতে মদ্যপানে বিভোর, উহারা অনেকদূরে পড়িয়া রহিল বটে

কিন্তু পাছ ছাড়িল না। পথের লোক ভয়ে পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দুর্জ্জনেরা রঙ্গ দেখিতে লাগিল। হরিদাস ক্লান্ত হইয়া বলিলেন, —"ঠাকুর একটুকু দাঁড়াও, আমার দুই দিকেই প্রাণান্ত। না দৌড়িলেও দস্যুর লগুড়ে প্রাণ যাইবে, আর দৌড়াইতে গিয়াও হাফ ধরিতেছে। দস্যুরা দূরে আছে, একটুকু দাঁড়াও।"

নিতাই। বিষম ব্যাপার। ভাল বৈষ্ণব করিতে আসিয়াছিলাম। এখন প্রাণ রক্ষা হইলে হয়!

হরিদাস। তোমার যেমন বুদ্ধি, আজ অপমৃত্যুতেই প্রাণ যাবে। মাতালকে কৃষ্ণউপদেশ দিতে গিয়াছিলে, তেমনি তাহার উচিত শাস্তি। এখন প্রাণমাত্র অবশেষ।

নিতাই। যদি মাতালকে কৃষ্ণনামে উন্মত্ত না করিতে পারি, তবে প্রাণে প্রয়োজনই বা কি? ঠাকুরের আদেশেরই বা অর্থ কি, চল যাই ঠাকুরকে বলিগে।

হরিদাস। সে তো তোমারই কৃপা। তুমি যখন কোমর বাধিয়াছ তখন উহারা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ঐ দেখ উহারা আমাদের প্রায় নিকটে আসিয়াছে।

দস্যুদ্বয়। যাবে কোথা বাবা,—আজ আর এড়াইবার পথ নাই, জাননা বুঝি—এই জগামাধাই নদীয়ার রাজা।

নিতাই। ঐ এলো ঐ এলো, এস আবার দৌড়াই।

এই বলিয়া হরিদাসের হাত ধরিয়া চঞ্চল নিতাই "মধুসূদন রক্ষা কর, গোবিন্দ রক্ষাকর" বলিয়া হাসিতে হাসিতে আবার দৌড়িতে লাগিলেন।

হরিদাস। থাম থাম, আর পারি না। আমি বৃদ্ধ,—তোমার সহিত কি আমি দৌড়িতে পারি? তুমি চিরচঞ্চল,—তোমার বুদ্ধিতেই তো আজ এই বিপত্তি।

নিতাই। তুমি ত আচ্ছা বুড়! বল দেখি, আমার কি অপরাধ? তোমার ঠাকুরের কথা মনে ভাবনা। তিনি যেন একটি মহারাজ, তাঁহার আদেশ শুনেছ তো—"হরিনাম প্রচার করিতেই হইবে। কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।"

হরিদাস। সে তোমারই কাজ। বাঘের হাতে পড়িতেও ভয় নাই, কুমীরের মুখেও ভয় নাই, ভাল লোককেও মাতাল করিতে মজবুত, আর মাতাল ক্ষেপাইতেও মজবুত, আবার দৌড়িয়া পালাইতেও তেমনি পটু। তোমার কাজ তুমিই করিবে।

নিতাই। তোমাকে ছাড়া কিছুই হইবে না। ভয় করিলে চলিবে কেন? ভয় কর তো সে কথা প্রভুর নিকট বলিও। ঠাকুর নিকট যত সাধুত্ব, যেন নিরীহ ভাল মানুষটী।

হরিদাস। (ফিরিয়া চাহিয়া) বাঁচা গেল। ঐ দেখ মদমত্ত দস্যু দুইটী পথের ধুলায় পড়িয়া নিজেরাই হুড়হুড়ি করিতেছে। এখন ধীরে ধীরে চল।

নিতাই। দুর্দ্দশা দেখেছ, এদের উদ্ধার না হইলে আমি আর কখনও হরিনাম মুখে আনিব না। ঠাকুরকে আজ স্পষ্টই বলিব।

এই বলিয়া দুইজন আনন্দ-কোন্দল করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযথ ঘটনা বলিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর

দস্যুদ্বয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে উৎসুক হইলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীনিবাস উহাদের সকল পরিচয় বলিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ। বুঝিলাম, সেই দুইটা দস্যুর নাম জগাই মাধাই। এখানে আসিয়া হরিনামে বাধা জন্মাইলে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।

নিতাই। তা তুমি করিও, কিন্তু এই দুই দস্যুর উদ্ধার না হইলে আমি কখনও কৃষ্ণনাম মুখে আনিব না। আর তোমার কথাও শুনিব না। বল,—নিশ্চয় করিয়া বল—ইহাদিগকে উদ্ধার করিবে কি না? সাধুরা স্বভাবতই কৃষ্ণনাম করে, কিন্তু ইহাদিগকে যদি উদ্ধার করিতে পার তবে জানিব, তুমি যথার্থই—**পতিতপাবন**।

আমারে তরিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এদুহার উদ্ধারের সীমা॥

শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীপাদ, ইহারা যখন তোমাদের দর্শন লাভ করিয়াছে, ইহাদের উদ্ধারের আর বাকী কি?

বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিবে কুশল॥

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ এই কথায় আনন্দে হরিধ্বনি করিলেন। সকলেই মনে করিলেন, এবার জগাই মাধাইর উদ্ধার হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই কলিযুগে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই পাতকি-পরিত্রাণের মহামন্ত্র। তোমরা একত্র মিলিত হইয়া সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার কর, নগরে নগরে

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে। মৃদঙ্গাদি-বাদক ও গায়ক যে যে খানে আছে সকলকে সম্মিলিত কর, যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

হরিনাম সংকীর্ত্তন কলিযুগধর্ম্ম।
নাম গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে সাধি সব কর্ম্ম॥
আনহে যেখানে যেবা আছে ভক্তগণ।
মিলিয়া সকল লোক কর সঙ্কীর্ত্তন॥

পরদিন যথাসময়ে দলে দলে ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করার জন্য সমাগত হইলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস শ্রীনিবাস, মুরারিগুপ্ত, মুকুন্দদত্ত, চন্দ্রশেখর, শুক্লাম্বর প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণ সম্মিলিত হইলেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন-সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

সুধামধুর কীর্ত্তনরোলে নগরবাসী আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন, কিন্তু জগাই মাধাইর ইহাতে বড় ক্রোধ হইল। উহারা সারানিশি মদমত্তাবস্থায় নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্ম করিয়া দিবাভাগে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। উহারা কীর্ত্তনরোলে জাগিয়া উঠিল। মদঘুর্ণিতলোচনে গর্জ্জন করিতে করিতে ভৃত্যদিগকে হুকুম দিল "দ্যাখ্‌ত রাজপথে কে হল্লা করিতেছে, আমাদের বাড়ীর নিকটে নামীকীর্ত্তনের হল্লা— বেটাদের সাহস গ্যাখ। এখনই বৈরাগী বেটাদের মুণ্ডুপাত করিয়া ছাড়িয়া দিব। উহাদিগকে বলিয়া এস,—ফের গোলযোগ করিলে উহাদের প্রাণপর্য্যন্ত এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে।"

সংবাদবাহক সংবাদ দিল,—"ঠাকুর তোমরা অপর পথে যাইয়া কীর্ত্তন কর, এই পথে ঐ জগাই মাধাইর বাড়ী, ইহারা কৃষ্ণ

বিষ্ণু জানে না, সাধু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানে না। ইহাদের অত্যন্ত প্রতাপ। তোমাদের গান শুনিয়া দুই ভাইর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ইহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে, শেষে জাতি প্রাণ নিয়া টানাটানি হইবে। তোমরা অপর পথে গিয়া কীর্ত্তন কর।”

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। দ্বিগুণবেগে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, হরি হরি ধ্বনিতে সকল দিক মুখরিত হইল। ইহাতে জগাই মাধাইর ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিল। ইহার উপরে প্রহরী যখন ফিরিয়া গিয়া সংবাদ দিল যে, ঠাকুরেরা তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই তখন মাধাই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ঘরের বাহির হইল, জগাইও তাহার পশ্চাৎ ছুটিল। দুই ভাই চণ্ডমূর্ত্তিতে রাজপথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তখনও কীর্ত্তন সম্প্রদায় দূরে রহিয়াছেন।—কিন্তু শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—কেন না জগাই মাধাইর উদ্ধার করিতেই হইবে। তাই তিনি সম্প্রদায় ছাড়িয়া মোড় ঘুরিয়া অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখে—অবিরাম সুমধুর হরিনাম। নিতাই দূর হইতে দেখিলেন বিকটমূর্ত্তি মহাদস্যু জগাই মাধাই উগ্র মূর্ত্তিতে রাজপথে দণ্ডায়মান। আজ নিতাইর মনে ত্রাস নাই,—আজ মায়ের কোমল করুণা হৃদয়ে লইয়া নিতাইচাঁদ জগাই মাধাইর উদ্ধারার্থ উপস্থিত। সে তর্জ্জনগর্জ্জন শুনিয়া,—সেই ভীম ভৈরব উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি দেখিয়া—নিতাইর হৃদয় দুঃখে বিগলিত হইতে লাগিল। কোমল হৃদয়ের করুণার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল,—নয়ন ফুটিয়া অশ্রুবিন্দু নয়ন কোণে দেখা দিল, সিদ্ধ কবি ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন :—

দীন দয়ার্দ্রচিত্ত নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে দুহা পানে চায়॥

নিতাই প্রকৃতপক্ষেই জীবের দুঃখে কান্দিয়া ফেলিলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"হায়রে যে জীবের হৃদয় কৃষ্ণ-প্রেমের অধিষ্ঠানক্ষেত্র,—সেই হৃদয়ের এই দুর্দ্দশা! দয়াল নিতাই জগাই মাধাইর মুখের দিক চাহিয়',—"হরি হরি—"জয় জয় গৌর হরি" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু করুণার এই সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়াও দুই দস্যুর প্রাণ গলিল না। মাধাই হরিনাম শুনিয়া আরও উত্তেজিত হইল, যদিও তাহার হাতে দণ্ড ছিল, কিন্তু নিকটবর্ত্তী না হইলে ত দণ্ড দিয়া আঘাত করা যায় না। মাধাইর সে বিলম্বটুকুও সহিল না। হায়, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—সে পথ হইতে একটা কলসীর কানা তুলিয়া লইয়া করুণা-কোমল নিত্যান্দের কপালে সজোড়ে নিক্ষেপ করিল। আর অমনি কানার আঘাতে নিতাইর কপাল দিয়া তীরের মত রক্ত ছুটিয়া পলকে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ রক্তাক্ত করিয়া ফেলিল। নিত্যানন্দ অচল ও অটলভাবে "গৌর গৌর" বলিতে বলিতে—নাচিতে নাচিতে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া মাধাইর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে :—

ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
গৌর বলি নিত্যানন্দ আনন্দে নৃত্য করে॥

কেবল নৃত্য নয় পরম দয়াল নিতাইর কথা শুনুন :—

মারিলি কলসীর কাণা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস মেরেছিস মোর তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥

যিনি জীবের চির সুহৃদ্ ও করুণাময়, সেই করুণার দেবতা ভিন্ন একথা আর কে বলিতে পারে? নিতাই এই যে কথাটি বলিলেন ইহা সরলতা-মাখা ও প্রেমমাখা। জগাই, মাধাইর এই কুকাণ্ড দেখিয়া পূর্ব্বেই দুঃখিত হইয়াছিল। মানুষ যতই পাষণ্ড হউক তাহার হৃদয়ের কোমলবৃত্তি ও ন্যায়পরতা একবারে উন্মূলিত হয় না। জগাই এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিতাই যেই বাহুপ্রসারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "ভাই মাধাই, তুমি আমায় মেরেছ তা বেশ করেছ, আরো মারো, কিন্তু ভাই একবার চাঁদবদনে হরিবল"।

মাধাই হরিনাম শুনিয়া এবং এই ভাব দেখিয়া আরও রুষ্ট হইল, আবার হাতে আর একটা কাণা তুলিয়া লইয়া নিতাইর দিকে লক্ষ্য করিতেই জগাই উহার হাত ধরিয়া ফেলিল। জগাইর হৃদয়ে তখন অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে, জগাই রুষ্টভাবে বলিল, "আরে মাধা তুই কচ্ছিস কি? তোর হৃদয় এতই নিষ্ঠুর! এ বিদেশী সন্ন্যাসী ঠাকুর তোর কি করছে, এ অবধুতকে মারিয়া তোর কি বাহাদুরী হইল—বল্ দেখি।"

মাধাই ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। নিতাইর মস্তক হইতে রক্ত পড়িয়া মুখখানি ভাসিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মুখখানি তখনও

করুণস্নিগ্ধ। সে নয়নে তখনও তেমনি প্রেমময় মধুর ভাব। জগাই বলিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার বড় ক্লেশ হইয়াছে, কিছু মনে করিও না।"

নিতাই বলিলেন, "ইহাতে আমার কোনও কষ্ট হয় নাই, মাধাই আমাকে শতবার মুটকী ছুড়িয়া মারুক, তাতে আমার কোন কষ্ট নাই কিন্তু মাধাই হরিনাম করুক, জীবের দুর্গতি আমি সহিতে পারি না।"

যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছে তখন এই সংবাদ শুনিয়া সহসা শ্রীগৌরাঙ্গ নক্ষত্রবেগে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য সকলেই সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ আদেশ করিয়া আসিলেন, "সকলে এখানে থাকিয়াই কীর্ত্তন কর, আমি আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি একক কীর্ত্তন ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া দেখিলেন, করুণাময় নিতাইর কপাল হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শোণিত-সিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আর নিতাই দুই বাহু তুলিয়া আনন্দে প্রেমভরে হরিনাম করিতেছেন।

তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া নিতাইকে ধরিয়া নিজের বস্ত্রে তাঁহার রক্ত মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন সেই কনককান্তি জ্যোতির্ম্ময় শ্রীগৌর-ভগবানের নয়ন হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে মাধাই আর চাহিতে পারিল না। সে সহসা মস্তক অবনত করিল; মস্তক অবনত করা মাধাইর সমগ্র জীবনের মধ্যে এই প্রথম ঘটনা। সে কখনও

কাহারও নিকট মস্তক অবনত করে নাই। সমুত্তেজিত ফণাধর সর্প সর্পবৈদ্যের হস্তস্থিত দ্রব্যবিশেষ দেখিলে যেমন সহসা মস্তক অবনত করে, শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের পানে চাহিয়াই মাধাইর আজ তেমনি দশা উপস্থিত হইল। সে আরও কতবার শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন করিয়াছে, কিন্তু এবার সে দেখিতে পাইল,—যেন তাঁহার সম্মুখে—সাক্ষাৎ সর্ব্ব-সংহারী মহান্তক মহাকাল।

শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বলিলেন—"তোরা পাপিষ্ঠ, আমি তা শুনিয়াছি, তোদের ন্যায় দুরাচার এ নদীয়ায় নাই, তাহাও আমার জানা আছে। তোরা না করিয়াছিস এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, কিন্তু বিদেশী নিরপরাধ হরিনামপরায়ণ মহাপ্রেমিক সাধুসন্ন্যাসীর পবিত্র দেহে ও যে তোরা আঘাত করিতে পারিস, ইহা আমি জানিতাম না, আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। আজ এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে।" মাধাই দুঃখে লজ্জায় ও ভয়ে মাথা আরও নামাইল।

এই বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর "সুদর্শন সুদর্শন" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুরারিগুপ্ত,—রামদাস। তাঁহার দেহে কখন কখন বীরবর শ্রীহনুমানের আবেশ হইত। তখন আসিয়া মুরারি গর্জ্জিয়া বলিলেন, "প্রভো, সুদর্শন কেন, আমায় আজ্ঞা করুন আমিই ইহাদিগকে এক্ষণেই যমালয়ে পাঠাইতেছি।"

জগাই মাধাই মুরারিগুপ্তের হুঙ্কারে ভীত হইল না, সুদর্শনের আহ্বানেও ভীত হইল না, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের নয়নকোণ হইতে কি-জানি-কেমন এক অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল, তাহাতেই উহারা বিস্মিত-

স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। উহাদের দেহ-বল ও লোক-বল যথেষ্টই ছিল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের সমক্ষে উহারা একেবারেই বিবশ হইয়া পড়িল।

শ্রীগৌরাঙ্গের উগ্রভাব দেখিয়া নিতাই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "আজ এ কি ভাব! এ আত্ম বিস্মরণ কেন? তোমার চরণরেণু-স্পর্শেই কোটী কোটি পাষণ্ডী ত্রাণ পাইবে। এ অস্ত্রের যুগ নয়, সংহারের যুগ নয়। এবার চরণধূলি দিয়া পাপীর হৃদয়-শোধন করিবে, হরিনাম দিয়া পরিত্রাণ করিবে। প্রভো এই দুইটী প্রাণ আমায় ভিক্ষা দাও। আমি ইহাদিগকে লইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইব, আর ইহাদিগকে দেখাইয়া সকলকে বলিব যে এই দুইজন তোমার পতিতপাবন নামের সাক্ষী। ইহাদিগকে সশরীরে নিস্তার কর।" যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রভুর চরণে।
এই দুই পতিত প্রভু দেহ মোরে দানে॥
আর যুগে দৈত্য মারি করিলে উদ্ধার।
সশরীরে এই দুইয়ের করহ নিস্তার॥
করজোড়ে প্রভুরে বোলয়ে নিত্যানন্দ।
না হলো নিস্তার কলি পাষণ্ড দুরন্ত॥

নিতাই যখন নিজের ব্যথা ভুলিয়া গিয়া জগাই মাধাইর উদ্ধারের জন্য যুক্তকরে আর্তস্বরে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে এইরূপ পরিহার প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন রাজপথে বিশাল জনতা;—সকলেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত,—জগাই মাধাই দুই ভাইয়ের অবস্থা দেখিয়া

সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত, তাহাদের এমন ম্লান বিষণ্ণ মুখচ্ছবি নদীয়ার আর কখনও কেহ দেখে নাই,—যেন মহামহা অপরাধী আজ বিচারকের সম্মুখে বিচারার্থ আনীত হইয়াছে।

জগাইর নয়নে জল দেখা দিয়াছে, দেখিতে দেখিতে একবিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। তাহার অবস্থা দেখিয়া নিতাইর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন —ইহাদের কাহারও কোন দোষ নাই, আমার আঘাত অতি সামান্য, আমার কোন ক্লেশবোধ হইতেছে না, কিরূপে হঠাৎ আঘাত লাগিয়াছে, হয়ত আমাকে ভয়দেখানই মাধাইর উদ্দেশ্য ছিল; জগাইর কিন্তু কোনও দোষ নাই, জগাই তখনই মাধাইর হাত ধরিয়া বাধা দিয়াছিল; দৈবে রক্তপাত হইয়াছে, আমি ব্যথা পাই নাই। এই দুইটী জীবকে আমায় ভিক্ষা দাও, তুমি স্থির হও।"

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শুনিলেন, জগাই মাধাইকে বাধা দিয়াছিল তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "জগাই, কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করুন। তুমি নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়া আমায় ক্রয় করিয়া লইলে, তোমার কৃষ্ণভক্তি হউক, তুমি বরপ্রার্থনা কর।" যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥

"জগাই রাখিল"—হেন বচন শুনিয়া।
জগাইরে আলিঙ্গন করিলা সুখী হৈয়া॥
জগাইরে বোলে "কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে॥
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুই মোরে।"
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগো।
আজি হৈতে হউক তোর প্রেম-ভক্তি লাভ॥

এই কথা শুনামাত্রই জগাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মাধাই মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল। মাধাইর দেহ স্থির ও নিস্পন্দ, নয়নে নিমেষ নাই। তাহা দেখিয়া নিত্যানন্দ আরও ব্যাকুল হইয়া বলিলেন:—

সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
কৃপায় সকল জীবের করিবে উদ্ধার॥
যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার।
কেমনে করিবে কলিজীবের উদ্ধার॥

এই কথা বলিতে বলিতে নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গের হাত ধরিয়া বলিলেন "করুণাময়, জগাইকে রক্ষা কর, জগাই অচেতনভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত। উহার বক্ষে একবার ঐ ভুবনপাবন শ্রীচরণখানি অর্পণ কর, তোমার চরণধূলির পরশে উহার ভক্তিলাভ হউক।

নিতাইর অনুরোধে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জগাইর বক্ষে শ্রীচরণ তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—"শ্রীপাদ, তুমিই প্রকৃত পতিতপাবন, তোমায় ভজিয়া জীব প্রেমধন লাভ করিবে, তুমিই কলিজীবের

উদ্ধারকর্ত্তা। আমি কি তোমাদের কথা উপেক্ষা করিতে পারি।” শ্রীগৌরাঙ্গের শীতল চরণ বক্ষে পাইয়া জগাইর হৃদয়ে সহসা যে আনন্দ সঞ্চার হইল, ব্রহ্মানন্দও তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। তাহার মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্বজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, দেহ রোমাঞ্চিত হইল, নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রশান্ত-করুণ প্রেমপূর্ণ মুখখানির দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিল—আবার জগাইর অবস্থা দেখিল—মাধাইর তখন মোহ অন্ধকার দূরে গিয়াছে, সে বুঝিল শ্রীগৌরাঙ্গের চরণধূলায় তাহার দাদা জগাই যে আনন্দলাভ করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মারও দুর্ল্লভ, সে আরও দেখিল ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তিতে এখন আর সে উগ্রতা নাই, মাধাই “হা গৌরাঙ্গ পতিতপাবন, তুমি আমায় রক্ষা কর, আমার ন্যায় পতিতের ত্রাণ করিতে আর কে আছে” বলিয়া তাঁহার চরণতলে গড়াইয়া পড়িল। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

দুই জনে এক ঠাঞি কৈলে প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু হয় দুই ভাগ॥
মোরে অনুগ্রহ কর লও তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নারে আন॥

ইতঃপূর্ব্বেই ভক্তগণ এই সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্তম্ভিতভাবে এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। যখন মাধাই ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গচরণে নিপতিত হইলেন, তখন ভক্তগণ “**জয় গৌরাঙ্গের জয়**” বলিয়া দশদিক মুখরিত

করিয়া তুলিলেন—পলকের মধ্যে যেন নদীয়ার রাজপথে গোলক-মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন—"মাধাই, তুমি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী, আমি তোমার উদ্ধার করিতে পারি না। যথা—

'প্রভু বোলে তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্ত পাড়িলি সে তুঞি ॥

মাধাই, তুমি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী, তিনি যদি তোমায় ক্ষমা করেন, তবেই তোমার পরিত্রাণ, তুমি তাহার পায়ে পড়।"

মাধাই তৎক্ষণাৎ নিতাই চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "দয়াময়, করুণাময়, এ মূঢ় মহাপাপী, মহা অজ্ঞান, কোটিজন্মে নরকে বাস করিয়াও এ পাতকীর নিষ্কৃতি নাই, তোমার ঐ পতিতপাবন **শ্রীচরণই**—আমার ভরসা।"

মাধাইর আর্ত্তি দেখিয়া নিতাই মাধাইকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নিতাইর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি উদ্ধার না করিলে মাধাইর উদ্ধার নাই। এখন তোমার যা অভিরুচি।" নিতাই বলিলেন—এই তো বটে,—তবে আমার প্রাণের কথা শুন :—

কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিনু মাধাইয়ের শুনহ নিশ্চিত ॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর তোমার মাধাই ॥

নিতাইর এই কথায় উপস্থিত শত শত ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে সহসা বিদ্যুৎবেগে কি জানি-কেমন-এক ভাবের প্রবল সঞ্চার হইল, অনেকের নয়ন হইতে দরবিগলিত অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল, অনেকেই মাধাইর ন্যায় নিতাইর চরণ লক্ষ্য করিয়া ভক্তি-ভরে অবনত হইয়া পড়িল। মাধাই ইহা শুনিবামাত্রই নিতাইর শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে লইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভক্তগণ ও জন-সাধারণ দেখিতে পাইলেন—গোলক আর কোথায় অনন্তকোটি **শ্রীবৃন্দাবন-মাধুর্য্য**—ঐ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পদমূল হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে। সঙ্কীর্ত্তনসম্প্রদায় মৃদঙ্গ করতাল লইয়া এতক্ষণ স্তম্ভিতভাবে এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ যখন জগাই মাধাইকে তুলিয়া কোল দিলেন, তখন ভক্তগণ **"জয় গৌর নিত্যানন্দ"** নামের ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন—

পতিতপাবন নামের সাক্ষী তোরা দুইটি ভাই
জগাই—বল্‌রে "গৌরনিতাই"
মাধাই—বল্‌রে "গৌরনিতাই"
নিতাই মা'র খেয়ে দয়া করেন এমন দয়াল দেখি নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নিজে তখন পদ ধরিলেন :—

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, জগাই মাধাই।
কলির জীব উদ্ধারিতে এসেছে দয়াল নিতাই॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এতক্ষণ মাধাইকে কোল দিয়া ধরিয়া রাখিয়া-ছিলেন, তখনও তাঁহার মাথা হইতে দুই এক বিন্দু রক্ত গড়াইয়া

গড়াইয়া মাধাইর মাথায় পড়িতেছিল। তিনি মাধাইকে ছাড়িয়া দিয়া তান ধরিলেন ঃ—

গৌরবিনা কলিকালে জীবের অন্য গতি নাই।
ভক্তসনে নেচে নেচে বল "গৌর" জগাই মাধাই ॥

জগাই মাধাই গ্রহাবিষ্টের ন্যায় উন্মত্ত হইলেন। জগাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে এবং মাধাই শ্রীনিতাইচাঁদকে কান্ধে তুলিয়া লইয়া গাইতে লাগিলেন—"এই আমাদের গৌর নিতাই"—"এই আমাদের গৌর নিতাই"। মৃদঙ্গ করতালের তুমুলরবে,—ভক্তগণের মুখে উচ্চারিত গৌর নিত্যানন্দ নামের হুহুঙ্কারে,—এবং জগাই মাধাইর ভাবোচ্ছ্বাসময় নৃত্যে,—নদীয়ার রাজপথে বৈকুণ্ঠপ্রভাব প্রকটিত হইল। সমগ্র নদীয়ায় তারের সংবাদের ন্যায় এই সংবাদ প্রকাশ পাইল, যে যেখানে এই সংবাদ শুনিল, সে সেখান হইতেই রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রসরতর রাজপথ বিশাল জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুদূর হইতেও দর্শকগণ জগাই ও মাধাইর স্কন্ধে দুইটী **কনকবিগ্রহ** দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিল। তাঁহারা আরও বহুবার শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে নিত্যানন্দেরও দর্শন পাইয়াছেন,—কিন্তু এমন জ্যোতি ও এমন প্রভাব আর কখনও দেখেন নাই। আবালবৃদ্ধ নরনারী করজোড়ে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বহু আয়াসে দুই ভাইর স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া দুই জনকে কোল দিলেন। উহারা সমগ্র ভক্তমণ্ডলীর চরণধূলি মাথায় লইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,—"স্থির হও, ঘরে যাও হরিনাম

করিও।” শ্রীগৌরনিতাই এই বলিয়া ভবনাভিমুখে গমন করিলেন ও ভক্তগণ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, পথের ভির ভাঙ্গিতে লাগিল, অনেক লোক শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অনেকেই জগাই মাধাইকে দেখিবার জন্য পথে দাড়াইল। জগাই মাধাই যতক্ষণ শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহাদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা আড়াল হইলে, দুই ভ্রাতা বিবশ হইয়া রাজপথে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহাদিগকে গৃহে লইবার জন্য লোকজন আসিল, কিন্তু উঁহারা আর তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মাধাই “হায় কি করিলাম, হায় আমার গতি কি হইবে” কেবল এই বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন, জগাইও পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর সময়ে সময়ে মাধাইকে প্রবোধ দিয়া বলিতে লাগিলেন—“ভাথ্‌, মাধা, দুই ঠাকুর বড় দয়াল। আর আমাদের ভাবনা কি? সকল ছেড়ে চল চাই, সেই শ্রীচরণের আশ্রয় লইগে। যথা পদে—

চল্‌রে চল্‌রে মাধা চলরে ত্বরায়।
লুটাইয়া পড়ি গিয়া দুই ভাইয়ের পায়॥
মাইর খেয়ে দয়া করে ওই দয়াল নিতাই।
এমন দয়ালদাতা আরতো কোথা দেখি নাই॥
কি করিবে ধনে জনে বিষয় বৈভবে।
মোদের পাপের ভাগী কেহত না হবে॥

গৌরাঙ্গ নিতাই ভজি পূর্ণ হবে কাম।
কাঙ্গালের ঠাকুর দোহে কহে নন্দরাম॥

এই পরামর্শ করিয়া দুই ভাই আর গৃহপানে ফিরিলেন না, দীনাতিদীনবেশে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া জগাই আর্ত্তস্বরে—"পতিতপাবন দয়াময়, পতিতপাবন দয়াময়" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাধাই পূর্ব্বেই দরজার সম্মুখে বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মুরারিগুপ্তকে পাঠাইলেন, মুরারির অসাধারণ বল। তিনি দুই ভাইকে তুলিয়া আনিলেন। উহারা অচেতন ভাবে দণ্ডবৎ হইল আঙ্গিয়া পড়িয়া রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নিত্যানন্দপ্রভুকে বলিলেন,—"শ্রীপাদ, ইহাদিগকে গঙ্গাতটে লইয়া গিয়া কর্ণে শ্রীনামমন্ত্র প্রদান করুন।" জগাই মাধাই তখন মূর্চ্ছিতপ্রায়। এই অবস্থায় ভক্তগণ উহাদিগকে ধরাধরি করিয়া গঙ্গাতটে লইয়া চলিলেন, কীর্ত্তন সম্প্রদায়সহ দয়াময় শ্রীগৌর নিত্যানন্দ উহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আবার রাজপথে লোকের বিপুল জনতা হইল। ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দস্যু জগাই মাধাই শচীনন্দনের ফাঁদে ধরা পড়িয়াছে, ধরা পড়িয়া মেষশাবক অপেক্ষাও নিরীহ হইয়াছে—এ দৃশ্য দেখিবার জন্য সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা গঙ্গাঘাটে উপনীত হইল। জগাই মাধাই তখনও অচেতন। গঙ্গার শীতল বালুকায় ভক্তগণ জগাই মাধাইকে শোয়াইয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন,—দর্শকদের মধ্যে সুরসিক লোকেরা বলিল, জগাই মাধাইর প্রাণ থাকিতেই

অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া হইতেছে ; ভক্ত ও বুদ্ধিমানেরা বলিলেন—ঠিক কথা উহাদের পাপজীবনের এই চূড়ান্ত অবসান হইল।

এদিকে ভক্তগণ অচেতন জগাই মাধাইকে অন্তর্জলি করার ন্যায় গঙ্গাগর্ভে লইয়া গেলেন। জগাই মাধাই গঙ্গাতীরে বাস করিয়াও গঙ্গায় স্নান করেন নাই, আজ গঙ্গার পবিত্র শীতল সলিলপরশে জগাই মাধাইর পাপদগ্ধহৃদয় প্রকৃতপক্ষেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উহাদিগকে তীরে আনা হইল। আবার সঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ করতালের তুমুলরবে ও হরিসঙ্কীর্ত্তনের সুধামধুর ধ্বনির মধ্যে গৌর নিত্যানন্দ জগাই মাধাইকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ইঙ্গিতে কীর্ত্তন স্থগিত হইল। সহস্র সহস্র লোক দাঁড়াইয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে জাহ্নবী-সৈকতে বৈকুণ্ঠবৈভবের উদয় হইল। সমুন্নত কলেবর কনককান্তি শ্রীগৌরসুন্দর সুদীর্ঘ শ্রীকর প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "ওহে জগাই, ওহে মাধাই—তোমাদের জন্মজন্মসঞ্চিত পাপকালিমার দারুণ ভার লইবার জন্য আমি হাত বাড়াইলাম,—আমাকে পাপ দিয়া তোমরা নিষ্পাপ হও, নির্ব্বিঘ্নে হরিনাম গ্রহণ কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গের কথায় মাধাই কাঁদিয়া বলিলেন,—দয়াময় পাপ করিয়াছি,—মহাপাপ করিয়াছি, কোটি কোটি জন্ম ভরিয়া তাহার জন্য যাতনা সহিব, কিন্তু তোমার শ্রীকরে ঐ পাপ দিতে পারিব না। শত কোটি ব্রহ্মা যাঁহার শ্রীকরে দেবদুর্ল্লভ সুধামধুর দ্রব্য তুলিয়া দিতে কত তপস্যা করেন, সে হাতে পাপ তুলিয়া দিব—তাহা কখনই পারিব না।"

নিতাই বলিলেন—মাধাই, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, শ্রীভগবন্ ভিন্ন পাপীর ভার আর কে লইতে পারে? প্রাণ ভরিয়া বল—

"জয় পতিত উদ্ধারণ গৌরহরি" জগাই তুমিও বল—

"জয় পতিত উদ্ধারণ গৌরহরি" এই বলিয়া প্রভুর আজ্ঞানুসারে হস্ত প্রসারণ কর।

তখন জগাই মাধাই অশ্রুপূর্ণনয়নে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "জয় পতিত উদ্ধারণ গৌরহরি"—নিতাই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈস্বরে সুমধুরকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া বলিলেন—"জয় পতিত উদ্ধারণ গৌরহরি"। পতিতপাবনী জাহ্নবীর কুলে কুলে প্রতিধ্বনি হইল,—

"জয় পতিত উদ্ধারণ গৌরহরি"

জগাই মাধাই তখন শ্রীনিত্যানন্দের শিক্ষায় শ্রীগৌরাঙ্গের করকমলে তুলসীপত্র অর্পণ করিলেন। করুণাবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বলিলেন," ওরে জগাই মাধাই এই আমি তোদের জন্ম-জন্ম-সঞ্চিত পাপের কালিমা গ্রহণ করিলাম, তোরা আজ হইতে নির্ম্মল হইলি, প্রেমময়ের প্রেমলাভের অধিকারী হইলি। দয়াময় নিতাইর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ কর্। তিনিই তোদের ভবপারের কাণ্ডারী।"

এই সময়ে শ্রীগৌর-দেহ পলকের তরে কৃষ্ণবর্ণ দেখা গেল। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

দুই জনের শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হলো কালির আকার॥

শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় জগাই মাধাই অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদনে পাষাণও দ্রবীভূত হইল; দর্শকগণের আর কথা কি? ঠাকুর নরহরি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়া একটি পদ লিখিয়া গিয়াছেন উহা এই :—

আজি কি আনন্দ নদীয়া নগরে জগাই মাধাই দোহে দেখিবারে
ধায় চারিদিকে কি নারী পুরুষ পরস্পর কহে কত না কথা।
কেহ কহে অতি বিরলেতে রৈয়া ঐ দেখ দেখ দুঁহপানে চাঞা
সুরজের সম তেজ এবে ভেল সে পাপ শরীর গেল বা কোথা॥
কেহ কহে আহা মরি মরি ভাবে গরগর বৈসে বেরি বেরি
কাঁদে, উঠে, ছুটে, আখি বারিধারা নিবারিতে নারে, না ধরে ধৃতি।
কেহ কহে হেন দেখি নিরুপম পুলকিত তনু কাঁপে ঘন ঘন
ধূলায় ধূসর ধরণীতে পড়ি গড়িযায় কিছু নাহিক স্মৃতি॥
কেহ কহে কিবা গৌরা মুখশশী, পানে চাহে জানি কত সুখে ভাসি
হাসি সুধাপানে উনমত হৈঞা লোটাইয়া পড়ে চরণতলে।
কেহ কহে দেখ নিতাই চাঁদেরে চাহি হিয়া মাঝে কত খেদ করে
ভুখানি চরণ পরশিয়া করে, করে অভিষেক আঁখির জলে।
কেহ কহে দেখ অদ্বৈত তাপসী গদাধর শ্রীবাসাদি পাশে বসি
অতুল উলসে ফুলি ফুলি ফিরে লইয়া সবার চরণধূলি।
কেহ কহে দুঁহ কাতর অন্তরে এক ভিতে রহি দন্তে তৃণ ধরে
নরহরি পহু পরিকরসহ "কর কৃপা" কহে দু বাহু তুলি॥

করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ জগাই মাধাইর কর্ণে পতিতপাবন ও মহা প্রেমদ গৌরমন্ত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্র-প্রদান করামাত্রই জগাই

মাধাই নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে গোলকমাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিল। স্বেদপুলক, অশ্রুকম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবাবেশে দুই ভাই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আজ পতিতপাবনা জাহ্নবী-তটে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পতিতপাবন নামের বিজয় নিশান উড্ডীন হইল।

কার সাধ্য বুঝিতে চৈতন্য অভিমত।
দুই দস্যু করে—দুই মহাভাগবত॥

গঙ্গাতট হইতে জগাইমাধাইসহ শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গভবনে প্রত্যাগমন করিলেন. প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে শ্রীঅদ্বৈতাদিসহ প্রভু আবার কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নদীয়ার যে দস্যুরাজের ভয়ে শচীমাও সময়ে সময়ে গঙ্গাঘাটে যাইতে ভয় পাইতেন, সেই দস্যুরাজ আজ দীনহীন কাঙ্গালের বেশে নয়নজলে দেহ ভিজাইয়া কীর্ত্তনে গড়াগড়ি দিতেছেন, শচীমা ও প্রিয়াজী এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

জগাই মাধাইর নিকটে যে হরিনাম বিষবৎ বোধ হইত, এখন সেই হরিনাম-কীর্ত্তন তাঁহাদের নিকট অমৃতের ন্যায় মধুর হইল। উহারা কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্ত্তন ভঙ্গ হইল। তখন আবার উহাদের প্রাণে অনুতাপে জাগিয়া উঠিল। উহারা হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দয়াল নিতাই কত প্রবোধ দিলেন, কিন্তু উহাদের মন প্রবোধ মানিল না। মাধাই নিতাইর পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—ঠাকুর কোটি জন্মেও আমার

এ পাপের উদ্ধার নাই, আমি অজ্ঞানাবস্থায় আপনার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছি, আপনি পরমপিতা, আপনার হৃদয়ে শত কোটি পিতার স্নেহ বিদ্যমান। আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন, ইহা আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু সহস্র সহস্র নরনারীর নিকট আমরা জ্ঞাতভাবে ও অজ্ঞাতভাবে অপরাধী। সে পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? আমার মনে হয়, আমরা লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট অপরাধী। সেই সকল লোকের চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়নজলে তাঁহাদের চরণ ধোয়াইয়া ক্ষমা চাহিতে পারিলে হয়ত মনে কিছু শান্তি হইতে পারে।

নিতাই বলিলেন, "মাধাই, দয়াময় তোমাদের পাপের ভার লইয়া স্পষ্টতঃই তো বলিয়াছেন :—

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস সব দায় মোর॥

ইহার পরে আর কথা কি? ইহাতেও যদি তোমাদের মনে শান্তি না হইয়া থাকে, তবে গঙ্গাতটে বসিয়া হরিনাম করিবে, আর যাহাকে দেখিতে পাইবে, তাহারই চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে।"

নিতাইর উপদেশে জগাই মাধাই চিরদিনের তরে সম্পদ্ বৈভব ত্যাগ করিয়া কৌপীন পড়িয়া গঙ্গাতট আশ্রয় করিলেন। পরিধানে ছিন্ন বহির্বাস,—প্রায়শঃই উপবাস,—বর্ষার জলধরার ন্যায় অবিরাম নয়নধারা,—মুখে অবিরাম হরিনাম এই ভাবে রাজঘাটের এক কোণে বসিয়া দুই ভাই হরিনাম জপে মগ্ন। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ যখন যে কেহ ঘাটে আসিত, জগাই মাধাই তাহাদের চরণে পড়িয়া

অশ্রুজলে তাহাদের চরণ ধোয়াইয়া কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতেন, “আমরা জানিয়া কি না জানিয়া আপনার চরণে কত অপরাধ করিয়াছি,—আপনাকে কত দুঃখ দিয়াছি, দয়া করিয়া অপরাধীকে ক্ষমা করুন, আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করিলে শ্রীভগবান্ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।”

চণ্ডাল ব্রাহ্মণ বালক বৃদ্ধ নরনারী সকলের চরণে পড়িয়া উহারা এইরূপ ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেন, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাদের চরণ ভিজাইতেন। জগাই মাধাইর এই দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইতেন এবং হরিনামের পবিত্র উচ্ছাসে আপন আপন হৃদয় নির্ম্মল ও ভক্তিরসে পূর্ণ করিতেন।

এইরূপে নদীয়ায় “মাধাইর ঘাট” মহাতীর্থ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ হইল এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের **“পতিতপাবন”** নামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল।

(২)

এইরূপে পাতকি-নিস্তারের মহামন্ত্র—শ্রীকীর্ত্তন সর্ব্বত্রই ছাইয়া পড়িল। কেবল অল্পসংখ্যক বিদ্বেষী ভিন্ন ইহাতে সকলেরই আনন্দ। এই সংসারের কার্য্যে বিদ্বেষীরও প্রয়োজন আছে। বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ ভিন্ন তদ্বিপরীত শক্তির বিকাশ ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। পাপ না থাকিলে পুণ্যের বল বুঝা যাইত না, অত্যাচার না থাকিলে ক্ষমার ভাব অস্ফুট থাকিত, অভক্ত বিদ্বেষী-

দের বিদ্বেষ ও অনিষ্টসাধন ইচ্ছাতেই ভক্তহৃদয়ের মহিমা ফুটিয়া উঠে। শ্রীকীর্ত্তন সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটিল।

এই সময়ে সমগ্র নদীয়ায় সঙ্কীর্ত্তনের মহাতরঙ্গ উঠিয়াছিল। এমন বাড়ী খুব অল্প ছিল, যেখানে অন্ততঃ পাঁচ সাতজন একত্র হইয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি দ্বারা কীর্ত্তন না করিত। এই ব্যাপারে দুই শ্রেণীর বিদ্বেষীর সৃষ্টি হইল। একশ্রেণীর বিদ্বেষী—পাষণ্ডী হিন্দু, অপর শ্রেণীর বিদ্বেষী—মুসলমান, কাজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ। তথাপি লক্ষ লক্ষ পতিত পাষণ্ডী শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় হরিনামে পরিত্রাণ পাইয়াছিল।

হরিনামকীর্ত্তন,—পাষণ্ডী হিন্দু, ও বিধর্ম্মী অথচ ধর্ম্মজ্ঞানহীন মুসলমানদের অসহ্য হইত। ইহারা কাজীর নিকট প্রায়শঃই নালিশ করিত। একদিন কাজী অগত্যা দলবল সহ অনুসন্ধানে বাহির হইয়া দেখিলেন—সর্ব্বত্রই সঙ্কীর্ত্তন—সে কীর্ত্তনে সকলেই উন্মত্ত। তখনকার মুসলমানেরা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার ভালবাসিত না, কাজীর মনেও সে সংস্কার ছিল। কাজী পথের ধারে দুই চারি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উহাদের মৃদঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া দিয়া উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন, উৎপীড়িত লোকেরা ঘর ছাড়িয়া পলাইল। অত্যাচারও কম নহে, কাজীর লোকেরা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল, সম্মুখে যাহাকে পাইল, তাহাকেই প্রহার করিল, এমন কি উহাদের ঘরে দুয়ারেও অনাচার করিতে লাগিল। অতঃপরে কাজী ফিরিয়া যাইবার সময়ে ঢেটরা দিয়া বলিয়া গেলেন, "পূনর্ব্বার যদি কেহ কীর্ত্তন করে, তবে তাহার জাতি মারা হইবে এবং বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

তখন মুসলমানের রাজ্য,—তাহাদেরই একাধিপত্য। বিচার ছিল না বলিলেই হয়। এখনও লোকে কথায় বলে—"কাজীর বিচার" বিশেষতঃ কাজীর বহু সৈন্যবল। সুতরাং নগরবাসীরা ইহাতে অত্যন্ত ভয় পাইল। ভক্তগণের দুঃখের সীমা রহিল না। নিরীহ ভক্তগণ, উপায় না দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে দুঃখের কথা জানাইলেন। তিনি ভরসা দিয়া বলিলেন—"কাজী কি করিতে পারে? তোমাদের ভয় কি? তোমরা স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করিবে।"

কিন্তু কাজীর লোকদের অত্যাচার কমিল না। বিশ্বম্ভর পুনর্ব্বার কাজীর অত্যাচারের কথা শুনিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—"এবার কাজীকে শিক্ষা দিব—তাহার প্রভুত্বের বল চূর্ণ করিব—হরিনামের বন্যায় নবদ্বীপ ভাসাইব—কাজীর বাড়ীতে কাজীর সমক্ষে কীর্ত্তন করিব, কাজীকেও কীর্ত্তনে নাচাইব। ভক্তগণ অদ্য সন্ধ্যায় সকলে মহাসঙ্কীর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হও। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, আপনি নগরে নগরে ঘোষণা করুন, যে সন্ধ্যার সময়ে মৃদঙ্গাদিসহ সকলেই কীর্ত্তনের জন্য যেন প্রস্তুত থাকে, প্রত্যেকের হাতে একটী একটী মশাল থাকা চাই। আমাদের কীর্ত্তনের মৃদঙ্গরব শুনিলে, রাজপথে ভক্তগণের হরিধ্বনি শুনিলে পুরুষমাত্রেই যেন ঘরে না থাকে, সকলেই যেন কীর্ত্তনে যোগ দেয়।" সর্ব্বত্রই এই আদেশ প্রচারিত হইল।

এই সময়ে যদিও কাজী সৈন্যবলসহ নদীয়ার অধিপতি ছিলেন—কিন্তু জনসাধারণের প্রকৃত অধিপতি ছিলেন—শ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার আদেশে লক্ষ লক্ষ লোক গৃহসুখ ত্যাগ করিয়া বিপদের

সম্মুখে অগ্রসর হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না, মৃত্যুর উদ্যত বজ্রকেও ভয় করিত না।

শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ মুহূর্ত্তমধ্যেই নগরে নগরে প্রচারিত হইল। রমণীগণ মঙ্গলোৎসবের জন্য প্রস্তুত হইলেন, অম্রপল্লব সজ্জিত মঙ্গলঘট দ্বারে দ্বারে সন্নিবিষ্ট হইল, দ্বারে দ্বারে কদলীবৃক্ষ রোপণ করা হইল, স্ত্রীলোকেরা কীর্ত্তনে ছড়াইয়া দিবার জন্য খৈ কড়ি বাতাসা সংগ্রহ করিলেন। সমগ্র সহর মঙ্গলচিহ্নে ও আনন্দ উৎসবে মাতিয়া উঠিল।

কাজী-যুদ্ধের অভিযান দেখুন। এ যুদ্ধে রক্তপাতের আয়োজন নাই, অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই—অস্ত্র কেবল হরিনাম,—আর চারি দিকেই কেবল আনন্দময় হরিনামের মহারোল। ভুবনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গ মদনমোহনরূপে সজ্জিত হইলেন—সুপ্রসন্ন স্বর্ণোজ্জ্বল কপালে তিলক, তন্মধ্যে ফাগুবিন্দু, নয়নে কজ্জল, মাথায় চূড়া, চূড়া বেড়িয়া মালতী মালা, পরিধান পট্টবসন, গলদেশে আপাদ-বিলম্বি মালা, ও সূক্ষ্ম উত্তরীয় বস্ত্র, পায়ে নূপুর, হস্তে বলয়াদি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে থাকিয়া এ বেশ দেখিয়া মুচকী মুচকী হাসিতেছিলেন, তাঁহার মনে হইতেছিল,—"নাসিকায় একটি গজমতি নোলক পড়াইয়া দিলে মুখখানিতে ভাল মানায়।" গদাধরের হৃদয়ে এই বাসনা প্রতিধ্বনিত হইল, তিনি নাসিকায় নোলক পড়াইয়া দিলেন। ভক্তগণও সাজসজ্জা করিলেন।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দাদি সহস্র সহস্র ভক্ত লইয়া রাজপথে বাহির হইলেন। সহস্র সহস্র মৃদঙ্গ কর-

তালের তুমুলরবে ও গগনভেদী সহস্র কণ্ঠে উচ্চ হরিনামের মেঘ-গম্ভীর ধ্বনিতে সঙ্কীর্ত্তন মহাসমুদ্রের আকার ধারণ করিল—সেই রূপ তরঙ্গ, আর সেইরূপ গর্জ্জন। নদীয়ার রাজপথ যুগপৎ সহস্র সহস্র মশালের আলোকে এমন উজ্জ্বল ও উষ্ণ হইয়া উঠিল যে শত রবির কিরণও যেন উহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল।

এই যে মহাকীর্ত্তন সম্প্রদায় আজ সমবেত হইলেন, ইহাদের উদ্দেশ্য—কাজী-দমন। কাজী-যুদ্ধের যুদ্ধার্থী ভক্তগণ ফুলের মালা গলায় দিয়া যুদ্ধার্থে বাহির হইলেন, তাঁহাদের অস্ত্র,—কেবল হরিনাম। কাজীর অস্ত্র—ভীষণ শেল। ফুলের মালার শক্তি বেশী,—কি শেলের শক্তি বেশী,—রসরাজ শ্রীগৌরসুন্দর এই যুদ্ধে তাহার মীমাংসা করিবেন। প্রেমময়ের এই প্রেমলীলায় সকলই অদ্ভুত।

যুদ্ধার্থী ভক্তগণের হৃদয় প্রেমানন্দে পূর্ণ। তাঁহারা যেন আনন্দ-মদিরায় উন্মত্ত। নটবর নিমাইর রূপ দেখিয়া নরনারীমাত্রেই বিমুগ্ধ। পথের দুই ধারে ও ছাদে ছাদে নারীগণ দাড়াইয়া উলু-ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিনে এবং খৈ বাতাসা কড়ি ছড়াইতে লাগিলেন। কেহ হাতজুড়িয়া কেহবা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় হরিনামকীর্ত্তন রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্তগণ প্রেমানন্দে বিহ্বল। তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন, কি উদ্দেশ্যে যাইতেছেন, সে স্মৃতি তাঁহাদের নাই।

কিন্তু প্রভু নিমাই যখন কাজীপাড়ার অভিমুখে পদার্পণ করিলেন, তখন একটী সাড়া পড়িল—আজ অনর্থ ঘটিবে। ভক্তগণের মধ্যেও ইহার প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিল। সকলেই

যেন আনন্দ ভুলিয়া কাজীর কথা মনে করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন। "মার কাজীকে, মার কাজীকে" বলিয়া লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ভীষণ চীৎকার হইতে লাগিল। ভক্তগণের দেহে তখন অসীম বলের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু নিমাই ও তাঁহার পার্ষদগণ নামানন্দে বিভোর।

এদিকে কাজী সমগ্র সহরে অসঙ্খ্য আলোক দেখিয়া এবং হরিনামের কল্লোলধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। নীলাম্বর চক্র-বর্ত্তীর দৌহিত্র নিমাই পণ্ডিতের এতদূর সাহস যে হরিনাম সম্প্রদায় সাজাইয়া তাঁহার প্রাসাদের অভিমুখে আসিবেন,—এ ধারণা কখনও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। নীলাম্বর তাঁহার পরিচিত,—উভয়ে যথেষ্ট আলাপ আছে। এ অবস্থায় নিমাইর শাসন করাও তাঁহার ইচ্ছা নয়। কিন্তু নিমাইর আস্পর্দ্ধা দেখিয়া কাজীর অসহ্য হইল।

কাজী সৈন্য পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, "নিমাইকে বলিও কীর্ত্তন বন্ধ করা হউক, নচেৎ অকল্যাণ হইবে।"

সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহারা আত্ম-হারা হইল, তাহারা যে কাজীর প্রেরিত, এ কথাই তাহাদের মনে রহিল না। পতঙ্গ যেমন অগ্নি দেখিলে তাহাতে গিয়া আত্মসমর্পণ করে, কাজীর সৈন্যগণও সেইরূপ সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

এদিকে কীর্ত্তনসম্প্রদায় কাজীর বাড়ীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন, কাজীর সৈন্যগণের মধ্যে কেহ বা ভয়ে বিহ্বল হইয়া-ছিল, কেহ বা আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিল, সুতরাং

নির্ব্বিঘ্নে ও অবাধভাবে কীর্ত্তন-দল কাজীর বাড়ী অধিকার করিয়া সর্ব্বত্রই মহাতাণ্ডবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাহাদিগের বাহ্যজ্ঞান ছিল, তাহারা কাজীর অনাচার ও সঙ্কীর্ত্তনের ব্যাপার কথা স্মরণ করিয়া কাজীর গৃহাদি ভগ্ন করিতে লাগিল। কাজীর সাধের ফুলের বাগান মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হইয়া গেল। বাগানের গাছ ভাঙ্গিয়া বাগানগুলিকে বিধ্বস্ত করা হইল। অত্যন্ত বিপদ,—এমন কি আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া কাজীসাহেব ভয়ে অন্দর মহলে লুকাইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে কীর্ত্তন থামিল, ভক্তগণ স্থির হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কাজীর নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে সাহস দিয়া বাহিরে আনিলেন। কাজীসাহেব মহাঅপরাধীর ন্যায় অবনত মস্তকে করযোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ সমীপে উপনীত হইলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের পদতলে অপরাধীর ন্যায় পতিত হইয়া বলিলেন, "দয়াময়, আমি বুঝিয়াছি তুমি স্বয়ং ভগবান্। সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি। ইহার উপরে তোমার ভক্তগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কেবল এই ভরসা যে তুমি **পতিতপাবন**। জগাই মাধাইকে তুমি যে করুণায় উদ্ধার করিয়াছ, সেই করুণায় আমাকেও উদ্ধার কর। তোমার দাদামহাশয় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে আমি কাকা বলিয়া ভক্তি করি, সেই সম্পর্কে আমি তোমার মামা। বাবা, এ পতিত পাষণ্ডী মামুকে উদ্ধার কর। কীর্ত্তনে বাধা দেওয়া অবধি মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া আমি শঙ্কিত হইয়া থাকি। আজও তুমি

যখন কীর্ত্তন লইয়া আসিতে ছিলে, তখন ভয়ানক কতক গুলি অমানুষী মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছি, তুমি স্বয়ং ভগবান ও পতিতপাবন। আমার উদ্ধার করাই তোমার এখানে পদার্পণ করার উদ্দেশ্য। দয়াময় লোকে যাহাকে হরি কৃষ্ণ নারায়ণ বলে,—তাই তুমি। হে নারায়ণ হে কৃষ্ণ, তুমি আমায় ত্রাণ কর।” এই বলিয়া কাজী কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ তলে লুটাইয়া পড়িলেন।

দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, “কাজী আমি তোমায় রক্ষা করিলাম—এখন একবার কীর্ত্তনে নৃত্য কর, আর কখনও কীর্ত্তনে বাধা দিও না।”

কাজী করযোড় করিয়া “বলিলেন, আমিতো কখনও বাধা দিব না, আমার উত্তরাধিকারীরাও হরিনাম কীর্ত্তনে বাধা দিতে পারিবে না অপর পক্ষে আমার বংশীয়গণ কীর্ত্তন সম্প্রদায় দেখিলেই প্রণত হইবে।” কাজীবংশে এ নিয়ম পরবর্ত্তীকালে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

এইরূপে সহস্র সহস্র পাষণ্ডীকে দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহাপাতকী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোকেরা শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ গ্রহণ করিয়া দিব্য কলেবর লাভ করিয়াছে। কত অন্ধ চক্ষু পাইয়াছে, কত পঙ্গু গমনশক্তি লাভ করিয়া শ্রীগৌর-কীর্ত্তন রসে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছে। এই অবতারে হিন্দু মুসলমান কেহই বঞ্চিত হয় নাই, তাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর **মহাপতিতপাবন** বলিয়া জীবমাত্রেরই পরম উপাস্য।

নিমাই সন্ন্যাস

শ্রীগৌরসুন্দর, মহাপ্রকাশ-লীলায় ভক্তগণের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিলেন, তিনি যে মহামহাঐশ্বর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্, ভক্তগণ ও জীবগগণ তাহা বুঝিলেন। তিনি স্বীয় কৃপায় মহাপাপীদের উদ্ধার করিলেন। এই সকল লীলার পরে কিয়দ্দিন তিনি একবারে নীরব হইলেন,—প্রায়শই নির্জ্জনে গৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া থাকিতেন, অন্তরঙ্গ ভিন্ন বহিরঙ্গ লোকগণের সহিত তাঁহার দেখা হইত না। এই সময়ে তিনি শ্রীবৃন্দাবনের ভাবরস আস্বাদন করিতেন। গোপীভাবে তাঁহার চিত্ত পরিপূরিত থাকিত, ভক্তগণের সঙ্গেও তিনি গোপীভাবে বিহ্বল হইয়া আলাপ করিতেন। ভক্তগণ তখন বুঁঝিতে পারিতেন—যে তিনি একবারেই রাধাভাব বিভাবিত। রাধিকার ন্যায় কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলতা, রাধিকার ন্যায় প্রলাপ সর্ব্বদাই তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। অর্দ্ধবাহ্য দশায় তিনি "গোপী গোপী" বলিয়া জপ করিতেন। বহিরঙ্গগণ ইহার অর্থ বুঝিত না। তাঁহারা বলিত—সকলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া জপ করে, কেহ বা রাধাকৃষ্ণ নামও উচ্চারণ করে, কিন্তু "গোপী গোপী" জপের আবার কোন্ শাস্ত্র আছে ?

এক দিন কোন পড়ুয়া এইরূপ বিতণ্ডা করিতে উদ্যত হইল। নিমাই তখন ভাবে বিহ্বল। এই অবস্থায় তিনি এক খানি যষ্ঠী লইয়া পড়ুয়াকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। অবোধ পাঠার্থী

ভবাবিষ্ট ভগবানের ভাব বুঝিল না। মহাপ্রকাশের সময়ে তাঁহার যে ভগবত্তা-দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, অজ্ঞ পাঠার্থী তাহা জানিয়াও শ্রীগৌর যে কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারিল না। সে তাহার সমবুদ্ধির ও সমশ্রেণীর লোকের নিকটে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের তাড়নার কথা বলিল। তাহারা বলিল "আমরা ব্রাহ্মণ উনিও ব্রাহ্মণ, উনি প্রহার করিবার কে? উনি যদি প্রহার করিতে পারেন আমরা তাহা সহিব কেন?"

একদিন এই কথা নিমাইর কর্ণগোচর হইল। তিনি সেদিন আর কাহাকে কিছু বলিলেন না। কিন্তু এই দিন হইতে তাঁহার গুরুতর ভাবান্তর দেখা দিল। নিকটবর্ত্তী ভক্তগণও অনেক সময় গম্ভীর গৌরাঙ্গ-চরিত্রের ভাব-রহস্য বুঝিয়া ঠিক করিতে পারিতেন না। ইহার পরে এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত আলাপ করিতে করিতে অপ্রাসঙ্গিক ও উদাসীন ভাবে বলিলেন ঃ—

করিলুঁ পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥

এই বলিয়া অট্ট অট্ট হাসিতে সহসা সেই স্থল মুখরিত করিয়া তুলিলেন। অতি অন্তরঙ্গ প্রভু নিত্যানন্দ ব্যতীত এই বাক্যের অর্থ কেহই বুঝিতে পারিলেন না। সকলেই ভীত হইলেন। নিতাই বুঝিলেন এইবার নিমাইর সংসার-লীলা ফুরাইল, নিমাইর এই চাঁচর চুল অন্তর্ধান হইবে, নিমাই গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। নিতাইর হৃদয় বিষাদে দমিয়া গেল, তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের কালিমা ফুটিয়া উঠিল।

কিছুকাল পরে নিমাই নিতাইকে সঙ্গে করিয়া এক নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া বলিলেন,—শ্রীপাদ, আমার প্রাণের কথা তোমার নিকট বলি :—

ভালসে আইনু মুঞি জগৎ তারিতে।
তরণ নহিল আইলাম সংহারিতে॥
আমারে দেখিয়া কোথা পাইবে বন্ধ-নাশ।
একগুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি পাশ॥

আমার এই মহাকারুণ্যপূর্ণ অবতারেও যখন লোকের দ্বেষ হয়, আমার প্রভাব-প্রভুত্বও যখন লোকবিশেষের অসহনীয়,—তখন এভাব রাখার আর প্রয়োজন নাই। আমি শিখা সূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব, লোকের ঘরে ঘরে দীনাতিদীনবেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব। সন্ন্যাসীকে সকলেই সম্মান করে। এইরূপে লোকে আমার সম্মান করিয়া উদ্ধার পাইবে।”

শ্রীপাদ, ইহাতে তুমি মনে দুঃখ করিও না। তুমি দয়া করিয়া আমায় সন্ন্যাসের অনুমতি দাও। আমি তোমার আজ্ঞাধীন। যদি জগৎ উদ্ধার করিতে চাও, তবে ইহাতে বাধা দিও না।

জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবা আমারে॥

অবতারের কারণ তো তোমার অজ্ঞাত নহে, ইহাতে দুঃখ করিও না। এই অবতারে পতিত পাষণ্ডীর উদ্ধার করিতে হইবে।”

নিমাইর কথা শুনিয়া নিতাইর হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাঁহার নয়ন হইতে সমুজ্জল মুক্তার ন্যায় কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া

পড়িল। নিতাই গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন—স্বর্ণগৌর, তুমি সংসার ছাড়িবে, আর তাহার জন্য আমার নিকট অনুমতি চাহিতেছ। শচী মায়ের অঞ্চলের ধন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ, তুমি সন্ন্যাস লইয়া নদীয়া শূন্য করিবে, শচীমার স্নেহের হৃদয় চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দিবে, বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে শোকের অনল জ্বালিয়া দিয়া তাঁহাকে চিরদুখিনী করিবে, ভক্তগণকে অনাথ করিবে—আর আমি তাহাতে অনুমতি দিব,—এও কি সম্ভব? ভক্তগণের যে কিছু আনন্দ কেবল তোমাকে লইয়া। তুমি চলিয়া গেলে নবদ্বীপ আঁধার হইবে, আমার নিজের কথা ধরি না, আমি অবধূত, যেখানে তুমি সেই খানেই আমি। বৃদ্ধা মায়ের কি হইবে, বধূমাতা প্রিয়াজীর দশা কি হইবে,—ইহাই আমার নিদারুণ ভাবনা।

নিমাই। সে উপায় অবশ্যই হইবে। জীবের জন্যই আমি সন্ন্যাসী হইব। আমি সন্ন্যাসী না হইলে জীবের হৃদয় কোমল হইবে না। শ্রীপাদ, তুমি এ বিষয়ে বাধা দিও না।

নিতাই। তুমি স্বতন্ত্র-তন্ত্র, তোমার ইচ্ছায় কে বাধা দিতে পারে? আর তুমি যাহা ভাল বলিয়া বোঝ, তাহাই ভাল। কিন্তু তোমাকে সন্ন্যাসী বেশে দেখিলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি তোমার প্রিয়জন-গণের নিকট বলিয়া দেখ, কেহই তোমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিবে না। ধন্য তোমার সাহস, যে এই কথা বলিতে সাহসী হইয়াছ।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিজনের নিকট ধীরে ধীরে পাকেপ্রকারে সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাব

শুনিয়া ভক্তগণের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল, তাঁহাদের মুখে বিষাদ কালিমা দেখা দিল,—অনেকেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি যে এত নিঠুর, তাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই। আমাদের কি অপরাধ, যে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে। যদি তুমি সন্ন্যাস লও, আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাস লইয়া তোমার পাছে পাছে চলিয়া যাইব। তোমাকে ছাড়া হইয়া শূন্য নদীয়ায় ক্ষণার্দ্ধও আমরা তিষ্ঠিতে পারিব না! আমাদের যাহা হউক, কিন্তু বৃদ্ধা শচীমা ও বধূমাতা প্রিয়াজী এক মুহূর্ত্তও তোমা ছাড়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না, আমরা কি করিয়া সেই দশা চক্ষে দেখিব?"

এই বলিয়া ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প নিমাই ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার হৃদয় কুসুম হইতেও কোমল, আবার বজ্রঅপেক্ষাও কঠিন। ভক্তগণ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার এইরূপ কঠিনতার পরিচয় পাইলেন। তাঁহারা কত কথা বলিয়া নিমাইর মত পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারেই বিফল হইয়া অনেকে এমন বিষণ্ণ হইলেন, যে অন্নজল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন।

নিমাই বলিলেন "তোমরা অনর্থক প্রাকৃত লোকের ন্যায় শোক কর কেন? তোমরা যেখানে, আমিও সেইখানে। তোমাদের সহিত আমার চির-সম্বন্ধ। তোমরা জন্মে জন্মে এইরূপ সম্বন্ধসূত্রে আমার সহিত আবদ্ধ। তোমাদিগকে আমি কখনও ছাড়িব না। আমি সন্ন্যাস লইব, তাহাতে তোমাদের সহিত সম্বন্ধ ঘুচিবে কেন?

সর্ব্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমি সব আমাসঙ্গে।
নিরবধি আছ সঙ্কীর্ত্তন সুখ রঙ্গে॥
এই মত আছ আরো দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥

আমি যে এই সন্ন্যাস লইতেছি, ইহা কেবল লোক রক্ষার জন্য। তোমাদের চিন্তা কি? এই বলিয়া নিমাই সকলের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গন করিয়া মর্ম্মকথা জানাইলেন, ভক্তগণের মনে যদিও প্রবোধ মানিল না তথাপি তাঁহারা বিষণ্ণমনে নীরব হইলেন।

(২)

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির ভাবগতি দেখিয়া একেবারেই মরমে মরিয়া থাকিতেন। নিমাই বিরস বিষণ্ণভাবে বলিতেন,—আমি এক একবার মনে করি, দুইদণ্ড তোমার কাছে থাকিয়া তোমায় দেখি, কিন্তু কি করিব, আমার মন আমার স্ববশে নাই, কি করিব, কি হইবে,—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।”

পতির এই ভাব দেখিয়া কুসুমকোমলা প্রিয়াজী পূর্ব্ব হইতেই আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শচীমাতার হৃদয় দিবানিশিই নিমাইর জন্য ব্যাকুল হইত। তিনি নিমাইকে সম্মুখে পাইলেই বলিতেন—বাবা, তুমিই আমার একমাত্র অন্ধের নয়ন, তোমায়

এরূপ দেখিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। বাবা, তুমি এমন উদাসীর মত হইলে আমরা কাহার মুখের দিকে চাহিয়া জীবন ধারণ করিব? তুমি সে দিন এক সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত গোপনে গোপনে কি আলাপ করিতেছিলে? বাবা সন্ন্যাসী দেখিলে আমার বড় ভয় হয়। সন্ন্যাসী আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সন্ন্যাসীরা সর্ব্বদাই তোমার দাদা বিশ্বরূপের কাছে আসিত, অবশেষে একদিন আমার সোণার চাঁদ বিশ্বরূপকে উহারা হরিয়া লইল, আমার অঞ্চলের ধন, অন্ধের নয়নকে আর দেখিতে পাইলাম না। আবার সেইরূপ সন্ন্যাসীর আনাগোনা দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে, তোমার মুখখানিতেও আর সে ভাব দেখিতে পাই না। বাবা, আমার মাথার দিব্যি, তুমি কি ভাবিতেছ বল, তুমি বল যে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে না।

নিমাই।—মা, এ দেহ তোমার, আমি তোমার আজ্ঞাধীন। কিন্তু আমার মন আমার স্ববশে নাই, আমার কিছুই ভালবোধ হইতেছে না। আমি এখন আহার-বিহার ও লৌকিক আলাপ-ব্যবহারের বাহির হইয়াছি। আর যে আমি সংসারে মন বাঁধিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন যাহা করি, তোমায় না বলিয়া কিছু করিব না। তোমার অনুমতি ছাড়া কিছুই করিব না।”

শচী জানিতেন তাঁহার পুত্র কখনও মিথ্যাকথা বলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন, তাঁহার মনে হইল,—আমার অনুমতি ছাড়া নিমাই যখন কিছু করিবে না, তখন একরূপ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কেননা আমি তো সন্ন্যাসের অনুমতি দিব না।”

এদিকে নিমাইর গোপীভাব ক্রমেই অধিকতর ঘনীভূত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ-বিরহে গোপীদের হৃদয়ে যেমন অসহ্য ব্যাকুলতার উদয় হইত, নিমাইর ঠিক সেই ভাব দেখা দিল। তিনি হা কৃষ্ণ বলিয়া অচেতন হইতে লাগিলেন, ঘরে থাকা তাঁহার পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন কে যেন তাঁহাকে "তত্ত্বমসি" এই সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়া বিহ্বল হইলেন, মুরারিকে বলিলেন—এ মন্ত্র আমি কি করিয়া লইব? ইহাতে প্রাণনাথের সহিত আমার সম্বন্ধ উঠিয়া যায়। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এই মন্ত্রে কেবল আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। আমি প্রাণনাথকে ত্যাগ করিতে পারিব না। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে

"কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয় প্রাণনাথ।
তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ॥"

মুরারিগুপ্ত বলিলেন—এ মন্ত্রে আর দোষ কি? "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থ "তুমি তাঁহার" এইরূপ করিলেই তো গোল চুকিয়া যায়, ইহার জন্য আর দুঃখ কি?"

"নিমাই কিছু স্থির হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। নিমাইর প্রাণ কৃষ্ণবিরহে যেন ক্রমেই অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি নির্জ্জনে থাকিয়া দিবানিশি কৃষ্ণচিন্তা করিয়া ফাঁপর হইয়া কাঁদিতেন, কাহারও সহিত বেশী কথা বলিতেন না, মধ্যে মধ্যে প্রিয়পার্ষদ-গণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিতেন—কৃষ্ণবিরহে

আমার প্রাণ যায়—এখন উপায় কি বল, আমি আর ঘরে থাকিতে পারিব না।”

একদিন শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাই স্পষ্টতঃই পার্ষদগণকে বলিলেন—তোমারা আমার প্রাণের বান্ধব, আমি তোমাদিগকে মরমের কথা খুলিয়া বলি, আর আমি ঘরে থাকিতে পারিব না, আমাকে ঘরে রাখিয়াও তোমাদের কোন সুখ হইবে না, আমাকে লইয়া তোমাদের আরও যাতনা বাড়িবে। তোমরা আমায় বিদায় দাও।

নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব যথা বৃন্দাবন ভূমি॥

এইরূপ ব্যাকুল হইয়া নিমাই “হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন, অবশেষে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। মর্ম্মী ভক্তগণ তাঁহার অসহ্য বিরহ-যাতনা বুঝিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হইলেন।

গদাধর তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া পাছের দিকে বসিলেন, দেখিলেন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু ফুলিয়াছে, নয়ন লোহিতবর্ণ দেখাইতেছে, কথা বলিতে গেলেই বাক্য স্তম্ভিত হইতেছে, যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

কহিতে আরম্ভ মাত্র গদগদ স্বর।
অরুণ কমল আঁখি করে ছল ছল॥
সকরুণ কণ্ঠ আধ আধ বাণী কহে।
সম্বরিতে নরে ক্ষণে নিঃশব্দে রহে॥

নিমাই একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন—আমি সন্ন্যাস লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইব, সেখানে গিয়া যমুনাপুলিনে, এবং বনে বনে আমার প্রাণনাথকে খুঁজিব। তাঁহাকে ছাড়া দশদিক শূন্য শূন্য বোধ হইতেছে।

প্রেমিক পাঠক, আপনার অবশ্যই জানা আছে, শ্রীরাধার ভাবদ্যুতি লইয়া শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধার প্রেমাস্বাদ এই লীলার অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য। অমরকবি জ্ঞানদাস শ্রীগৌরাঙ্গলীলা দেখিয়াই রাধাভাবের পদাবলী লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ স্থানে জ্ঞানদাসের একটি পদ শুনুন ঃ—

গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি
বান্ধিব আঁচল দিয়া॥

নিমাই এই ভাবে বিভাবিত হইয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। পার্ষদগণের নিকট বিদায় লইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

নিমাই কাতর কণ্ঠে বলিলেন, তোমরা বাধা দিও না। যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, তবে আমায় বিদায় দাও, আমার প্রাণ

আমার দেহে নাই। উহা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চলিয়া গিয়াছে, শূন্য দেহ লইয়া তোমরা কি করিবে?”

গদাধর অনেকক্ষণ নীরব ছিলেন, কিন্তু আর নীরব থাকিতে, পারিলেন না। তিনি বলিলেন, “তোমার সকল কথাই বুঝিলাম। তুমি কি মনে কর যে গৃহে বসিয়া কৃষ্ণভজন হয় না? তুমি সন্ন্যাসী হইতে চাও, যাও সন্ন্যাস গ্রহণ কর গিয়ে। তাহাতে কে তোমায় বাধা দিবে? কিন্তু নিশ্চয় জানিও,—তুমি গৃহত্যাগ করিলে পরক্ষণেই তোমার বৃদ্ধা জননী ও প্রিয়াজী তোমার শোকে প্রাণে মরিবেন। মাতৃবধ করিয়া যে ধর্ম্ম হয়, তুমি কি জগতে এই ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিতে আসিয়াছ?

নিমাই বলিলেন, “যদি তোমাদের মত বান্ধব আমার না থাকিত, তবে আমি এ সাহস করিতাম না। আমি জানি আমি আকুল হইয়া চলিয়া গেলেও তোমরা আমার বৃদ্ধা জননীর শোক-দগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে পারিবে, আমার হইয়া তোমরাই আমার মাকে রক্ষা করিতে পারিবে। ভাই গদাধর, আমার মা যখন নিমাই নিমাই বলিয়া ব্যাকুল হইবেন তখন তুমি আমার মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিও, তাঁহার নয়নজল মুছাইও, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিও,—বলিও—নিমাই চিরদিনই তোমার। নিমাই আবার আসিবে। এইরূপে আমার মাকে রক্ষা করিও। যদি গৃহে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত, তবে কিছুতেই আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতাম না। আমার মাকে রক্ষা করিও—তোমাদের নিকট এ দীনের এই শেষ ভিক্ষা।

অদ্বৈত ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন,—সত্যসঙ্কল্প বিশ্বম্ভরকে আর রাখা যাইবে না। ভক্তগণ একবারে বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন—আর উহার কুল দেখিতে পাইলেন না।

ইতোমধ্যে একদিন কাটোয়ার কেশবভারতী নবদ্বীপে আসিলেন। নিমাই তাঁহার সহিত গোপনে গোপনে দীর্ঘকাল আলাপ করিলেন, অবশেষে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন :—

কতদিনে কৃষ্ণ মুঞি দেখিবারে পাব।
তোমার মত বেশ আমি কবে সে ধরিব॥
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে মুঞি দেশে দেশে যাব।
কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুঞি পাব॥

ভক্তগণ বুঝিলেন নিমাই গৃহ ত্যাগ করিবার জন্য একবারেই দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছেন। নিমাইর কৃষ্ণবিরহে অবস্থা ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া উঠিল। লোকে প্রবোধ দিলেও তাহাতে তিনি কাণ দিতেন না। তিনি বলিতেন,—(যথা চৈতন্যমঙ্গলে)

কৃষ্ণের বিরহে মোর ধক্ ধক্ প্রাণ।
আর যত বোল কিছু না সম্ভায়ে কাণ॥
ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে।
যথা লাগি পাও প্রাণনাথের উদ্দেশে॥

নিমাইর এই ভাব দেখিয়াই মুরারিগুপ্ত শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগের একটী পদে লিখিয়াছেন, যথা :—

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।

জীয়ন্তে মরিয়া যে আপন খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
খাইতে শুইতে চিতে আন নাহি হেরি পথে
বঁধু বিনে আন নাহি ভায়।

পদকর্ত্তা শ্রীরাধামোহন দাস লিখিয়াছেন—

আজু হাম নবদ্বীপ-দ্বিজরাজ পেঁখলুঁ নব নব ভাবে বিভোর।
দিনরজনী কিয়ে, কছু নাহি জানত, নয়নে গি অবিরত লোর॥

এই অবস্থায় নিমাইর গৃহত্যাগ যে অতি নিশ্চয়, ভক্তগণ তাহা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পাইলেন।

(৩)

নিমাই যে গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, ভক্তগণের নিকট বিদায় লইতেছেন, শচীমা বা প্রিয়াজী এ সম্বন্ধে কোনও কথা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নিমাইর ভাবগতিতে অতর্কিত ভাবে উভয়েরই মন যেন অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। শচীর প্রাণ নিরন্তর ধক্ ধক্ করিতেছে, মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সোয়াস্তি নাই। সততই চিত্তে আশঙ্কা হইতেছে; নিমাই তাঁহার হৃদয় আঁধার করিয়া চলিয়া যাইবে, রাত্রিতে তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, কেবল নিমাইর চিন্তা। যদি বা কোন সময়ে একটু ঘুমের মত বোধহয় অমনি "হা নিমাই হা নিমাই" বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠেন, তিনি স্বপ্নে দেখেন, নিমাই তাঁহার গৃহশূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। জাগিয়া বলেন—গোবিন্দ দয়াময়, আমার

সব লইয়াছ, এতগুলি সন্তান লইয়াছ, সোণারচাঁদ বিশ্বরূপকে হরিয়া লইয়াছ, পতিকে লইয়াছ—এখন আমার নিমাইকে ঘরে রাখ। নিমাই গেলে আমার উপায় কি ?”

শচীর বয়স তখন প্রায় ৬৮ বৎসর। শোকে দুঃখে ভাবনায় চিন্তায় অস্থিসারা। কেবল নিমাই ও প্রিয়াজীকে দেখিয়াই কোন মতে তিনি জীবন ধারণ করিতেছিলেন। তাঁহার উপরে নিমাইর এই অবস্থা। অন্য রমণী হইলে এতদিন তাঁহাকে উন্মাদিনী হইতে হইত। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ যাঁহার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তো আর যে-সে রমণী নহেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা বাস্তবিকই অলৌকিক।

যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শচীদেবী নিমাইর এই নিদারুণ সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিলেন না, কিন্তু এ কথা আর অধিক দিন চাপা রহিল না। পার্ষদগণ ও ভক্তগণ এই নিদারুণ ঘটনার আশঙ্কায় একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পত্নীগণ তাঁহাদের মুখে এই সংবাদ পাইয়া মর্ম্মযাতনায় এই কথা লইয়া কাণাকাণি করিতেছিলেন। শচীমাতা ও প্রিয়াজী এ কথা শুনিতে না পান, এজন্য সকলেই সতর্ক হইয়াছিলেন। কিন্তু হৃদয়বিদারক সংবাদ চাপা দিতে গিয়াও তাঁহারা চাপা দিতে পারিলেন না। এক মুখ হইতে অন্য মুখে কেবল নিমাইর গৃহত্যাগের কথাই দিনরাত চলিতে লাগিল। নারীগণের কাণাকাণিতে শচীদেবী বুঝিতে পারিলেন, নিমাই বুঝি আর গৃহে থাকিবে না এবং এই কথা তিনি ভিন্ন আর সকলেই স্পষ্ট জানি-

য়াছে। ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। এবার প্রকৃতপক্ষেই শচীদেবীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল। প্রথমতঃ গদাধরকে ডাকিয়া সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "গদাই, শুনিলাম নিমাই নাকি কি করিবে?" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। শচীদেবী সন্ন্যাসের কথা মুখে আনিতে পারিলেন না।

গদাধর কিছুকাল নীরব থাকিয়া বিষন্ন গম্ভীরভাবে বলিলেন,—তিনি আপনার একান্ত অনুগত,—বিশেষতঃ সত্যবাদী। আপনার নিকট তিনি কোনও কথা গোপন করিবেন না, আর আপনার অনুমতি না পাইলেও কিছু করিবেন না। আপনি সময় বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা হইলেই সকল কথা শুনিতে পাইবেন। তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া কাহারও ভালবোধ হইতেছে না।" এই বলিয়া গদাধর নীরব হইলেন। শচী বুঝিলেন—তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তবে কথা এই যে নিমাই যাহাই করুক তাহার অনুমতি ছাড়া কিছু করিবে না। এই ভাবিয়া একটুকু আশ্বস্ত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাই গৃহে ফিরিলেন, মুখখানিতে কেমন এক ভাব,—যেন এইমাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছেন, গণ্ডে তখনও নয়নজল ভাল করিয়া শুখায় নাই। নিমাই গৃহে আসিয়াই দণ্ডবৎ হইয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিলেন। নিমাইর চিরদিনই এইরূপ প্রণামের অভ্যাস ছিল। তিনি গৃহ হইতে একদণ্ডের তরে কোথাও

যাইতে হইলে মাকে প্রণাম করিয়া যাইতেন, আবার তখনই ফিরিয়া আসিলে এইরূপ প্রণাম করিতেন। শচীমা নিমাইকে ধরিয়া তুলিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিলেন—আনিয়া বলিলেন—"বাপ্" তুমি আমার অন্ধের নয়ন, আমার সব গিয়াছে, কেবল তোমাকে লইয়া ঘরে আছি, তুমি যদি সর্ব্বদা এরূপ কর, তবে আমার উপায় কি ?

নিমাই। কি করিব মা, আমি স্ববশে নাই, আমার এখন দিবানিশি কান্না পায়, তাই নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদি। কোথায় গেলে শান্তি পাব, আমার মনে কেবল এই ভাবনা। এ ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি না। আমি জানি তুমি স্নেহময়ী জননী—আমার প্রত্যক্ষ দেবতা। তোমার চরণ সেবাই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। কিন্তু কি করিব মা, মন মানাইবার ক্ষমতা আমার নাই।"

শচী। তা তুমি ঘরে থাকিয়া কৃষ্ণভজন কর, কৃষ্ণকথা বল, আমাদিগকে কৃষ্ণকথা শুনাও, মনের বেগ সামলাইতে না পার, না হয় কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ। তাতে আমি বাধা দিব না। কিন্তু বাছা কি শুন্‌ছি যে ? আমি তোমার মা, আমায় ঠিক করিয়া বল।"

বলিতে বলিতে শচীদেবী আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়ন অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল, ঠোঁট দুইখানি কাঁপিতে লাগিল। নিমাইকে বুকে ধরিয়া শচীদেবী কাঁদিতে লাগিলেন।

মায়ের নয়ন জল দেখিয়া নিমাইর নয়নযুগলে অশ্রু দেখা দিল, মুক্তামালার ন্যায় অশ্রুবিন্দু নিমাইর গণ্ড বহিয়া চলিল। তিনি মায়ের চক্ষের জল মুছাইয়া বলিলেন,—"মা কাঁদিও না। সকলি

কৃষ্ণের ইচ্ছা। এই বলিয়া নিমাই মাটির দিকে মুখ করিয়া নীরব রহিলেন। নিমাই পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন, তিনি অনায়াসে মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্ন্যাস করিবেন। কিন্তু চির দুখিনী মায়ের জীর্ণ শীর্ণ দেহ ও শোকাকুল মুখে নয়ন জল দেখিয়া নিমাইর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জননীর কথায় কোন উত্তর দিতে তাহার এক বারেই সাহস হইল না। নিমাই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শচী। বাছা, আমি তোমার চোখের :জল দেখিতে পারি না। আমি আর কাঁদিব না, তুমি কাঁদিও না। তুমি কি মনে করিয়াছ, আমায় বল। আমি তোমার মা। আমাকে মনের কথা বলিবে না, তবে আর কাহাকে বলিবে?

নিমাই। মা বলিয়াছি তো, আমি আমার স্ববশে নাই। আমার মনে যাহা হইতেছে, তা তোমায় বলিতে আমার সাহস নাই। কোন্ মুখে তোমার কাছে সে কথা তুলিব, এই ভাবিয়া কিছুই বলিতে পারি নাই। তুমি আমার স্নেহময়ী জননী, এজগতে সাধারণতঃ মা দশমাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, কিন্তু আমি বৎসরাধিক কাল তোমার গর্ভে থাকিয়া তোমায় কত কষ্ট দিয়াছি, তুমি রোগে শোকে ও বার্দ্ধক্যজীর্ণদেহে কত ক্লেশে আমায় লালন পালন করিয়াছ। আবদার করিয়া অন্যায় আচরণ করিয়া তোমায় কত যাতনা দিয়াছি। শিশুকালে দাদা ও বাবা আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, তুমি কত যত্নে আমায় রক্ষা করিয়াছ, লেখা-পড়া শিখাইয়াছ, আমাকে গৃহে রাখিয়া গার্হস্থ্য সুখ দিবার

জন্যই বা কত যত্ন করিয়াছ। আর এখন আমার এই দশা দেখিয়া তুমি কত যাতনা পাইতেছ, তোমার নিজের দেহের ভাবনা নাই কেবল আমাকে লইয়াই তুমি অস্থির। এখন তুমি বৃদ্ধা, তাহাতে শোকে শোকে জীয়ন্তে মরা। এখন আমার প্রধান ধর্ম্ম প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করা। এইত পুত্রের কাজ,—কি বল মা?

নিমাইর কথা শুনিয়া আবার শচীদেবীর নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, কিন্তু পাছে বা তাহা দেখিয়া নিমাইর মনে যাতনা হয়, এই ভাবিয়া তিনি অতি কষ্টে নয়নজল সংবরণ করিয়া বলিলেন "বাবা আমি সেবা চাই না, কেবল তোমার ঐ মুখ খানি দেখিতে পাইলে আমি আর কিছুই চাই না।

নিমাই। তোমার স্নেহের প্রতিদান নাই, তোমার স্তন্যদুগ্ধেই এই দেহ। উহার এক বিন্দুর জন্যও আমি সারাজীবন তোর নিকট ঋণী, সে ঋণ শোধ করা যায় না। কিন্তু মা আমি তোমার এমন কুসন্তান যে আমি তোমার কোনও সেবা করিতে পারিলাম না।

এই কথা বলিতেই নিমাইর বাক্য গদ্‌গদ্‌ হইয়া পড়িল। নিমাই বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার ঢল ঢল নয়ন আবার সজল হইয়া উঠিল, পাছে বা জননী তাহার নয়ন জল দেখিয়া ক্লেশ পান, এই আশঙ্কায় অতি কষ্টে নয়ন জল সংবরণ করিলেন।

আজ এই নিদারুণ কথার দিনে স্নেহময়ী জননী নিজের হৃদয়ে পাষাণ চাপাইয়া দিয়া পুত্রের কথা শুনিতেছেন, তাঁহার মুখখানি শুষ্ক, নয়নে একবিন্দু জল নাই, যেন নিদারুণ অন্তর্দাহে তাঁহার

গোটাহৃদয়কে পুড়িয়া খাঁক করিয়া ফেলিয়াছে। নিমাই মুখে যদিও একথা বলেন নাই, যে তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন। এ জগতে ভাষায় আর কয়টী কথা প্রকাশ পায়? শচীদেবীর নিজের মনই তাঁহাকে স্পষ্ট জানান দিয়াছে, যে নিমাই তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন, তাই তিনি জন্মের মত তাঁহার হৃদয়ের ধনকে প্রাণ-ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন।

নিমাই শচীদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন যে মা এখন শোকে শোকে শোকবেগের অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, স্নেহময়ী জননী, আমি কোটিজন্মেও যদি তোমার চরণতলে বসিয়া তোমার সেবা করি, কিছুতেই তোমার ঋণ শোধ দিতে পারিব না। তুমি আমায় নিজ সদাশয় গুণে ঋণ মুক্ত কর, এ প্রার্থনাও আমার নাই। কে কবে স্নেহের ঋণ হইতে মুক্তি লইতে চায়? আমি চিরদিন তোমার নিকটে এই ঋণে ঋণী রহিব, এবং চিরদিনই তোমার ঋণের কথা মনে রাখিব। কখনও তোমায় ভুলিব না। কিন্তু মা, যাহা মনে করিয়াছি, তাহা এখন আর তোমার না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কি জানি কেমন মনের টানে আমি কৃষ্ণের জন্য পাগলের ন্যায় হইয়াছি, আমি সোয়াস্তি পাইতেছি না। কীর্ত্তন এত ভাল বাসিতাম, এখন সেই কীর্ত্তনও ভাল লাগিতেছে না, লোকসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতেছে। মনে করিতেছি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব, সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে বাহির হইব—মা আর আমি ঘরে থাকিতে পারি না। আমার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, কেবল দেহ মাত্র এখানে রহি-

য়াছে। আমার যাহাতে হিত হয় ইহাই তোমার ভাবনা, আমি সন্ন্যাসী হইলেই আমার ভাল হইবে, ইহাই বুঝিয়া মা তোমার এই অধম সন্তানকে বিদায় দাও।”

পূর্ব্বে বলিয়াছি কি-জানি-কোন্ শক্তির প্রভাবে শচীদেবীর শোকদগ্ধ হৃদয়ে সহসা পাষাণ চাপা পড়িয়াছিল, তাঁহার শোকবেগ চরমসীমায় উঠিয়া একবারে স্থগিত ও নিশ্চল হইয়াছিল। তাঁহার মনের অবস্থা আমরা ভাষায় বুঝাইতে পারিব না। ফলকথা এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়াও তাঁহার মূর্চ্ছা হইল না, মুখেও কোন বিষাদ-ভাবের চিহ্ন দেখা গেল না। শচীমাতা উদাসিনীর ন্যায় এই বজ্রতুল্য নিদারুণ সংবাদ শুনিলেন, কোনও উত্তর না দিয়া শূন্য দৃষ্টে নিমাইর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নিমাই কাতর কণ্ঠে আবার বলিলেন—“মা দয়াময়ী, সদয় হইয়া আজ্ঞা দাও, আমি সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণভজন করিব।”

শচীর স্থির নয়নে পলক পড়িল, তাঁহার বিশুষ্ক মুখখানি হইতে অস্ফুটভাবে সহসা একটী কথা শুনিলেন—“বুঝিলাম,—কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া?

নিমাইর হৃদয়ে আবার একটি তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। তিনি অচিরে সে বেগ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—“মা, সে জন্য ভাবিও না। যাহারা আমাকে ভালবাসে, তাহারা আমার ভালতেই ভাল মনে করিবে। আমি ঘরে থাকিয়া শান্তি পাইব না, কাহাকেও সুখ শান্তি দিতে পারিব না। অপর পক্ষে সকলের যাতনার কারণ হইব। আমি সন্ন্যাস লইয়া কৃষ্ণভজন

করিব,—কৃষ্ণই সকলের মনে শান্তি দিবেন। সে আমার হইয়া তোমার চরণ সেবা করিবে, তোমার পুত্রবধূ যে তোমার সেবা করিবে, ইহাই আমার মনের সান্ত্বনা। যখন তোমার সেবার কথা আমার মনে হইবে, তখন তোমার পুত্রবধূর কথা মনে করিয়া শান্তি পাইব। সে আমা অপেক্ষা অধিকতর যত্নে তোমার সেবা করিবে,—এই সান্ত্বনায় আমার অনেক দুঃখ দূর হইবে।

শচী এতক্ষণ নিমাইর মুখের দিকেই চাহিয়া ছিলেন। নিমাই কি বলিতেছেন সে বিষয় আধ-আধ ভাবে তিনি শুনিতেছিলেন। ফলতঃ শচীদেবীকে দৃশ্যতঃ সুস্থিরা বলিয়া বোধ হইলেও তাঁহার চিত্ত বজ্রাহতের ন্যায় একরূপ সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল, ক্ষণিকের তরে আবার যেন তাঁহার স্বাভাবিক চেতনা ফিরিয়া আসিল।

শচীদেবী চমকিয়া বলিলেন— কি বলিলি নিমাই, তুই সন্ন্যাসী হইবি ? আমি মরণের পথে দাঁড়াইয়াছি, তুই আমায় ছেড়ে যাবি ? নিমাই, বল্‌দেখি আমার আর কে আছে ? তুই যে আমার অন্ধের নয়ন, তোরে না দেখিলে আমার পলকে প্রলয় হয়, আমি কি তোরে ছেড়ে থাক্‌তে পারি ? ক্রমে ক্রমে সাতটী মেয়ে ম'রে গেল ; তার পরে তোকে কোলে পাইলাম। বিশ্বরূপকে ও তোরে লইয়া এতদুঃখেও কত আশা মনে হইত। কিন্তু আমার কপাল দোষে সোণারচাঁদ বিশ্বরূপ যখন আমায় ছেড়ে চলে গেল, তখন আমার কোলে আসিয়া আমার চখের জল মুছাইয়া তুইনা বলিয়াছিলি—মা আমি তো আছি, তোমার ভাবনা কি, আমি তোমার কাছে থাকিব, তোমায় মা বলিয়া ডাকিব।" এখন তোর মুখের দিকে

চাহিয়া সকল শোকের আগুন চাপা দিলাম। কর্ত্তা তোরে আমার কোলে দিয়া বিদায় হইলেন।”

সংসারে একাকিনী,—তোরে বুকে লইয়া সকল পাসরিলাম। বিধাতা বহুদিন দুঃখ দিয়া পরে আমায় সুখ দিলেন। চারিদিকে তোর নাম হইল। আমি নিমাই পণ্ডিতের মা, লোকে আমাকে ভাগ্যবতী বলিয়া কত মান্য করে। বিবাহ হইল, বউ মা ঘরে আসিল, আমার কর্ম্ম দোষ সে আমায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। আবার বিধাতা ঠিক তেমনটীই দিলেন—রূপে গুণে, লজ্জায় শীলতায়, স্বভাব চরিত্রে বউমা আমার **স্বয়ংলক্ষ্মী**। মনে করিলাম এবার পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া কয়েকদিন সংসার করিব, আরও মনে করিলাম আমার বউমার কোলে একটী সোণারচাঁদ হইবে, আমি চক্ষু থাকিতে এক-বার পৌত্রের মুখ দেখিয়া তোমাদিগকে সংসারে রাখিয়া হরিচরণ চিন্তা করিতে করিতে এই জীবন শেষ করিব। নিমাই, তুইকি আমার সকল আশায় ছাই দিয়া সন্ন্যাসী হইবি? ধন্য তোর সাহস, যে আমার কাছে সন্ন্যাসের কথা তুলিয়াছিস্। তুই ছেড়ে গেলে কি আমি প্রাণ রাখিব?

দুঃখ দিয়া অভাগীরে ছেড়ে যাবা তুমি।
গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি॥
দুখিনীর পুত মোর সোণার নিমাই।
আমারে ছাড়িয়ে তুমি যাবে কোন ঠাঁই॥
বিষ খেয়েঁ মরিব রে তোর বিদ্যমানে।
তোমার সন্ন্যাস কথা না শুনিব কাণে॥

আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া॥

নিমাই, তুমি সুপণ্ডিত, তোমায় আর কি বলিব? মাতৃবধ, স্ত্রীবধ ও বন্ধুবধ করিয়া যদি ধর্ম্ম হয় তবে তুমি সন্ন্যাস কর। গৃহস্থের কি আর কৃষ্ণ-ভজন হয় না? বাছা ও কথা আর মুখে এনো না। ওকথা শুনিলে আমি জ্ঞানহারা হই, কি বলিতে কি বলি,—বুঝিতে পারি না।

নিমাই প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন, তিনি সহজেই মায়ের নিকট অনুমতি লইতে পারিবেন। কিন্তু মায়ের কথা শুনিয়া নিমাই একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন। অথচ তাঁহার মনের যে অবস্থা ইহাতে সংসার-কারা-গৃহে থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

নিমাই মায়ের চরণে আবার দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া বলিলেন,—"মা তোমার প্রত্যেক কথা আমার কাছে বেদবাক্য। তোমার একটি কথারও উত্তর দিতে পারি, এমন শক্তি আমার নাই। এখন আমার এমন অবস্থা যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান একবারে লোপ পাইয়াছে। আমি সকলই বুঝিতে পারি, আবার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মনে হইতেছে আমি সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমিব, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিব, তবে যদি কৃষ্ণের কৃপা হয়; আর কৃষ্ণের কৃপা না হইলে,—এজীবন-ধারণেই বা ফল কি?

শচী। বাছা ওকথা আর তুলিস না, মায়ের প্রাণ কি এত সইতে পারে? বাবা, তোর ঐ কোমল পাদুখানি হইতে হাটিতেই

যেন রক্ত পড়ে। তুই কি করিয়া পথে চলিবি, রোদে বৃষ্টিতে কোথায় দাঁড়াইবি। তুই এই চাঁচর চুল মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইবি, এই পট্টবাস ত্যাগ করিয়া কোপীন পড়িবি। আর সোণার অঙ্গে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবি। ক্ষুধার সময়ে কে তোরে এক মুষ্টি অন্ন দিবে? তৃষ্ণা পাইলে কে তোরে এক-টুকু জল দিবে? যদিই বা কেহ এ দুখিনীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া একমুষ্টি অন্ন দেয়, কিন্তু সে কি তোর সম্মুখে বসিয়া "বাবা আর এক গ্রাস মুখে দে,—এখনও তোর ক্ষুধা যায় নাই, আমার মাথার দিব্যি আর এক গ্রাস মুখে দে"—ইহা বলিয়া তোকে খাওয়াইবে? তুই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় গাছের তলে ঘুমাইয়া পড়িলে কে তোর ঘুম ভাঙ্গাইয়া তোর খাওয়ার উদ্যোগ করিবে? বাপ্ নিমাই, ওকথা আর মুখে এনো না, আমার হৃদয় ধসিয়া পড়িতেছে, আর পারি না।"

বলিতে বলিতে শচীমাতা আবার গভীর শোক বেগে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সতৃষ্ণ কাতর নয়নে নিমাইর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মায়ের অবস্থা দেখিয়া নিমাইর নয়ন ছল ছল হইয়া উঠিল, তিনি দুই হাতে মায়ের চরণ ধরিয়া বলিলেন—"মা তোমায় আমি কত যাতনা দিলাম—পুত্র মায়ের সেবা করে, মাকে সুখ দেয়, কিন্তু আমি এমনই দুর্ভাগ্য যে কেবল তোমার দুঃখের কারণ হইলাম। আমি অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর। তুমি অনুমতি না দিলে—স্বচ্ছন্দে অনুমতি না দিলে,—কৃষ্ণ আমায় কৃপা করিবেন না। সে সন্ন্যাসেও আমার মঙ্গল নাই। তুমি

অনুমতি না দিলে আমি কখনও সন্ন্যাস করিব না। মা তুমি শান্ত হও।

এবার শচীমাতার নূতন শঙ্কট উপস্থিত হইল। তিনি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিতেছেন,—গৃহসুখে পুত্রের শান্তি নাই,বিষ্ণুপ্রিয়ায় অমন প্রণয়ে ও অমন সেবায় যাহার মন ঘরে বাঁধা রহিল না, তাহাকে ঘরে রাখা অসম্ভব। তিনি আরও বুঝিলেন গৃহ এখন নিমাইর পক্ষে কারাগৃহস্বরূপ। কেবল তাঁহার দিকে চাহিয়াই নিমাই এই কারাক্লেশ ভোগ করিতে স্বীকার করিতেছে। শচী ভাবিলেন,—আমি এ কি করিতেছি, আমার আত্মতৃপ্তির জন্য আমি আমার প্রাণের প্রাণকে কারা-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিব কেন? তবে এক বিষম ভাবনা,—অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া! কিন্তু কি করিব, হরি জানেন কি হইবে।” এই ভাবিয়া শচীদেবী অধোবদন নিমাই চাঁদের চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, “বাবা অমন কথা বলিও না, আমার কাছে অপরাধের কথা বলিও না। তোমার যাতে সুখ হয়, তাই আমার সুখ। কিন্তু আমার সোণার প্রতিমা বউমাকে তুমি অনাথ করিয়া যাইবে, এ দুঃখ আমি কিছুতেই সহিতে পারি না। এ আগুন বুকে লইয়া আমি কি করিয়া কাল কাটাইব? শচীমা এই বলিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি চক্ষের জল ফেলিবেন না বলিয়া মনে করিয়াছিলেন কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা মনে করিয়া আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না।

নিমাই অধোবদনে কাতরকণ্ঠে বলিলেন—মা আপনার কৃপা হইলে সে প্রবোধের ভার আমার উপরে দিন। আপনি

মনে মনে সকল কথা বিচার করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমায় অনুমতি প্রদান করুন।

শচী। আমি তোমায় সন্ন্যাসের অনুমতি দিব—এও কি সম্ভব? তবে তোমার যাহাতে হিত হয়, যাহাতে তুমি সোয়াস্তি পাও, আমায় শত কালসাপের দংশনজ্বালা সহ্য করিতে হইলেও তাহা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। আমি কি স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতি দিব যে, আমাদিগকে ঘরে রাখিয়া তুমি সন্ন্যাসী হও। আমি অভাগিনী তাই এত সহিলাম। এ আগুনে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

নিমাই। তুমিই যথার্থ স্নেহময়ী। পুত্রের ভালবাসা কেমন, তাহা কেবল তুমিই জান। কিন্তু মা বুঝিয়া দেখ—আমি স্ববশে থাকিলে কি এমন সুখের সংসার—তোমার মত স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননী,—আর এমন প্রিয়তম পার্ষদগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমি কি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতে পারিতাম। সংযোগ বিয়োগ কৃষ্ণের ইচ্ছা। জীবের কর্ত্তব্য কৃষ্ণভজন। ঘরে থাকিয়াও কৃষ্ণভজন হইতে পারে। কিন্তু মা, বিধাতার ইচ্ছা নয়—আমি ঘরে থাকিয়া কৃষ্ণ ভজি। তিনি আমাকে জোড়ে টানিতেছেন, তোমরা ইচ্ছা করিলেও রাখিতে পারিবে না। এ অবস্থায় স্নেহময়ী জননি,—তোমার কর্ত্তব্য স্বচ্ছন্দচিত্তে আমাকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করা। মা তুমি কৃষ্ণপদে আমাকে সঁপিয়া দেও,—দিয়া বল হে দীনবন্ধো, অনাথশরণ এই দুখিনীর অঞ্চলের ধনকে,—এই দুখিনীর একমাত্র প্রাণকে তোমার চরণে সপিয়া দিলাম, এ জগতে আমার আর কিছুই রহিল না, আমি শূন্যহাতে করজোড়ে মিনতি করিয়া বলি-

তেছি হে দীনবন্ধো অনাথশরণ তুমি এ কাঙ্গালিনীর অঞ্চলের ধনকে রক্ষা করিও।” বলিতে বলিতে নিমাই বিহ্বল হইয়া বলিলেন,—মা শ্রীকৃষ্ণবিরহে আমি আর আমাতে নাই, কৃষ্ণভিন্ন এ জ্বালা নিবারণের আর অন্য উপায় নাই। তোমাদের স্নেহবন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাহা আমি বুঝিতে পারি কিন্তু কোথা হইতে কি এক তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া আমাকে বৃন্দাবনের দিকে ভাসাইয়া”—এই বলিতে বলিতে নিমাই সহসা অচেতন হইয়া পড়িলেন। শচী দেখিলেন নিমাইর নয়নের তারা স্থির হইয়া গিয়াছে, মুখের বর্ণ সাদা, দেহে স্পন্দন নাই, নয়নে পলক নাই, সমস্ত দেহ একবার হিমের মত হইয়াছে।

শচী নিমাই নিমাই বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার আর্ত্তনাদে অপরাপর লোক দৌড়িয়া আসিলেন, সকলে নিমাইর কাণের কাছে হরিনাম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাইর চেতনা হইল। নিমাই কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে অচেতন হয়েন ইহা সকলেরই জানা ছিল। নিমাইর চেতনা দেখিয়া অন্যান্য লোকেরা শচীমাকে ভরসা দিয়া চলিয়া গেলেন।

শচীমাতা এবার স্পষ্টতঃই বুঝিলেন,—নিমাইকে আর ঘরে রাখা যাইবে না। নিমাই একটুকু স্থস্থ হইয়া বলিলেন “স্নেহময়ী জননী এ অভাগার জন্য আপনাকে কত ক্লেশই সহিতে হইল।” এই বলিয়া দয়াময় মাতৃদুঃখ লাঘব করার জন্য তাঁহাকে জ্ঞানযোগ দান করিলেন। সহসা শচীর মন পরিবর্ত্তিত হইল।

শচী। নিমাই, আমার সোণার চাঁদ, অমন কথা কি বলিতে

আছে। তোমার যাতে ভাল হয় তাই কর, তুমি বাঁচিয়া থাক যেখানে যখন থাকিবে আমি শুনিতে পাইলেই আমি সুখী হইব। জগতের লোকেরা বলে তুমি স্বয়ং ভগবান্। তুমি জীব নিস্তারের জন্য সন্ন্যাসী হইয়া দেশবিদেশে হরিনাম প্রচার করিবে, পতিত পাষণ্ডী উদ্ধার পাইবে। তুমি স্বয়ং ভগবান্, আমার গর্ভে জন্ম লইয়াছ ইহা আমার পরম ভাগ্য। তুমি পূর্ণব্রহ্ম তোমার চরণ ধূলায় আমাদের ঘরবাড়ী পবিত্র হইয়াছে। তুমি আপন ইচ্ছায় কৃপা করিয়া এখানে আসিয়াছ, আবার আপন ইচ্ছাতেই সন্ন্যাসী সাজিতেছ। তুমি ভগবান্ হইয়াও আমার অনুমতি চাহিতেছ, এ সকলি তোমার লীলা। তুমি স্বতন্ত্র তুমি আরার কাহার অনুমতি লইবে? তবে যে অনুমতি চাহিতেছ—ইহা কেবল তোমার মধুর ভাব। আমি তোমাকে চিনিয়াছি। আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে তোমায় অনুমতি দিলাম, যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

সেইখানে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণ বুদ্ধি হৈল।
আপন তনয় বলি মায়া দূরে গেল॥
এত অনুমানি শচী কহিল বচন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ বচন॥
মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ।
এখন আপন সুখে করগা সন্ন্যাস॥

এই বলিয়া শচী যেন আনন্দে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রেম-ময় ভগবান্ তাঁহার আপন জনকে অধিকক্ষণ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে আবৃত রাখেন না। ঐশ্বর্য্যে লীলার চরিতার্থতা নাই, মাধুর্য্যেই

লীলার প্রকৃত আস্বাদন। তাই শ্রীভগবান মাতার আনন্দ মূর্চ্ছা দূর করিলেন, উহার সঙ্গে সঙ্গে শচীদেবীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানও দূরে গেল। তিনি তখন কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—হায় হায় আমি কি পাষাণী, নিজমুখে প্রাণের ধনকে আমি সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দিলাম—আমি কি বলিতে কি বলিলাম, মা হয়ে বাছাকে বিদায় দিলাম।" এই বলিয়া শচীমাতা আবার শোকাচ্ছন্ন হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

নিমাই তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "মা অধীর হইও না, কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমার ভালই হইবে। ইহাতে তোমারও মঙ্গল হইবে।

শচী। বাবা, তোমার আর দোষ কি? তুমিত আমার কথার উপরই নির্ভর করিয়াছিলে। তুমি চিরদিনই মা বই জান না। কিন্তু আমি অভাগিনী তোমায় পথের ভিখারী করিলাম—আমার মত পাষাণী জগতে আর কে আছে? কোন্ মা প্রাণ থাকিতে সন্তানকে সন্ন্যাসের অনুমতি দেয়? জগতে আমার এ কলঙ্ক চিরদিনই থাকিবে যে আমি পুত্রকে অনুমতি দিয়া ঘরের বাহির করিয়াছি। ধিক্ আমাকে, আমি মা নই,—রাক্ষসী।" এই বলিয়া শচীমাতা আবার ব্যাকুল ভাবে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে রোদন দেখিয়া নিমাইর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

নিমাই বলিলেন,—"মা যদি তোমার অনুমতি না হয়, আমি সকল দুঃখ লইয়া ঘরে থাকিব, সন্ন্যাস করিব না।

শচী। নিমাই, আমি কি নিজের সুখের জন্য তোমায় কান্না-

গারে রাখিব? আমি সকলই বুঝিতে পারি। আমার যা হইবার হইবে, কেবল বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা মনে তুলিয়া আমি মরমে মরিতেছি। নিমাই, তুমি এমন মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে আমি মা হয়ে তোমার স্বচ্ছন্দ চিত্তে সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দিলাম! দেখ নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়া কাণাঘুসা শুনিয়া মনে করিতেছেন যে সন্ন্যাস কিছুতেই ঘটিবে না। মায়ের আদেশ ছাড়া মাতৃভক্ত পুত্র কিছুই করিবেন না, স্নেহময়ী মাতা কখনই পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিবেন না। আজ বিষ্ণুপ্রিয়া দেখুক্, আমি নিমাইর কেমন মা। কেমন নিমাই? আমি আজ স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতি দিয়া তোমায় ঘরের বাহির করিলাম, কৌপীন পড়াইয়া সন্ন্যাসী সাজাইলাম।"

এইরূপ বলিতে বলিতে শচীদেবী বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মাতৃভক্ত নিমাই ভক্তি ভাবে মায়ের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "মা, তুমি কি নিজে আমায় অনুমতি দিয়াছ? কৃষ্ণ কৃপাময়। তিনি আমাদের ও অপরাপর সকল জীবের মঙ্গলের জন্য তোমার জিহ্বায় রহিয়া এই অনুমতি দিয়াছেন। কৃষ্ণ যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্য। এজন্য তুমি অনুতাপ ;করিও না। শান্ত হও। আসল কথা শুন। আমি তোমারই পুত্র—চিরদিন তোমার পুত্রই থাকিব। তুমি চিরদিনই আমার মা। সন্ন্যাসে এসম্বন্ধ বাড়িবে বই কমিবে না। আমি যখন যেখানে থাকি তোমাকে ভাবিব। তুমি যখন আমাকে দেখিতে চাহিবে, তখনই আমার দেখা পাইবে। মা

প্রত্যক্ষই তো দেখিতেছে, এ জগতে কয়টী লোক চিরদিন পুত্রকে আপনার চক্ষে চক্ষে রাখিতে পারি। বিদ্যাশিক্ষার্থ শিশু পুত্র জননীর কোল ছাড়িয়া বিদেশে যায়, অর্থোপার্জ্জনের জন্য লোক দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যায় আবার বিদ্যা ও ধন লইয়া পুত্র মায়ের কাছে ফিরিয়া আইসে। আমার সন্ন্যাসও সেইরূপ। বিশেষ এই যে, সাধারণ লোকে যে ধন ও বিদ্যা লইয়া ফিরিয়া আইসে তাহা অতি অনিত্য ও তুচ্ছ। কিন্তু মা আমি যে ধনের জন্য যাইতেছি, তাহা নিত্য ও অক্ষয়, আনন্দ। মা তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার চরণধূলার কৃপায় আমি কৃষ্ণধন লাভ করিতে পারি।

এই বলিয়া মায়ের চরণধূলা মাথায় লইয়া নিমাই তাঁহার কৃপা অনুমতির নিমিত্ত সজল নয়নে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

শচী দেখিলেন, নিমাইর ঢল ঢল নয়ন-অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়াছে। শচী আঁচল দিয়া নিমাইর নয়ন মুছিয়া বলিলেন, "যদি সন্ন্যাস লইয়া কৃষ্ণ ভজন করিলে তোমার হিত হয়, তাহাতেই আমার সুখ। আমি তাহাতে অনুমতি দিলাম। কিন্তু বাপ্ নিমাই, আমাদিগকে মনে রাখিও। তোমার দাদার মত নিদয় হইও না। যখন যেখানে থাক সংবাদ দিও, তুমি ভাল আছ, এই সংবাদ পাইলেই আমি তোমার আশায় আশায় কোনরূপে এ দুঃখের জীবন রাখিতে পারিব।

নিমাই হাসিয়া বলিলেন,—সে কি মা। আমি তোমাকে

ভুলিব কেন? আমি কি ভুলিতে পারি? বলিয়াছিত তোমার একবিন্দু স্তনদুগ্ধের ঋণ অনন্তকোটি জন্মেও শোধিতে পারিব না। মা তোমাকে আর একটি কথা বলিতেছি—যখন তুমি আমার জন্য আকুল হইবে, তখনই আমার দেখা পাইবে। তুমি নিজ হাতে রাঁধিয়া আমাকে খাওয়াইতে বড় ভালবাস, আমিও তোমার হাতের রাঁধা খাইয়া বড় তৃপ্তি পাই। আমি সন্ন্যাসী হইব, দূরে যাইব, কিন্তু দেখিতে পাইবে আমি তোমার ঘর ছাড়িব না। যে দিন তোমার প্রাণ আমার জন্য বড় ব্যাকুল হইবে, আমায় খাওয়াইতে সাধ হইবে, তুমি রন্ধন করিয়া অন্নাদি পরিবেশন করিয়া আমাকে ভাবিও,—তুমি দেখিতে পাইবে আমি তোমার রাঁধা অন্নব্যঞ্জন তোমার কাছে বসিয়া খাইতেছি। ইহাতে তোমার যে সুখ হইবে, সে সুখ বর্ত্তমান সুখ হইতে অনন্ত কোটি গুণে অধিক। মা, আমি চিরদিনই তোমার। তোমার সুখের নিমিত্ত আমি আরও কিয়দ্দিন নবদ্বীপে থাকিব।

নিমাইর প্রীতিমাখা কথায় শচী অনন্তদুঃখের মধ্যেও একটুকু শান্তি পাইলেন।

৩

শচীদেবী পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়া একবারেই মনের শান্তি হারাইলেন। উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে কেবল ঐ এক চিন্তা। এদিকে প্রিয়াজীর নিকট শচীদেবী স্পষ্টতঃ এ নিদারুণ কথা না বলিলেও তিনি লোকের কাণা ঘুসায় এবং স্বামীর

ভাবগতি দেখিয়া সকল কথাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই, তাঁহার মনে ভয় হইত যে তাঁহার প্রাণবল্লভ সত্যসঙ্কল্প ও সত্যবাদী, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যদি বলিয়া ফেলেন যে "আমি সন্ন্যাস লইয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব" তবে এ ভীষণ সংবাদ তাঁহার নিকট বজ্রপাত অপেক্ষাও ভয়ানক হইবে। এই ভাবিয়া মনের ভাব মনে চাপা দিয়া তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ বিষয়ে কোনও কথা তুলিতে সাহস পাইতেন না।

একদিবস রজনীতে নিমাই আহারান্তে শয়ন গৃহে শয়ন করিলেন, গৃহকাজ সমাপন করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ ঘুমাইতেছেন, আর মুখখানি চাঁদের মত শোভা পাইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া শ্রীমুখের শোভা দেখিয়া বিহ্বল হইলেন। তাঁহার হাতে পানের রেকাব। নিমাইর প্রায়শঃই ঘুম হইত না, প্রিয়াজী পতিকে ঘুমাইতে দেখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পাছে বা তাঁহার ঘুম ভাঙ্গে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে চরণতলে বসিয়া নিমাইর শ্রীমুখখানি দর্শন করিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, আমি কত ভাগ্যবতী—এমন ভুবনমোহন স্বামী পাইয়াছি। এমন রূপ কি মানুষের হয়? কোনও রমণী কি কখনও এমন পতি লাভ করিয়াছে?" আবার তখনই তাহার মনে বিষাদের ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই সুখ—এই ভাগ্য আমার আর কয়দিন থাকিবে? পতির যে মনের ভাব, তাহাতে তিনি কি

আর গৃহে থাকিবেন ?—পতি যদি আমাকে ছাড়িয়া যান, তবে জগতে আমার মত দুর্ভাগা রমণীই বা আর কে ?" এইরূপে হর্ষ বিষাদ হৃদয় লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া কখনও পতির মুখচন্দ্র কখনও বা শ্রীচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা চরণ সম্বাহন করেন, কিন্তু তাঁহার শীতল হস্তের স্পর্শে যদি নিমাইর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে নিজের বস্ত্রে হাতখানি গরম করিয়া লইলেন এবং অতি ধীরে ধীরে শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াই আনন্দে বিহ্বল হইলেন। পরে ধীরে ধীরে ও ভয়ে ভয়ে পা-দুখানি উঠাইতে লাগিলেন—ভয় পাছে বা পতির নিদ্রাভঙ্গ হয়। পতির মুখের দিকে মৃদুহাস্যে অথচ ঈষৎ ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিলেন নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। তখন ধীরে ধীরে প্রাণবল্লভের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিজের সম্ভোগেচ্ছা বিন্দুমাত্রও ছিল না। তাঁহার পতির সুখেই তাঁহার সুখ। শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি পতির শ্রীমুখখানি দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ত্রিভুবনে এমন সুন্দর এমন মধুর জিনিস বুঝি আর নাই। তাঁহার দেহ আনন্দে পুলকিত হইল, শ্রীঅঙ্গখানি আনন্দবেগে কাঁপিলে লাগিল, আর মনে হইল, "হায় এ ভাগ্য আমার আর কতদিন থাকিবে" এই সুখের মধ্যেও দুঃখের ভাবনা আসিয়া প্রিয়াজীর হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। তাঁহার নয়নযুগল জলপূর্ণ হইল। দুই ফোটা উষ্ণ জল নীরবে গণ্ড বহিয়া নিমাইর শ্রীচরণে পতিত হইল। নিমাই নয়ন মেলিয়া দেখিলেন পদপ্রান্তে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি তাঁহার চরণযুগল বুকে লইয়া

অঝোরনয়নে নীরবে রোদন করিতেছেন। নিমাই ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন, প্রিয়াজীকে হাত ধরিয়া উরুর উপরে বসাইয়া বলিলেন,—তুমি কখন এসেছ, আমাকে ডাক নাই কেন? ও কি? তোমার চক্ষে জল কেন? হয়েছে কি? তোমাকে আমি প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসি, তোমার নয়ন-জল দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

পতির এই সোহাগে ও সোহাগমাখা মধুর বাক্যে প্রিয়াজীর ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার নয়নধারা শতমুখী জাহ্নবী ধারার ন্যায় বহিতে লাগিল। *

দু নয়নে ঝরে নীর ভিজিল হিয়ার চির
চরণ বহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে উঠে প্রভু আচম্বিতে
বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে পতি পারা॥
মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি কান্দ কি কারণে জানি
কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া উরুর পরে চিবুক দক্ষিণ করে
পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥
কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিতে বিদরে হিয়া
কহিলে না কহে কিছু বাণী।
অন্তরে গুমরে প্রাণ দেহে নাহি সম্বিধান
নয়নে গলয়ে মাত্র পানি॥
পুনঃপুনঃ পুছে পঁহু উত্তর না দেয় তভু
কান্দে মাত্র চরণ ধরিয়া।

নিমাইসুন্দর আরও ব্যস্ত হইয়া নিজের বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা প্রিয়াজীর নয়নজল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন আর পুনঃপুনঃ নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রিয়াজীর চিত্তের আবেগ একটুকু প্রশমিত হইল।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের আকুলতা দেখিয়া কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। মুখের কথা বলিতে গিয়া হৃদয় দমিয়া গেল। তিনি আকুলনয়নে নিমাইর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

নিমাই বলিলেন—প্রাণাধিকে, তুমি জান না, আমি তোমায় কত ভালবাসি। তোমার এই ম্লানমুখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। প্রিয়ে, তুমি এমন হইলে কেন? মনের কথা খুলিয়া বল।”

প্রিয়াজী তখন হৃদয়ের আবেগে চাপা দিয়া দুঃখে ও অভিমানে বলিলেন—আপনি চিরসুন্দর, ভুবনমোহন, আর আমি অতি কুরূপা,—আপনি আমায় ভালবাসেন? আপনি মহাপণ্ডিত, পরম যশস্বী,—আর আমি জ্ঞানহীনা অবলা ও অধমা। আপনি আমায়

প্রভু সর্ব্ব কলা জানে পুছে নানা বিধানে
অঙ্গবাসে নয়ন পুছাঞা॥
নানারঙ্গ পরস্তাব করিয়া বাড়ায় ভার
সে কথায় পাষাণ মঞ্জরে॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ভালবাসেন—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিব? যদি ভালই বাসিবেন, তবে অকুলপাথারে ভাসাইয়া যাইবেন কেন? আমি এতই কি অপরাধিনী?”

বলিতে বলিতে প্রিয়াজীর নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, একটীর পর একটি অশ্রুবিন্দু আসিয়া তাঁহার আরক্তিম গণ্ড প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

নিমাইসুন্দরের হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল ও প্রীতিমাখা। প্রিয়াজীর কোমলকরুণ মুখমণ্ডলে দুঃখের নয়নজল দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল, তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—“প্রাণাধিকে, আমি তোমার কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমি তোমার প্রেমে চিরবাঁধা, তোমাকে ছাড়িয়া কোথা যাইব। তুমি আমায় সেরূপ খল কপট বা স্বার্থপর মনে করিও না।

প্রিয়াজী। ছি, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? আপনি দেব-দেব, লোকে আপনাকে স্বয়ং ভগবান্ জানিয়া পূজা করে। আপনাকে আমি খল কপট মনে করিব? আমি নিজে দুর্ভাগা, আমার নিজের অদৃষ্ট স্মরণ করিয়াই কাঁদিতেছি। আমি যাহা শুনিতেছি, তাহা যদি সত্য হয় তবে বুঝিব—মাতৃবধ ও স্ত্রীবধ করাই নদীয়ার পণ্ডিতের মহাধর্ম্ম।

নিমাই। সে কি প্রিয়ে, তোমার এ কথার অর্থ কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রাণেশ্বর, আমিই না হয়, আপনার নিকট মহাপাপিনী, কিন্তু বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর কি অপরাধ? তাঁহার উপায় কি হইবে?

নিমাইর নয়নে জলবিন্দু দেখা দিল। তিনি দেখিলেন, প্রিয়াজী অতি দুঃখে ও অভিমানে মনের বেগে চাপা দিয়া এক একটি দুঃখের কথা বলিতেছেন। তিনি প্রিয়াজীর চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, প্রাণেশ্বরি, স্পষ্ট করিয়া বল লোকের মুখে কি শুনিয়াছ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। হৃদয়েশ্বর, যখন আপনি আমার মুখ হইতে দারুণ কথা বাহির করিতে জেদ করিতেছেন, যাহা শুনিয়াছি তাহা, বলিতেই হইবে। আমি আপনার চরণদাসী, আপনার কথায় সকলি করিতে পারি কিন্তু ঐ কথা মুখে আনিতে পারিতেছি না, কিন্তু আপনার আদেশ, কাজেই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি,—শুনিয়াছি, আপনি নাকি আমাদিগকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিবেন? হৃদয়বল্লভ, আমার মাথায় হাত দিয়া বলুন—সত্যসত্যই কি আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন? এ কথা শুনিবার আগে আমার মাথায় আকাশের বজর ভাঙ্গিয়া পড়িল না কেন? এ কথা সত্য হইলে আমি আগুনে প্রবেশ করিব, বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। আমার এই বেশবিন্যাস জীবন যৌবন সকলই আপনার চরণসেবার জন্য।

আপনি সন্ন্যাসী হইবেন, সন্ন্যাসী হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকিবেন, শীতবর্ষা ও রৌদ্র আপনার ঐ সুকোমল শ্রীঅঙ্গের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, আর আমি অভাগিনী ঘরে বসিয়া থাকিব, এ কথা মনে করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আপনার ঐ চরণযুগল শিরীষফুলের ন্যায় কোমল,

আপনি যখন আঙ্গিনায় বিচরণ করেন, তখন আমার মনে হয় যেন চরণ হইতে রক্ত ফুটিয়া বাহির হইবে, আর আপনি সেই চরণে অরণ্যের পথে বিচরণ করিবেন, ইহা মনে করিলেও প্রাণ ফাঁটিয়া যায়। অল্প একটুকু আয়াস হইলেই আপনার শ্রীমুখ-মণ্ডলে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দেয়, আপনি কি করিয়া সন্ন্যাসের ক্লেশ সহ্য করিবেন—আর আমিই বা কি করিয়া ঘরে থাকিব? এ অধীনা আপনারই চরণদাসী, আপনার চরণ বিনা আর কিছুই জানি না, এ দাসীকেই বা কাহার কাছে ফেলিয়া যাইবেন? আমার কথা না ভাবিতেও পারেন কিন্তু বৃদ্ধা আধমরা মাকে কি করিয়া ছাড়িয়া যাইবেন? মুরারি মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণকেই বা কি করিয়া ছাড়িয়া যাইবেন, তাঁহাদের প্রতি যে স্নেহমমতা ছিল, তাহাও কি পরিত্যাগ করিবেন? আপনি নদীয়া শূন্য করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন ইহা কে সহ্য করিতে পারে? *

শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোকমুখে শুনি ইহা বিদারিতে চাহে হিয়া
আগুনেতে প্রবেশিব আমি॥
তো লাগি জীবনধন রূপ নবযৌবন
বেশ-বিন্যাস-ভাব-কলা।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে কি কাজ এ ছার জীবে
হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বালা॥

এই বলিয়া প্রিয়াজী অঝোরনয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। নিমাই সুন্দর মনের ভাব গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন—প্রাণাধিকে, আজ এই সুখসম্মিলনের দিনে তোমার একি অনর্থক শোক? কে তোমায় বলিল, আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইব, অনর্থক কাঁদিতেছ কেন, যদি কখনও কোথাও যাই, তোমায় না বলিয়া যাইব না, নিশ্চিন্ত থাক।"

এই বলিয়া করুণহৃদয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়াজীর নয়নযুগল নিজ বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া নানাপ্রকার কৌতুকজনক কথায় ও ভাবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বাণী প্রভু গৌর গুণমণি
হাসিয়া তুলিয়া লইল কোলে।
বসনে মুছায় মুখ করে নানা কৌতুক
"মিছা শোক না করিহ" বোলে॥

আমা হেন ভাগ্যবতী নাহি কোন যুবতী
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ।
বড় প্রীতি আশা ছিল, দেহ প্রাণ সমর্পিল,
এ নব যৌবনে দিল হাথ।
ধিক্ রহু মোর দেহে এক নিবেদন তোহে
কেমনে হাটিয়া যাবে পথে।
শিরীষ কুসুম যেন সুকোমল চরণ
পরশিতে ডর লাগে যাতে॥

আমি তোরে ছাড়িঞা সন্ন্যাস করিব গিয়া
এ কথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সে করি যবে তোমাকে কহিব তবে
এখন না মর মিছে শোকে॥

রসময় শ্রীগৌরসুন্দর এই বলিয়া প্রিয়াজীকে কোলে তুলিয়া লইলেন, আদরে চুম্বন করিলেন, নানাপ্রকার রসকৌতুকে তাঁহাকে অনন্ত আনন্দরসাস্বাদ প্রদান করিয়া বিহ্বল করিয়া তুলিলেন। অমরকবি শ্রীল লোচনদাস লিখিয়াছেন ঃ—

ইহা বলি গৌরহরি আশ্লেষ চুম্বন করি
নানারসে কৌতুক বিহারে।
অনন্ত বিনোদ ক্রীড়া লীলা লাবণ্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিল প্রকারে॥

শ্রীভগবানের ভাব অনন্ত এবং উহা চিন্তার অতীত। তিনি এই যে কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তিনি এই যে

ভুমেতে দাঁড়াও যবে ডরে প্রাণ হানে তবে
সিঞ্চিয়া পড়য়ে সর্ব্ব গায়।
অরণ্য কণ্টক বনে কোথা যাবে কোন্ স্থানে
কেমনে হাটিবে রাঙ্গা পায়॥
সুধাময় মুখ ইন্দু তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু
অলপে আয়াসে মাত্র দেখি।
বরিষা বাদল বেলা চলি বা বিষম ঘরা
সন্ন্যাস করয়ে মহা দুখী॥

গোপীভাবে বিভোর—এই ভাবের মধ্যেও তিনি রসরাজবেশে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিনোদ-বিলাস-রসে মজ্জিত হইয়া তাঁহাকে যে প্রেমানন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীবৃন্দাবনের রসকেলী-কলাপরায়ণাদেরও অজ্ঞাত।

এই রস-কেলি-বিলাসে রজনী প্রায় অবসান হইল। প্রিয়াজীর সুখের নিশিরও অবসান হইল। তিনি নিশিশেষে নিমাইসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যদিও বাহিরে শ্রীমুখমণ্ডলে রসের ভাব প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়নযুগলের মধ্য হইতে যেন রোদনের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে — কি যেন এক বিষাদের বিষম ভাব এই আমোদ ও আনন্দের মধ্য হইতে গোপনে গোপনে বাহির হইতেছে। এই নিদারুণ ভাব দেখিয়া প্রিয়াজী আবার আকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের হাতখানি কোমল করে তুলিয়া বুকে ধরিয়া বলিলেন—"আমার হৃদয়ের অধীশ্বর, প্রাণবল্লভ, আপনার মনের কথা আমায় সত্য করিয়া

তোমার চরণ বিনি আর কিছু নাহি জানি
আমারে ফেলাহ কার ঠাঞি।
ধর্ম্ম ভয় নাহি তোমা শচী বৃদ্ধ আধ মরা
কেমনে ছাড়িবে হেন মায়।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত, তোমার ভকত সব,
শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
অদ্বৈত আচার্য্য আদি, ছাড়িয়া কি কার্য্য সাধি,
কেনে তুমি করিবে সন্ন্যাস॥ শ্রীচৈতন্য মঙ্গল

বলুন, আপনার মুখখানি দেখিয়া আমার প্রাণ শুখাইয়া গেল, নিশ্চয় করিয়া বলুন আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আপনার ভাবগতি দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। আমি বালিকা, বুদ্ধিহীনা কিন্তু আপনার ঐ নয়নযুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে নিশ্চয়ই আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, আমার মনের দিকে চাহিয়া আপনি কেবল মিছে সান্ত্বনা দিতেছেন।

নিমাই চমকিয়া বলিলেন,—সে কি, তুমি কি করিয়া বুঝিলে যে আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইব?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি করিরা বুঝিলাম, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার ভাবগতিতে বোধ হইতেছে আপনি অগোচরে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন। কেবল আমাদের যাতনার ভয়ে আপনি মনের কথা গোপন করিতেছেন। আপনি স্বাধীন, পরবশ নহেন, আপনার কার্য্যে কে বাধা দিবে? গোপনে প্রয়োজন কি? মনের ভাব খুলিয়া বলুন, কপাল ভাঙ্গিয়াছে বুঝিয়াছি। আপনি বুকে বজর মারিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহাতে যদি দোষ না হয় তবে সে কথা বলিতেই কি দোষ? মনের ভাব নিশ্চয় করিয়া বলুন, বুকের উপরে বজ্র ঝুলাইয়া রাখায় যত আশঙ্কা ও যাতনা, সহসা বজ্রের আঘাত সে যাতনা অপেক্ষা অনেক ভাল।*

---

* প্রভু কর বুকে দিয়া পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
মিছা না বলিহ মোর পুরে।
হেন অনুমান করি যত কহ সে চাতুরী
পলাইবে মোর অগোচরে॥

নিমাই দেখিলেন, আর গোপন করা চলিবে না। সহসা তাঁহার মুখে ভাবান্তর দেখা দিল। তিনি স্থিরধীরভাবে বলিতে লাগিলেন—দেবি, যদি আমার মনের প্রকৃত কথা জানিতে চাও তবে শোন। যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহাই আমার ইচ্ছা। আবার আমার যাহাতে হিত হয় তোমারও দিনযামিনী সেই কামনা, কি বল প্রিয়তমে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঠিক কথা। ইহাতে আর সন্দেহ কি?

নিমাই। প্রিয়ে একটা কথা বলি শুন, খাটি জ্ঞান না হইলে দুঃখ দূর হয় না, এই জগতে যাহা দেখিতেছ, ইহার কিছুই নিত্য নয়, আমার পিতা ছিলেন, তিনি এখন কোথায়, ভ্রাতা ছিলেন, তিনিই বা কোথায়? তোমার পিতারও পিতা ছিলেন, তিনিই বা কোথায়? এ জগতে কিছুই থাকিবার নয়, রাজার রাজ্যও থাকে না, কাঙ্গালের কুটীরও থাকে না—দেখিতে দেখিতে সকলই চলিয়া যায়। তবে এই সকল অনিত্য পদার্থে প্রীতি করিয়া কাহারও কি হিত হইতে পারে? জগতে শ্রীভগবান্‌ই সত্য নিত্য ও জীবের পরম সুহৃদ্। তাহা ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা,—এ সকল তাঁহারই মায়া। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পত্নী প্রভৃতি সম্বন্ধও মায়ারই

তুমি নিজ বশ প্রভু পরবশ নহ কভু
যে করিবে আপনার সুখে।
সন্ন্যাস করিবে তুমি কি বলিতে পারি আমি
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে॥

খেলা। শ্রীভগবানের চরণ সেবা ভিন্ন জীবের অন্যগতি নাই। এক বিষ্ণু এই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে ভজনা করিলেই জীবের হিতসাধন হয়। ইহাতে তোমার হিত হইবে, আমার হিত হইবে, মাতারও হিত হইরে। সুতরাং মায়িক বিষয় ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভজন কর এবং তোমার নিজ নামের সার্থকতা কর।*

এই বলিয়া নিমাই নীরব হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বজ্রাহতার ন্যায় নিস্পন্দভাবে চিরস্নিগ্ধ প্রিয়তম পতির বাক্য একটী একটী করিয়া

---

* এ বোল শুনিয়া পহু মুচকি হাসিয়া লহু
কহে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া।
কিছু না করিহ চিতে যে কহিয়ে তোর হিতে
সাবধান শুন মন দিয়া॥
জগতে যতেক দেখ মিছা করি সব লেখ
মিছা করি করহ গেয়ান।
মিছা পতি সুত নারী পিতা মাতা যত বলি
পরিণামে কে হয় কাহার॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি আর ত কুটুম্ব নাহি
যত দেখ সব মায়া তার॥
* * * *
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া সার্থক করহ ইহা
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিলুঁ কথা দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥

শুনিলেন, শুনিয়া তিনি স্থির দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নকোণে জলবিন্দু দেখা দিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে উহা শুখাইয়া গেল। মুখখানি প্রথমতঃ আরক্তিম দেখাইতেছিল, পরে সহসা পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিল, পক্কবিম্ব সদৃশ ওষ্ঠযুগল মলিন হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর দেখিলেন, হয়ত বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন, এই মনে করিয়া তাঁহার মুখের নীচ দিয়া নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া হাতের তালু দ্বারা প্রিয়াজীর কপাল ধারণ করিলেন। প্রিয়াজী বলিলেন—প্রাণেশ্বর, সে ভয় নাই, আমি মূর্চ্ছিত হইব না। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া যেন আমি সকল বজ্রই সহিতে পারি ;—সহ্য করাই নারীর ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম হইতে যেন আমার পতন না হয়। এই সংবাদ শুনামাত্রই যখন আমার মরণ হইল না, তখন আর মূর্চ্ছা হইবে না। বুঝিলাম শত কোটি বজ্রাঘাত সহিবার জন্যই বিধাতা আমার সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলি সহিব, কিন্তু প্রাণেশ্বর একটা কথা বলি, বিবাহের রাত্রিতে আমার পায়ে যখন উছট লাগে তখন আমি কত অমঙ্গল গণিয়াছিলাম, তখন আপনি আমায় বলিয়াছিলেন,"অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, এই যে আমি আছি।" আমি সে সান্ত্বনায় ভুলি নাই। মধ্যে মধ্যে সে আশঙ্কা আমার মনে আসিত। এখন সে সান্ত্বনার বুঝি এই ফল ?

নিমাই। প্রিয়ে তোমার কোনও অমঙ্গল হইবে না, আমার মঙ্গলেই তোমার মঙ্গল হইবে। আমার সন্ন্যাসের ফল অমৃতমাখা। ইহাতে বিষ উঠিবে কেন ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি বিষ বুঝি না, অমৃতও বুঝি না। আমি বুঝি সন্ন্যাসে প্রয়োজন কি? সন্ন্যাস তো আমার জন্য! আমি আপনার নিকটে থাকিলে আপনার কৃষ্ণ-প্রেম হইবে না, কৃষ্ণ-ভজন হইবে না। কৃষ্ণভজন জন্য ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করার জন্য আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে—ইহাইতো সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য। তবে তার জন্য আর গোলযোগ কেন? আপনার আদেশ পাইলে আমি অনলে পুড়িয়া মরিতে পারি, গঙ্গায় ডুবিতে পারি, বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি। নারীবধ করাই যদি সন্ন্যাসধর্ম্ম হয়, তবে অতি সহজেই তাহা হইতে পারে। তার জন্য বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করা ও প্রিয়তম ভক্তজনের হৃদয় আঁধার করিয়া চলিয়া যাওয়া কেন? আর যদি প্রত্যক্ষভাবে নারীবধ করা ভাল মনে না করেন, আমি আপনার নিকট হইতে দূর হইলেই তো সকল গোল চুকিয়া যায়। আমাকেই নির্ব্বাসিতা করুন না কেন? শুনিয়াছি প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য রঘুপতি সীতাদেবীকে নির্ব্বাসন দিয়াছিলেন, আপনি কৃষ্ণভজনের জন্য স্বচ্ছন্দে আমাকে যথেচ্ছা রাখিতে পারেন। ধর্ম্মই জীবনের সার। আমি আপনার বিবাহিতা পত্নী, সহধর্ম্মিনী, আমিই যদি আপনার ধর্ম্মের কণ্টক হইলাম, আমাকে দূর করিয়া দিয়াও তো—*

---

* কি কহিব মুক্রি ছার আমি তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিব মোর তরে।
তোমার নিছনি লঞে মরিমু বিষ খেয়ে
সুখে নিবেশহ তুমি ঘরে॥

এই কথা বলিতে না বলিতেই নিমাই নিজ করকমলে প্রিয়াজীর মুখে চাপা দিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্‌গদ্ স্বরে বলিতে লাগিলেন—প্রাণাধিকে অমন কথা মুখে আনিতে নাই। উহা শুনিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। তুমি বুঝিতে পার না কৃষ্ণভজনে আবার সন্ন্যাসের কি প্রয়োজন? কৃষ্ণ-ভজনের উদ্দেশ্য—কৃষ্ণ-প্রেম-লাভ। প্রেমের মূল উৎস—হৃদয়টীকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কেহ কি কখন প্রেমলাভ করিতে পারে? প্রেমময়ি, তুমি আমার প্রেমের মহাশক্তি,—তোমাকে ছাড়িলে আমার প্রেম কোথায়? আমি কি তোমায় ছাড়িতে পারি? না, তোমাকে ছাড়া সম্ভবপর!

মায়িক জগতের এই এক বিড়ম্বনা যে এখানে আসিলে, সকলকেই কিয়ৎ পরিমাণে মুগ্ধ হইতে হয়। তুমি কে তাহা কি ভুলিয়া গেলে, আর আমিইবা কে, কেনই বা এখানে আসিলাম, তাও কি তোমার অবিদিত? আমি জীবের দুঃখে ব্যাকুল হইয়া এবার অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবের হৃদয় শ্রীভগবানের জন্য দ্রব ও ব্যাকুল করিয়া তুলিব। ইহাতে মা ও তুমি আমার সহায় হইবে।* মায়ের ও তোমার রোদনে কাননের পশুপাখীরা পর্য্যন্ত ঝুরিয়া ঝুরিয়া

---

* আপন ঈশ্বর হঞা দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণুপ্রিয়া-পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরিল বুক
চতুর্ভুজ দেখি আচম্বিত॥

আকুল হইবে। তখন আমার প্রতি জীবের দৃষ্টি পড়িবে, তখন তাহারা হরিনাম লইবে। ইহাই আমার সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য।

এ অতি গুহ্যকথা, ইহা আর কাহাকেও বলিও না। কিন্তু একথা সর্ব্বদা তোমার মনেও থাকিবে না, বহুবার ভুল হইবে, আবার বহুবার মনে হইবে। কিন্তু তোমার এই ভুলই জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে,—তোমার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসে জগতের বিষ-বায়ু পরিবর্ত্তিত হইবে, জীবহৃদয়ে বৃন্দাবনের বাতাস বহিবে, তোমার একবিন্দু নয়নজলে জীব-হৃদয়ে ভক্তি-যমুনা উছলিয়া প্রবাহিত হইবে। জীবের জন্য এই নবভাব প্রকাশ করিতে হইবে। আমার স্নেহময়ী জননী ও তুমি ইহাতে কি সহায় হইবে না? আমি মায়ের অনুমতি লইয়াছি, এখন তোমার অনুমতি চাই। আমায় স্বচ্ছন্দে অনুমতি দাও, কি বল, বিষ্ণুপ্রিয়া!

বিষ্ণুপ্রিয়া অবাক্ হইয়া বিস্মিতভাবে নিমাইর কথা শুনিলেন, যেন একটি কথাও বুঝিতে পারিলেন না। এই কথাগুলির কোনও উত্তর না দিয়া নিমাইর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন তিনি যাঁহার কোলে উপবিষ্ট, সে কনক-বিগ্রহ পৃথিবীর মানুষ নহেন, স্বয়ং ভগবান্। তিনিও প্রাকৃত মানবী নহেন, সেই শ্রীভগবানের মহাশক্তি।*

---

* তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুজ দেখিয়া
পতিবুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।
পড়িয়া চরণ তলে কাকুতি মিনতি করে
এক নিবেদন শুন প্রভু॥ (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল)

ক্ষণেকের মধ্যে দেবীর এই ভাব তিরোহিত হইল। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান দূরীভূত হইল, মাধুর্য্যভাব আসিয়া তাঁহার কোমল চিত্তকে আবার আবৃত করিয়া ফেলিল। তিনি বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—প্রাণেশ্বর আমার মনে হইত,—জগতে আমার মত ভাগ্যবতী বুঝি আর কেহই নাই, আমার সমবয়সী মেয়েরা বলিত, বিষ্ণুপ্রিয়ার বরের সৌন্দর্য্যে স্বয়ং মদনও মোহিত হয়, তাঁহার গুণ জগতে অতুল্য, পূর্ব্বজন্মের কত তপস্যার ফলে বিষ্ণুপ্রিয়া এমন স্বামী পাইয়াছে। আমি ঘরে ও ঘাটে পথে সকল স্থানেই আপনার গুণগৌরবের কথা শুনিতে পাইতাম, আর মনে করিতাম আমার মত ভাগ্যবতী রমণী জগতে বুঝি আর কেহ নাই। আমি যদিও আপনার সঙ্গ সতত লাভ করিতে পারি নাই, তথাপি মনে করিতাম, যেন আপনি আমায় ছাড়া নন, যখন সুবিধা হইবে, তখনই আপনার সঙ্গ পাইব। কিন্তু আপনার কথায় আমার সে সাধের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল। তা যাক্। আমার যা হইবার তাই হউক্। কিন্তু আপনি ঘর ছাড়িবেন কেন, মস্তক মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইবেন কেন, গাছতলায় পড়িয়া থাকিবেন কেন, আপনার সোণার অঙ্গে কি ভিক্ষার ঝুলি শোভা পায়, না এই দেহে কৌপীন সাজে? একথা মনে করিতেও প্রাণ ফাটিয়া যায়, আমি আপনাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়া ঘরের বাহির হইতে দিব না।

নিমাই। প্রিয়ে, আমি জানি, তোমার আপনার সুখ-ইচ্ছা নাই, কেবল আমার সুখের জন্যই আমাকে ঘরে রাখিতে তোমার

ইচ্ছা, কিন্তু আমি তোমায় সত্যসত্যই বলিতেছি, ঘরে থাকিলে আমার দুঃখ বই সুখ নাই; আমি কারাক্লেশে গৃহে থাকিব, সংসারে পাগলের ন্যায় বিচরণ করিব, জীবদ্দশাতেও মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিব,—ইহা দেখিয়া তুমি কি সুখী হইতে পারিবে? তাই বলি আমায় স্বচ্ছন্দচিত্তে বিদায় দাও, ইহাতে আমার সুখ হইবে, আমার সুখেই তোমারও সুখ হইবে।

কিন্তু মনে করিওনা যে আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তুমি চিরদিনই আমার, আমিও চিরদিনই তোমার। আমি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া সন্ন্যাস লইয়া জীবদিগকে কাঁদাইব,—কাঁদাইয়া তাহাদের চিত্তদ্রব করিব, সেই দ্রবচিত্ত হরিনামগ্রহণের উপযুক্ত হইবে, তবে তাহারা প্রেমভক্তি পাইবে।

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে এ কাজ তোমার। তুমি সাক্ষাৎ স্নেহরূপিণী,—করুণার মহাশক্তি। তোমার জীবগণের উদ্ধার-সাধন করাই এই সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য,—প্রাণেশ্বরী তুমি ইহাতে আমার সহায় হও। আমি তোমারই প্রীতি ও করুণা লইয়া জীব উদ্ধার করিব। তুমি আমার দিকে চাহিয়া এবং জগতের জীবের দিকে চাহিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে সন্ন্যাসের অনুমতি দাও।

এই বলিয়া নিমাই প্রিয়াজীর হাতে ধরিয়া বলিলেন, "কি বল প্রাণেশ্বরী, তুমি কৃপা করিয়া অনুমতি দাও, দিয়া আমায় মুক্ত কর।"

প্রিয়াজী সজল নয়নে মুখ তুলিলেন,—প্রাণবল্লভের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিতে গিয়াই ঢলিয়া পড়িলেন।

পদকর্ত্তা লিখিয়াছেন—

প্রিয়া-কর করে ধরি অনুমতি মাগিতে
মুরছি পড়ল তছু ঠাঞি।

নিমাই ব্যস্ত হইয়া প্রিয়াজীকে ধরিয়া তুলিলেন, বক্ষে লইলেন। নিমাইর অঙ্গ-স্পর্শে প্রিয়াজী চেতনা পাইয়া বলিলেন "হা প্রাণ-বল্লভ, তুমি কোথায় ?"

নিমাই তাঁহার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, প্রিয়ে এই যে তুমি আমারই কোলে। চিরদিনই এইরূপে আমি তোমায় আপন কোলে স্থান দিয়া আনন্দলাভ করি। এ সুখ আমি কখনও ছাড়িতে পাড়িব না। তোমাতে আমাতে কখনও বিরহ নাই,—এই যে সন্ন্যাস লইতেছি ইহা বিরহ নহে—বিরহের আভাস—এই বিরহ কেবল লোক দেখান মাত্র, কিন্তু তথাপি ইহাতে তোমার বিরহ প্রতীতি হইবে,—তাহা না হইলে জীবের হিত হইবে না। দেবি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমি যখন যেখানে যাই না কেন, আমি চিরদিন তোমার নিকটেই থাকিব, তুমি আমার কথা মনে করিলেই আমাকে দেখিতে পাইবে।*

প্রিয়াজী গদগদকণ্ঠে অশ্রুনয়নে বলিলেন,—নাথ, আপনার

---

* শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তোমারে কহিল ইহা
যখন যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই থাকিব তোমার ঠাঞি
এই সত্য কহিলাম দৃঢ়॥ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

উদ্দেশ্য আপনিই জানেন। আপনি স্বেচ্ছাময় ও দয়াময়। দয়া করিয়া আপনি আমায় দাসীপদের অধিকার দিয়াছিলেন, যেন চিরদিন আমার অই চরণ সেবায় অধিকার থাকে, তাহাতে যেন বঞ্চিত না হই। আপনি জীবের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাস লইবেন, আমি যদি ইহাতে সহায় হইবার অধিকার পাই, তাহা আমার পরম ভাগ্য। যদি এ দাসীর বিরহ-দুঃখে আপনার উদ্দেশ্য সফল হয়, আমি স্বচ্ছন্দে সে দুঃখ গ্রহণ করিব। আপনি জীবের মঙ্গলসাধন করুন, কিন্তু এ দাসীর প্রতি দয়া করিয়া এই করিবেন, যেন মুহূর্ত্তের তরেও আমার চিত্ত আপনার চরণ ছাড়া না হয়।"

নিমাই বলিলেন, প্রিয়ে তোমার এই অনুমতি তোমার উপযুক্তই হইল। তোমার জীব তোমার করুণাতেই পরিত্রাণ লাভ করিবে। আমি স্নেহময়ী জননীর ও তোমার কারুণ্য লইয়াই জীব নিস্তার করিতে সন্ন্যাস লইতেছি। আজ জীবের ভাগ্য প্রসন্ন হইল।" নিমাই একে একে এইরূপে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। বিদায় ও সান্ত্বনার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তিনি উদাসভাব একবারে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি, নয়নকোণে অনুরাগ, বাক্য সরস ও আসক্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যে উদাসী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, এ ভাবই তাঁহার আকার প্রকারে কথাবার্ত্তায় আর প্রকাশ পাইল না।

ভক্তগণ নিমাইর মনের ভাব জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার এই মায়ায় বিহ্বল হইলেন। পুত্রের ব্যবহার দেখিয়া শচীর মনে হইতে লাগিল যে তাঁহার পুত্র যে সন্ন্যাসের অনুমতি লইয়াছেন,

এবং তিনি যে তাঁহাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়াছেন, তাহা বুঝি একটা কুস্বপ্ন মাত্র। নিমাই মায়ের নিকট বসিয়া কত গল্প করেন, মায়ের রন্ধনের কত প্রশংসা করেন, গার্হস্থ্যের কত কথা বলেন, ইহাতে শচীদেবীর আর আনন্দের সীমা নাই, নিমাইর সন্ন্যাসের কথা তিনি যেন অল্পদিনের মধ্যেই একরূপ ভুলিয়া গেলেন। শ্রীপাদ লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে—

মায়ের সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া।
যে কথায় থাকয়ে অন্তর সুস্থ হৈঞা॥
বৈরাগ্য আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি।
ঘরে ঘরে নিজ প্রেম পরকাশ করি॥
নানা আভরণ পরে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
হাস বিলাস রসময় অনুক্ষণ॥

ইহাতে সকলেই বিপরীত বুঝিল—বুঝিল নিমাইর সন্ন্যাস-গ্রহণ-প্রবৃত্তি দূর হইয়াছে, ইহাতে ভক্তগণ বড় আনন্দিত হইলেন।

সবলোক জানিলেক নহিব সন্ন্যাস।
আনন্দ হইল সব লোক নিজদাস॥

নিমাইর আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তগণের হৃদয়ে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল, তাঁহারা বুঝিলেন, নিমাই বুঝি সন্ন্যাসের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, হয়ত সন্ন্যাসগ্রহণ না করাই যুক্তিযুক্ত,—তিনি এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ বুঝিয়া সকলেই একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন।

প্রিয়াজীরও হৃদয়ে শান্তি আসিল। নিমাই তাঁহার সহিত ক্রমেই অধিকতর মেশামেশি করিতে লাগিলেন, অনেক সময় তিনি প্রিয়াজীর নিকটে থাকিতেন, কত সুমধুর সম্ভাষণে তাঁহার হৃদয়ে নব নব রসের সঞ্চার করিতেন, আর প্রিয়াজী সেই রস-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া আপনাকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য-শালিনী বলিয়া মনে করিতেন। অল্পদিনের মধ্যে প্রিয়াজীরও মনে ধারণা হইল যে দয়াময় বুঝি তাঁহার প্রতি নিদয় হইবেন না, সন্ন্যাসের কথাটা তাঁহার নিকটেও স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। ফলতঃ নিমাই সন্ন্যাসের পূর্ব্বে কতিপয় দিবস প্রিয়াজীর প্রতি এমন সোহাগ দেখাইতে লাগিলেন যে সে সোহাগ-ভরে প্রিয়াজী একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহার সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল। এস্থলে এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা শ্রীপাদ লোচনদাসের গ্রন্থ হইতে বিবৃত করা যাইতেছে।

এক দিবস রজনীতে নিমাই শয়নমন্দিরে প্রফুল্ল ও সরসচিত্তে শয়ন করিলেন। প্রিয়াজী তাম্বুলের স্তবক হাতে লইয়া পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় শয়নমন্দিরে যাইতে না যাইতেই নিমাই উঠিয়া বসিয়া মৃদুমধুর হাসিয়া বলিলেন—হৃদয় সখি, এসেছ, এস এস, আমি এত-ক্ষণ তোমাকেই ভাবিতেছিলাম।

প্রিয়াজী। সে আমার পরমভাগ্য।

এই বলিয়া নিমাইর বদনকমলে প্রিয়াজী একটি তাম্বুল তুলিয়া দিলেন।

নিমাই প্রিয়াজীর হাত ধরিয়া তাহাকে আপন কোলে টানিয়া

লইলেন এবং মনের সাধে আনন্দলীলারসময় নিমাইসুন্দর প্রিয়াজীকে সাজাইতে লাগিলেন যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গবেশ করেন আপনি॥
দীর্ঘকেশ—কামের চামর যিনি আভা।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর আভা॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন-বিন্দু আর।
শশিকোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার॥
খঞ্জন নয়নে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম কামানের গুণ করিলেক॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষণ তাঁহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার॥

নিমাই প্রিয়াজীকে নিজহাতে এইরূপ সজ্জিত করিযা অনিমিক্ দৃষ্টিতে তাঁহার ত্রৈলোক্যমোহন মুখখানির দিকে সতৃষ্ণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রিয়াজী হাসিয়া বলিলেন,—এ কি, এ দাসীর প্রতি এত কৃপা? আপনার ভুবনমোহন শ্রীচরণের নিকটস্থ হইতেই আমি লজ্জা বোধ করি। গুণে বা রূপে আমি কিছুতেই আপনার যোগ্যা নহি।

নিমাই মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যোগ্যা কি অযোগ্যা এই দেখ," এই বলিয়া প্রিয়াজীর শ্রীমুখকমলে সোহাগভরে নিমাইসুন্দর চুম্বন

করিয়া তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া নিস্পন্দ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, প্রিয়াজী আনন্দে বিবশা হইয়া বলিলেন,—নাথ, আমি কোথায় আছি? এ কি সুখ না দুঃখ, এ কি বিষ না অমৃত, আমি চেতন কি অচেতন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় দৃঢ় করিয়া ধরুন।" নিমাই আনন্দবিবশা প্রিয়াজীকে শয্যায় শোয়াইয়া তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কত রস-কেলি-বিনোদে তাঁহার প্রতি সোহাগ ও আদর দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপ আনন্দ-বিবশভাবে রজনী-শেষে প্রিয়াজীর প্রগাঢ় নিদ্রা হইল।

নিমাইসুন্দর প্রিয়াজীর সেই ঘুমন্ত মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিতে পারিলেন না, তাঁহার পদ্মপলাশবৎ ঢল ঢল নয়ন অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। দুই বিন্দু প্রতপ্ত অশ্রু নিমাইর গণ্ড বহিয়া প্রিয়াজীর আনন্দ-মাখা গণ্ডস্থলে গড়াইয়া পড়িল। নিমাই চাহিয়া দেখিলেন কপালে চন্দনবিন্দুমণ্ডলির মধ্যস্থিত সিন্দুর বিন্দু তেমনি রহিয়াছে, সরল সুন্দর মুখখানি হইতে যেন অনন্তমাধুর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

নিমাইর হৃদয় স্তম্ভিত হইল;—তাঁহার বহুদিনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হৃদয় ক্ষণেকের তরে শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি অতি সন্তর্পণে নিজের নয়নজল সম্বরণ করিলেন, জীবের অনন্ত দুঃখের কথা তাঁহার মনে উদিত হইয়া আবার তাঁহার চিত্তকে সবল করিয়া তুলিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—দেবী এখন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিতা। এই উপযুক্ত সময়। ধীরে ধীরে প্রিয়াজীর গলদেশের নিম্ন হইতে

আপন হাত টানিয়া লইলেন। প্রিয়াজীর পা খানি নিজের অঙ্গ হইতে নামাইয়া পাশবালিশের উপরে প্রিয়াজীর বামহাত ও বাম পা খানি আস্তে আস্তে রাখিলেন। ধীরে ধীরে নিদ্রিতা প্রিয়াজীর গণ্ডে শেষ চুম্বন দিয়া আবার সতৃষ্ণনেত্রে তাঁহার মুখপানে তাকাইলেন, নিমাইর নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, তিনি নিজহাতে তাহা মুছিয়া লইলেন, ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্ক হইতে নামিলেন, ধীরে ধীরে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন, জননীর শয়ন গৃহের সম্মুখে যাইয়া জননীকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিলেন, ঠাকুর মন্দিরে প্রণাম করিয়া নিমাই ঘরের বাহির হইলেন। নিমাই দ্রুতবেগে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন, দুই কর জুড়িয়া জাহ্নবী ও নবদ্বীপকে প্রণাম করিলেন। মাঘের দারুণ শীত, তাহাতে শেষ রাত্রি। দেহের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিমাই শৈশব হইতে সন্তরণপটু ছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই গঙ্গার পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া সেই ভীষণ শীতে আদ্রবস্ত্রে কাটোয়া অভিমুখে ধাবিত হইলেন।*

---

* শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গসুন্দর উঠিল রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস, ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া, মন্দির ত্যজিয়া, আইলা সুরধনীতীরে।
দুই কর জুড়ি, নমস্কার করি, পরশ করিল নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি, কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন শুনি সবজন, বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন সেহ শুনি গলি যায়।
পশুপাখী ঝুরে গলয়ে পাথরে এ দাস লোচন গায়॥

কিয়ৎক্ষণপরে প্রিয়াজীর সুখনিদ্রা ভাঙ্গিল, তিনি চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের ভুজপাশে আবদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রিত ছিলেন, জাগিয়া দেখিলেন সে ভুজ-বন্ধন নাই। গৃহের প্রদীপটী জ্বলিতে জ্বলিতে নিভিয়া গিয়াছে, অথবা নিমাই নিজেই ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া নিজেই ঘর অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অথবা নদীয়ার চাঁদ যখন নদীয়া আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আর বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমন্দির প্রদীপ জ্বলে কেন,—ভাবিয়া স্বয়ং বিধাতাই বুঝি প্রদীপটী নির্ব্বাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রিয়াজী পালঙ্কে হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ পাইলেন না, অবশেষে "প্রাণেশ্বর, আপনি কোথায়, আমি একাকিনী ভয় পাইতেছি, সত্বরে শয্যায় আসুন।" এই বলিয়া মৃদুস্বরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন, কোথাও প্রত্যুত্তর পাইলেন না। পালঙ্ক হইতে নামিয়া দরজার নিকট চাহিয়া দেখিলেন, কপাট খোলা, অথচ দরজাটী টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে ঘর হইতে বাহির হইলেন, আঙ্গিনায় আসিয়া ইতি উতি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কোথাও সাড়া পাইলেন না।

তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই, মাঘের প্রভাতী শীতের হিমানি পড়িতেছে, প্রিয়াজীর হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার শ্রীঅঙ্গলতিকা ভীষণ আশঙ্কায় কম্পমান হইল। সহসা তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার মনে করিলেন, তিনি

কি কোন কার্য্যে কোথাও গিয়াছেন? আবার মনে করিলেন, তাঁহার এমন কি কার্য্য আছে, যে এত প্রত্যুষে কোথাও যাইবেন? তিনি আমায় না বলিয়া এত প্রত্যুষে কোথাও যাইবেন, এমন তো মনে হয় না। তবে কি সত্য সত্যই আমার কপাল ভাঙ্গিল? তিনি কি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন? কিন্তু তাই বা কি করিয়া বলি। তিনি কতিপয় দিবস আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, যেরূপ প্রীতিরস দেখাইয়াছেন, এমন কি গতরাত্রিতে যেরূপ রসকেলিতে আমায় মুগ্ধ করিয়াছেন· তিনি কি আমায় ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিবেন? ইহাওকি সম্ভব?"

এইরূপ ভাবনা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে আশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন সত্য সত্যই .তাঁহার প্রাণবল্লভ তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তখন কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শচীদেবীর শয়ন গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন* দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন মা, মা শীঘ্র উঠুন"।

---

* হেথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায় হাত
প্রভু না দেখিয়া, উঠিল কান্দিয়া,
শিরে মারে ঘাত॥
মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী,
জাগিল প্রভুরে নিয়া।
প্রেমেতে বাঁধিয়া নিদ্রামোরে দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া॥

শচী। কে ও বউ মা, কেন মা, কি হয়েছে! নিমাই ভাল আছে তো?

এই বলিয়া শচী প্রদীপ জ্বালিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন, আসিয়া দেখেন,—বউমা শিরে করাঘাত করিতেছেন আর কাঁদিয়া বলিতেছেন "হায় হায় আমার একি হইল, আমায় ফেলিয়া কোথায় গেল।"

প্রিয়াজীর বিলাপ শুনামাত্রই বৃদ্ধাশচীদেবী বুঝিতে পারিলেন নিমাই ঘরের বাহির হইয়াছেন। তিনি কাতরকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতে লাগিলেন "নিমাই—নিমাই,—ও নিমাই," প্রতি ডাকেই যেন প্রতিধ্বনি হইল—নাই,—নাই,—নাই। শচীদেবী তখন ঢলিয়া পড়িলেন, মূর্চ্ছিত হইলেন, আবার চেতনা পাইয়া রাজপথে বাহির হইয়া "নিমাই নিমাই" রবে চারিদিক আকুল করিয়া তুলিলেন। বাসু ঘোষ প্রত্যক্ষ এই দশা জানিয়া নিম্নলিখিত পদাবলী রচনা করিয়াছেন—

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু কেশে ধায় বসন না রয় গায়,
শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥

তুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি,
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূসাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে,
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া।
শুনিয়া নদিয়ার লোকে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে ধায়, দশজন পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা ?
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহিসাথে,
কাঞ্চননগর পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি, আমার গৌরাঙ্গ-হরি,
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়।

বৃদ্ধা শচীদেবীর বিলাপ শুনিয়া প্রতিবাসীরা জাগিয়া উঠিলেন। কেহ গঙ্গাতীরে, কেহ রাজপথে, কেহ বা ভক্তগণের আলয়ে নিমাইর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও নিমাইর সন্ধান পাওয়া গেল না। ভক্তগণ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন, স্নানান্তে নিমাইর চরণ দর্শন করিতে আসিতেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই চারিদিকে সংবাদ রটিল, নিমাই রাত্রিশেষে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

নিতাই শ্রীবাস ও বাসু ঘোষ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ বার্ত্তা শুনিয়া দৌড়িয়া শচীদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন শচী ও প্রিয়াজী করাঘাত করিয়া কাঁদিতেছেন আর ধূলায়

লুটাইতেছেন, ভক্তগণকে দেখিয়া তাঁহাদের শোকবেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। শচী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—তোমরা যেখানে পাও, আমার নিমাইকে আনিয়া দাও, আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও, নিমাইকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্ত প্রাণ ধরিতে পারিব না।

বাসু ঘোষ স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়া লিখিয়াছেন—

সকল মহন্ত মিলি সকালে সিনান করি
আইলা গৌরাঙ্গ দেখিবার।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র কে শিখায় কোন তন্ত্র
কি হৈল কিছুই না জানি॥
গৃহমাঝে শুয়েছিনু ভাল মন্দ না জানিনু
কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরালি কৈল পাথারে ভাসায়ে গেল
রহিব কাহার মুখ চাঞা॥
বাসুদেবঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা
মরা হেন রহিল পড়িঞা।
শিরে করাঘাত মারি ঈশানে দেখায় ঠারি
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥

বাসু ঘোষের পদে শচীমাতার যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে,

তাহা পাঠ করিলে অতিবড় কঠোর লোকেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পদটী এই—

পড়িল ধরণীতলে শোকে শচীদেবী বোলে
লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল
সোণার পুতুলি গোরা রায়ে॥
অঙ্গুরী অঙ্গদবালা গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা
খাট পাট সোণার ছলিচা।
সে সব রয়েছে পড়ি, নিমাই গিয়াছে ছাড়ি
মুঞি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা।
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল নদীয়া আধার হৈল
ছট্ ফট্ করে মোর হিয়া
যোগিনী হইয়া যাব যথায় গৌরাঙ্গ পাব
কান্দিব তার গলায় ধরিয়া॥
যে মোরে নিমাই দেবে মূল্য করি কিনে নিবে
হব মুঞি তার দাসের দাসী।
বাসুদেব ঘোষ ভণে শচী কান্দে অকারণে
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী॥

নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রিয় পার্শ্বদগণ এই সংবাদ শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় হইলেন, কিন্তু তাঁহারা শচীর সাক্ষাতে তাঁহাদের মনের ক্লেশ প্রকাশ করিলেন না। অপরপক্ষে শচীমাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"ইহার জন্য ব্যস্ত কেন?

আমরাও এই ঘরের বাহির হইলাম, নিমাই যাবে কোথা। যেখানে পাই, সেখান হইতেই নিমাইকে লইয়া আসিব। আপনি অধীর হইবেন না।”

ভক্তগণ যদিও শচীমাতাকে প্রবোধ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িল। প্রিয়াজীর আর্ত্তনাদময় বিলাপ শুনিয়া সকলেই অধিকতর আকুল হইলেন। নিমাই কোথায় গিয়াছেন, কোন্ দিকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে সকলের মনেই এই ভাবনার উদয় হইল।

শচীমাতা ও প্রিয়াজীকে সান্ত্বনা দিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত নিত্যানন্দ বাহিরে আসিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে, সকল স্থানেই তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে হইবে, সকল স্থানেরই পরিচয় আমি জানি। আমি এই শূন্য নদীয়ায় আর এক মুহূর্ত্তও থাকিব না। এখানে আমার এখন আর কোনও বন্ধন নাই, যে বন্ধন ছিল তাহা চলিয়া গিয়াছে, যদি পারি তবে নিমাইকে লইয়া ফিরিব, শচীমাতার নিকট যে কথা দিয়াছি, তাহা রক্ষা করিব, নতুবা চিরদিনের জন্য আমিও তোমাদের নিকট বিদায় লইলাম। তোমরা শচীমাতা ও বধূমাতাকে দেখিও।

ইহাতে ভক্তগণ আকুল হইয়া বলিলেন, আমরাই বা এই শূন্য নদীয়ায় থাকিব কেন? সংসারের সুখে আগুন দিয়া ঘরের বাহির হইব, বাহির হইয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইব।

নিতাই বলিলেন, এখন কাহাকেও বহুদূর যাইতে হইবে না,

আমার বিশ্বাস তিনি কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট গিয়াছেন। কেশব ভারতীর নিকট মধ্যে মধ্যে তিনি গোপনে গোপনে কি পরামর্শ করিতেন। খুব সম্ভব তিনি কাটোয়ায় গিয়াছেন। আর যদি সেখানে না পাই, তবে সমগ্র ভারতবর্ষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমি তাঁহাকে বাহির করিবই করিব। আমি এখনই কাটোয়ায় চলিলাম। দুই চারিজন সুবিজ্ঞ ও সুধীর লোক আমার সঙ্গে যাইতে পারেন, কেন না তাঁহাকে কাটোয়া হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।"

অনেকেই যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু শ্রীবাস বলিলেন, "নদীয়া ছাড়িয়া এখন কোন ক্রমেই সকলের যাওয়া উচিত নয়। শচীদেবী ও প্রিয়াজীর নিকট সর্ব্বদার তরে লোক রাখিতে হইবে, বলিতে কি তাঁহারা জ্ঞান হারা হইয়াছেন, যে কোন মুহূর্ত্তে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে পারেন। আমি কতিপয় লোক সহ তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব, সান্ত্বনা দিব।"

তখন পরামর্শক্রমে বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, প্রভুর মেসো, চন্দ্রশেখর ও দামোদর পণ্ডিত নিমাইর সহিত তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।*

---

* চন্দ্রশেখর আচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিলা সত্বর॥
এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার-হৃদয়॥

৪

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গা পার হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় কাটোয়া অভিমুখে ধাবিত হইলেন, পরিধানে একখানি আর্দ্রবস্ত্র,—মাঘের দারুণ শীত—তাহাতে প্রভাতকাল, কিন্তু তাঁহার সে বোধ নাই, তিনি উন্মত্তের ন্যায় অতি অল্পকালের মধ্যে কাটোয়ায় সুরধুনী তীরে বটবৃক্ষমূলে কেশব ভারতীর আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন ভারতী গোঁসাই আশ্রমেই :আছেন। নিমাইর প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি ভক্তিভরে ভারতীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া বলিলেন—দয়াময় আমাকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করুন। *

ভারতীর সহিত যদিও নিমাইর পরিচয় ছিল, কিন্তু সহসা সেই কনক-গৌর সুদীর্ঘ শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া ভারতী যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। তখন নিমাই তাঁহার পরিচয় দিলেন এবং ভারতী যে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করাইয়া দিলেন। নিমাই বলিলেন,—গোঁসাই, নবদ্বীপে আপনি আমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছিলেন, তখন আমি আপনার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিব বলিয়া প্রার্থনা করি। আপনি বলিয়াছিলেন, যথাসময়ে সন্ন্যাস দিবেন, এখন সেই সময় উপস্থিত। আপনি কৃপা করিয়া আমায় ভবসাগর হইতে ত্রাণ করুন।”

---

* কাঞ্চননগরে গেলা দ্বিজ বিশ্বম্ভর।
যে বাসে বসিয়া আছে সেই সন্ন্যাসিবর॥

ভারতীর পূর্ব্ব কথা মনে হইল, তিনি মহাশঙ্কটে পড়িলেন। নিমাইর কথার প্রকৃত উত্তর দিয়া তিনি বলিলেন, বাবা তুমি এখানে বসিয়া বিশ্রাম কর, তার পরে এ বিষয়ে তোমার কথা শুনিব।”

নিমাই সুরধূনীতীরে বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তখন বেলা হইয়াছে। এই ঘাটে বহুলোকজনের সমাগত হইত। অগণ্য নরনারী শ্রীগৌরাঙ্গের কনককান্তি রূপচ্ছটা ও অঙ্গলাবণ্য ও শ্রীমুখের চাহনি দেখিয়া সতৃষ্ণনেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলন। গঙ্গাঘাটে বিপুল জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এই পুরুষটী কে,—কেনই বা ভারতীর আশ্রমে ইনি আসিয়াছেন, সকলেরই ইহা জানিবার ইচ্ছা হইল। প্রাচীন ও প্রবীণ পুরুষ ও রমণীগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রভু নমস্কার করে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সন্ন্যাসী নারায়ণ স্মরে॥
কোথা হতে এলে তুমি যাবে কোথা কারে।
কি নাম তোমার সত্য কহত আমারে॥
প্রভু কহে শুন গুরু ভারতী গোসাঞি।
কৃপা করি নাম মোর রেখেছে নিমাই॥
বসিয়া আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস।
তোমার নিকটে এলাম দেহ ত সন্ন্যাস।
লোচন বলে মোর সাদা প্রাণে ব্যথা পায়।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে এত বড় দায়॥

নিমাই সরলভাবে আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাদের নিকট নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। বাসুঘোষ লিখিয়াছেন ঃ—

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধূনীতীরে তরুছায়া যে সুন্দর॥
তার তলে বসি আছেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি যেন দীপ্ত কলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজপতি জপ ছাড়ে যতি॥
কাঁথে কুম্ভ করি তারা দাঁড়াইয়া রয়।
চলিতে না পারে, সেহ লড়ি হাতে ধায়॥
কেহ বলে হেন নাগর যে না দেশে ছিল।
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
কেহ বলে মা বাপেরে এসেছে বধিয়া॥
কেহ বলে ধন্য মাতা ধরে ছিল গর্ব্ভে।
দৈবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥
কেহ বলে কোন নারী পেয়েছিল পতি।
ত্রৈলোক্যে তাহার সমান নাহি ভাগ্যবতী॥
কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে।
সন্ন্যাসী না হও না মুড়াইও কেশে॥
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা পিতা।
সাধ আছে কৃষ্ণ পদে স'পিব নিজ মাথা॥

নিমাইর কথা শুনিয়া নরনারীমাত্রেই বিচলিত হইলেন। নিমাইর বৃদ্ধা জননী ও যুবতী স্ত্রীর কথা ভাবিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের যাতনা আরও বাড়িয়া উঠিল। তাঁহারা নিমাইকে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, সন্ন্যাস ভিন্নও কৃষ্ণভজন হয়। তুমি মা ও স্ত্রীর হৃদয়ে ছুড়ি বসাইয়া এমন কার্য্য করিতে এসেছ কেন? বাবা ফিরিয়া বাড়ীতে যাও। তুমি সুবোধ ছেলে, এমন কার্য্য কি করিতে আছে?"

নিমাই বলিলেন, "আপনারা আমার মাতাপিতা, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি ভারতী ঠাকুরের কৃপায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি।"

ভারতী ঠাকুর এতক্ষণ উপস্থিত নরনারীগণের বাক্য শুনিতেছিলেন, শুনিয়া শুনিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন,—বাস্তবিকই নিমাইকে সন্ন্যাস দেওয়া হইবে না। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দুইটী অবলা—নিমাইর মাতা ও স্ত্রী, প্রাণে মরিবেন, আমি তাঁহাদের বধের নিমিত্ত-ভাগী কেন হইব? লোকতঃ ও জগতে কলঙ্ক রটিবে যে কেশব ভারতী নিমাইর অশতিবর্ষা বৃদ্ধ মাতার এবং তরুণ বয়স্কা যুবতী ভার্য্যার সর্ব্বনাশ করিল। আমি লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ এই অপযশের ভাগী কিছুতেই হইব না। নিমাইকে বুঝাইয়া বাড়ীতে পাঠাইব, অথবা ধর্ম্মের কথা তুলিয়া উহাকে নিরস্ত করিব। তবে একটা কথা এই যে আমি নিমাইকে যথা সময়ে সন্ন্যাস দিব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। তাহাতেই বা আমার ঠেকা কি? নিমাইর এখন সন্ন্যাসের সময় হয় নাই, [illegible] তাহার মাতাও পত্নীর অনুমতি গ্রহণ করেন নাই আমি এই যুক্তিতে নিমাইকে নিবৃত্ত করিব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ কাটোয়ার উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক হইল, দেখিলেন,—নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত কেশব ভারতীর আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিমাই বলিলেন,—আপনারা আসিয়াছেন, ভাল করিয়াছেন, এখন যাহাতে আমার মনের বাঞ্ছা ফলবতী হয়, আপনারা তাহার সহায় হউন।"

নিত্যানন্দ। আমরা তোমার সাহায্য করিতে আসি নাই,—বাঁধা দিতে আসিয়াছি। তুমি জীবের পরিত্রাণের জন্য নবদ্বীপে যে আগুণ জ্বালিয়া দিয়া আসিয়াছ, কাহার সাধ্য সে জ্বালা সহ্য করে, আমরা তিষ্ঠিতে না পারিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। তুমি স্বতন্ত্র, তাহা আমরা জানি, তুমি দৃঢ় তাহাও আমরা বুঝি। কিন্তু শচীমাতা ও বধূমাতার শোক-সন্তাপে দগ্ধ হইয়া আমরা তোমাকে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছি।

নিমাই। শ্রীপাদ, আর ওকথা তুলিবেন না। আপনারা নিশ্চিন্ত হউন, তাঁহারা এই শোকের মধ্যেও শান্তি পাইবেন।

নিমাইর দৃঢ়তা ও স্থির সঙ্কল্পতাপূর্ণ কথা শুনিয়া আর কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না।

ভারতী বলিলেন, নিমাই এখনও তোমার সন্ন্যাসের সময় হয় নাই।

নিমাই। দয়াময়, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করিব। সেই উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস লইতেছি। মানুষের জীবনের কোন

নিমাই—দয়াময়, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণভজন করিব। সেই উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস লইতেছি। মানুষের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই। কখন কি হয়, বলা যায় না। অকৃতার্থ জীবন লইয়া কি করিব? আপনি দয়া করিয়া আমায় উদ্ধার করুন।

ভারতী। ব্রাহ্মণের চতুরাশ্রম। তুমি গার্হস্থ্যাশ্রমী। তুমি এখন ও সে আশ্রমে কৃতার্থ হও নাই। তোমার এখনও পুত্র সন্তান হয় নাই। তোমার বৃদ্ধা জননী ও স্ত্রী বর্তমানা। আমি তোমায় এ অবস্থায় সন্ন্যাস দিতে পারি না।

নিমাই। কৃপাময়, আপনার সম্মুখে কোন কথা বলিতে আমার সাহস নাই। আমি কেবল আপনার দয়ার ভিখারী। আমার প্রাণ বৃন্দাবনের জন্য কাঁদিতেছে, আমি সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবনে যাইব, সেখানে যাইয়া কৃষ্ণভজন করিব, কৃষ্ণের অন্বেষণ করিব। আমার প্রাণ উতালা হইয়াছে। আমা হইতে আর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম হইবে না।

ভারতী। এ বিষয়ে তোমার জননী ও পত্নীর স্বচ্ছন্দ চিত্তে অনু- অনুমতি দানের আবশ্যক। তাহা ভিন্ন আমি কিছুইতেই তোমার কথায় সম্মত হইতে পারি না।

এই কথা বলিয়া ভারতী নিমাইর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল এই মূর্ত্তিটী মানুষ নহেন। মানুষের দেহে এরূপ জ্যোতি ও লাবণ্য কখন ও সম্ভবে না। তিনি আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমি এরূপ ভাব কখন ও

কোন মানুষে দেখি নাই। ইনি যাহাই হউন, ইনি বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী ভার্য্যা গৃহে রাখিয়া আসিয়াছেন, আমি ইহাকে কিছুতেই সন্ন্যাস দিব না। ভারতী আবার দৃঢ়রূপে বলিলেন—নিমাই আমি তোমাকে বিনয় করিয়া বলি, আমা হইতে এ কার্য্য হইবে না।

চারি দিকে বিপুল জনতা,—সম্পূর্ণ নীরব! কাহার ও মুখে কোন কথা নাই, সকলেরই মুখ ম্লান ও বিষণ্ণ। ইহাঁরা নিমাই ও ভারতীর কথোপকথন শুনিতেছিলেন। যখন সকলেই স্পষ্টতঃই শুনিতে পাইলেন যে ভারতী নিমাইকে সন্ন্যাস দিবেন না, তখন সকলেই প্রফুল্ল মুখে হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ভারতী বলিলেন,—দেখিলে তো কেবল আমার বলিয়া নয়—কাহারও ইচ্ছা নয়, যে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর।

নিমাই। দয়াময়, আপনি যে অনুমতির কথা বলিলেন, আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়াই আপনার স্মরণ গ্রহণ করিয়াছি। ইহার কোনও সন্দেহ নাই। আমার মাতা ও পত্নীর অনুমতি পাইয়াছি।

কাটোয়ার নরনারীগণ নিমাইর এই উক্তি স্পষ্টতঃই শুনিতে পাইলেন—শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মাতা ও পত্নী ইঁহাকে অনুমতি দিয়াছেন, ইহাও কি সম্ভব? কেহ কেহ বলিলেন,—কথাটা সত্য কি? বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তি ইহার উত্তরে বলিলেন, যে সংসারের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে আসিয়াছে, সে কেন মিথ্যা বলিবে? আর এই যে লাবণ্য-সরলতামাখা মধুর মূর্ত্তি, ইহাতে কি মিথ্যাবাক্য সম্ভবপর? কেহ কেহ বলিলেন ইনি কি বলিয়াছেন,

আমরা হয় তো তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাই নাই, মাতা ও পত্নী উঁহাকে অনুমতি দিবেন, ইহাও কি সম্ভবপর ?

ভারতী বিস্মিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—নিমাই পণ্ডিত তোমার মাতা ও পত্নী তোমায় অনুমতি দিয়াছেন, তোমার একথা আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না। তোমাকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, তুমি সাক্ষাৎ সত্যমূর্ত্তি। তোমার অলৌকিক প্রভাবে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহারা কি এখন তোমার বিরহ সহিতে পারিবেন ?

আর একটী কথা এই যে সন্ন্যাস আশ্রম অতি কঠোর আশ্রম। আমি সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে এত কঠোরতা জানিলে কখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতাম না। আমি নিজে ইহাতে জর-জর হইতেছি, তোমার লাবণ্যময় দেহে সন্ন্যাসের ক্লেশ আমি কোন্ প্রাণে অর্পণ করিব। দেখ আমি সন্ন্যাসী, হৃদয়ের কোমল ভাব আমূল তুলিয়া ফেলিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি, তোমার সহিত আমার কোন সম্পার্ক নাই, তথাপি তোমার সন্ন্যাস লওয়ার কথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এ অবস্থায় তোমার বৃদ্ধা জননী ও সতী সাধ্বী প্রণয়িণী পত্নীর যে কি ক্লেশ হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি।

এই যে চতুর্দ্দিকে অগণ্য নরনারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উহাদের কাহারও সহিত তোমার পরিচয় নাই, তুমি সন্ন্যাস লইবে ইহা শুনিয়া উহারা পর্য্যন্ত হাহাকার করিতেছে। তুমি পণ্ডিত ও সুজন। বল দেখি ইহা কি মাতা ও পত্নীর প্রাণে সহ্য হয় ? ঐ দেখ সকলেরই ম্লান মুখ, অনেকেই নয়ন জলে বুক

ভাসাইতেছে। আমি নিজে সর্ব্ব-মায়াত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও অধীর হইতেছি। আমি তোমায় সন্ন্যাস দিতে পারি না। বিশেষতঃ তুমি যে অনুমতি লইয়াছ, উহা আমি প্রচুর বলিয়া মনে করি না। তোমার অদর্শনে তোমার মাতা ও পত্নীর যে ভাব হইবে, হয়ত তাঁহারা তখন তাহা মনে করিতে পারেন নাই। এখন একবার গৃহে ফিরিয়া যাও, এই বার যদি অনুমতি লইয়া আসিতে পার, তবে আমি তোমার সন্ন্যাস দেওয়ার কথা বিবেচনা করিব।"

ভারতী গোঁসাইর মনোগত ভাব এই যে তিনি নিমাইকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া আশ্রম হইতে পলায়ন করিবেন, পলায়ন করিয়া এই দায় হইতে নিস্কৃতি লাভ করিবেন। শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল গ্রন্থে ভারতীর এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—

এত অনুমানি ন্যাসী করিলা উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর॥
সাক্ষাতে জননী ঠাঁই লইবে বিদায়।
তব পত্নী সুচরিতা যাবে তাঁর ঠাঞি॥
সাক্ষাতে সভার ঠাই বিদায় হইয়া।
আইসহ মোর ঠাঞি সবা বুঝাইয়া॥
মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়।
আসন ছাড়িয়া আমি যাব অন্য ঠাঞি॥

নিমাই ভারতীর কথায় আর কোন তর্ক না করিয়া বলিলেন আজ্ঞে আমি এই নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইয়া পুনশ্চ অনুমতি লইয়া আসিতেছি—এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সহসা দণ্ডায়মান হইয়া নবদ্বীপে

অভিমুখে প্রস্থান করার উদ্যোগ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ও পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। ভারতী মনে ভাবিলেন আর কেন ইঁহার নিজজনের যাতনার বৃদ্ধি করি। ইনি অনুমতি লইয়াছেন ইহা সত্য, আবার যে অনুমতি লইতে পারিবেন, এ ক্ষমতা ও ইহার আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ ইনি দৃঢ়সঙ্কল্প। আবার অনুমতি লইয়া নিশ্চয়ই ইনি আমার এথায় আসিবেন। ইনি স্বয়ং ভগবান্, ইহার সহিত প্রতারণা করা চলে না। আবার অনুমতি লইতে গেলে ইহার মাতা ও পত্নীর আরও কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। এই-রূপ নানা বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া ভারতী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "নিমাই নবদ্বীপে যাইতে হইবে না, ফিরে এস।"

নিমাই ভারতীর উচ্চ আহ্বান শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিলেন, ভক্ত বৃন্দের মনে যে নূতন আশা জাগিয়া উঠিয়া ছিল, তাহা নির্ব্বা-ণোন্মুখ দীপের ন্যায় সহসা একেবারেই নিভিয়া গেল।

উপস্থিত জনগণ ভারতীর এই শেষ বাক্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন,—কিছুতেই সন্ন্যাস লইতে দেওয়া হইবে না। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, ভারতী যদি প্রকৃ-তই এই ছেলেটীকে সন্ন্যাস দিতে প্রস্তুত হয়, আমরা শাস্ত্র-বিচারে ভারতীকে পরাস্ত করিয়া বলিব,—ইহার সন্ন্যাস কথনও শাস্ত্র-সঙ্গত হইতে পারে না। করুণা-কোমল লোকেরা বিশেষতঃ রমণীগণ মনে করিতেছেন তাঁহারা ভারতীর পায়ে পড়িয়া বাধা দিবেন।

উদ্ধত প্রকৃতির যুবকেরা এই সন্ন্যাসের আয়োজন দেখিয়া ভার-তীর প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিতেছে। তাহারা বলাবলি করিতেছে, এবার

আমরা কেশব ভারতীর কাটোয়া-বাস উঠাইয়া দিব। এই যুবক সন্নাসী হইলে ইহার মাতা ও স্ত্রীর কি উপায় হইবে, সন্ন্যাসী তাহার কি বুঝিবে? আমাদের তো ভাই, মাতা পত্নী আছে, বাড়ী হইতে এক দিন কোথাও না বলিয়া গেলে তাঁহারা পথে পথে কতবার ঘর-বাহির করিতে থাকেন। এই ব্রাহ্মণ যুবকটী না হয় চিত্তের আবেগে সন্ন্যাস লইতে আসিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ ভারতীর তো বিবেচনা থাকা উচিত। একজন যুবক বলিল, তোমরা যে যা বল উনি যেই সন্ন্যাস দিতে উদ্যোগ করিবেন, আর অমনি আমি উহাকে টানিয়া গঙ্গায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিব। আমি সন্ন্যাসী মানিব না।”

বিপুল জনতার মধ্যে এইরূপে বহুলোক আপন আপন ভাব অনুসারে নানা কথা বলিতেছেন। নিমাই তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আপনাদের সকলের চরণেই আমার এই ভিক্ষা যে যাহাতে আমি নিরাপদে ভবসাগর পার হওয়ার উপায় পাই, আপনারা আমায় তাহার সাহায্য করুন। আমি সন্ন্যাস না লওয়া পর্য্যন্ত মৃতের ন্যায় কাল কাটাইতেছি। সন্ন্যাস না লইলে আমরা সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। যদি আমার প্রতি আপনাদের দয়া থাকে, আপনারা কৃপা করিয়া আমায় সন্ন্যাসের অনুমতি দিন।”

নিমাইর এই কথায় উপস্থিত নরনারীগণ একবারেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যে সকল উপায় কল্পনা করিয়া ছিলেন, তখন সেই সকল উপায় এক বারেই নিস্ফল বলিয়া মনে হইল। অনেকেই হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

নদীয়ার আত্মীয়গণের হৃদয়ে এতক্ষণ জনসাধারণের কথায়

আশার যে ক্ষীণ আলোকটী জ্বলিতে ছিল, তাহা সহসা নিভিয়া গেল। তাঁহারা অধোবদনে রোদন করিতে লাগিলেন।

নিমাই ভারতীর কৃপা-অঙ্গীকার শুনিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি মুকুন্দকে বলিলেন,—ভাই যদি দয়া করিয়া এই সময়ে আসিয়াছ, একবার কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া আমার প্রাণ শীতল কর।

ভক্তগণ তখন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনে অসংখ্য লোক যোগদান করিল। সকলেই বিভোর হইয়া কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। সারা নিশি তুমুল হরিকীর্ত্তন হইল।

রাত্রি প্রভাত হইলেই নিমাই সন্ন্যাস লইবেন এই ভাবিয়া ভক্তগণ ও উপস্থিত জনগণের হৃদয়ে ক্রমশঃ উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল। নিমাই ভারতীকে বিনাত কণ্ঠে অত্যন্ত আগ্রহে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কৃপাময় আর বিলম্ব কেন? আমায় কৃপা করুন। আর আমার মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব সহ্য হইতেছে না।”

নিমাইর আগ্রহ দেখিয়া কাটোয়া-বাসী নরনারী মাত্রেই ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—বাবা, ক্ষান্ত দাও, একবার বৃদ্ধা মাতার কথা ভাবিয়া দেখ, ঘরে অমন বধূ রহিয়াছেন, তাঁহার কি হইবে, তাহা মনে করিয়া দেখ। মায়ের অঞ্চলের ধন,—ঘরে ফিরিয়া যাও।

এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাই সকলের নিকট করযোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন—“সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে আমার পরিত্রাণ নাই, আমার ঘরের কথা ভাবিবেন না, কৃষ্ণ তাঁহাদের রক্ষা করিবেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার সকল কথা বুঝাইয়া আসিয়াছি। এখন আপনারাও কৃপা করিয়া আমায় অনুমতি দিন,

এবং ভারতী ঠাকুরকে বলিয়া সন্ন্যাসের যথাবিধি আয়োজন করুন, তাহা হইলেই আমার প্রতি দয়া করা হইবে।"

নিমাইর ব্যগ্রতা দেখিয়া সকলেই অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সকলেই বুঝিলেন নিমাইকে নিবৃত্ত করা যাইবে না। নিমাইর অতিশয় অনুরোধে কেহ কেহ সন্ন্যাসের বৈদিক কার্য্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া লইয়া আসিলেন।

এদিকে উপস্থিত নরনারীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, কেহ বা ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নিমাইর সন্ন্যাসের সময়ে স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শচী দেবী ও প্রিয়াজী সম্মুখে থাকিলে তাঁহারা যেমন দর্শক মাত্রকেই ব্যাকুল করিয়া কাঁদিতেন, কাটোয়া-বাসীরা নিমাইর সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও নিমাইর সন্ন্যাসের চিন্তায় কেহ বা বুক চাপড়াইয়া, কেহ বা ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কেহ বা দূরে বসিয়া, কেহ বা মুখে কাপড় দিয়া, কেহ বা "কি হলে কি হলো" "উহাকে মানা কর, মানা কর" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ বা কেশব ভারতীকে গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিলেন "ভারতী নিতান্ত নির্দ্দয়। ভারতী যদি নিমাইকে সন্ন্যাস দেয়, তবে উহাকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে।" এই রূপে সকলেই কেশব ভারতীকে নিন্দা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।*

---

* কিবা বৃদ্ধ কিবা বৃদ্ধা কি নারী পুরুষ॥
শিশুগণ ধায় আর কুলের যুবতী।
নিজ ছায়া নাহি দেখে হেন রূপবতী॥

এ দিকে সন্ন্যাসের সকল আয়োজন হইল। সন্ন্যাস কার্য্যের প্রথম ব্যাপার,—ক্ষৌরকার্য্য। নাপিত আসিয়া নিমাইর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—ঠাকুর তুমিই কি আমায় মস্তক মুণ্ডনের জন্য ডাকিয়াছ?

নিমাই। নরসুন্দর, আমিই তোমায় ডাকিয়াছি। দয়াময় ভারতী ঠাকুর আমায় সন্ন্যাস দিয়া উদ্ধার করিবেন, তুমি কৃপা করিয়া আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দাও। আমার আর বিলম্ব সহিতেছে না।

নাপিত। তোমার মাথার ঐ চুল আমি মুণ্ডন করিয়া দিব, এইজন্য আমায় ডাকিয়াছ, ভারতী ঠাকুরের কৃপায় কাটোয়ায় অনেক বার এ কাজ করিয়াছি, ভারতী তোমায় সন্ন্যাস দিতে

কাঁখে কুম্ভ করি কেহ দাড়াইয়া চাহে।
নড়িতে না পারে সেই নাড় ধরি ধায়ে॥
পঙ্গু আতুর আর গর্ভবতী নারী।
শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসীরে পাড়ে গালি॥
এমন বালকে কেহ করায় সন্ন্যাস।
সন্ন্যাসের ধর্ম্ম নহে লোকে উপহাস॥
কঠিন অন্তর ইহার দয়াহীন জন।
নগরে না রাখি ইহায় কহিল তখন॥
সন্ন্যাসীকে সভে নিন্দা করে বার বার।
গোরা মুখ দেখি সবার আনন্দ অপার॥

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।

পারেন, উহার তো পুত্র সন্তান নাই। কিন্তু আমি তোমার মাথা মুণ্ডন করিতে পারিব না। তোমার মুখ খানি দেখিয়াই আমার প্রাণ দূর-দূর করিতেছে। তুমি মায়ের বুকে ছুড়িয়া দিয়া কাটোয়ায় আসিয়াছ। মায়ের ধন মায়ের কোলে যাও,—আমি তোমার ঐ চাঁচর চুলে ক্ষুর দিয়া তোমায় সন্ন্যাসী সাজাইতে পারিব না।

নিমাই। হরিদাস, তুমি আমার সন্ন্যাসের সহায়তা কর। আমি সন্ন্যাস লইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে কৃষ্ণভজন করিব। আমি সংসারে থাকিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমার প্রাণ সন্ন্যাসের জন্য ছট্‌ফট করিতেছে। তোমায় সত্য বলিতেছি, সংসার আমার নিকট কারাগার হইতেও ক্লেশজনক। আমি বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আসিয়াছি,—মিথ্যা বলিতেছি না। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এখানে উপস্থিত আছেন, উঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর, উনি সকল কথা স্পষ্ট বলিবেন।

নাপিত নিত্যানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর প্রভৃতি অধোমুখে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের নয়ন হইতে অবিরল জল ধারা পড়িতেছে। তাঁহারা নিমাইর দৃঢ় সঙ্কল্প জানেন, সুতরাং কোন প্রকার বাধা দিয়াও ফল নাই জানিয়া নীরব রহিয়াছেন।

নাপিত তখন জেদ করিয়া বলিল—ওঁরা কি জানেন না জানেন, আমি তাহা জানিতে চাহি না। আমি তোমার নিকট করজোড়ে বলিতেছি, এই কাটোয়ায় আরও অনেক নাপিত আছে,

তুমি আর কাহাকে ডাক। আমি তোমার চুলে ক্ষুর দিতে পারিব না।

নিমাই। হরিদাস, আমি সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ। যদি কেহ কাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া কৃষ্ণভজনের সুবিধা করিয়া দেয়, তবে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও বংশ বৃদ্ধি করিয়া দেন। আমার বন্ধন-মোচনের সহায়তা করিলে তুমি ধনপুত্রে সুখী হইবে এবং অন্তে বৈকুণ্ঠ লাভ করিবে।

নাপিত। ঠাকুর, আমি সৌভাগ্য চাই না, যাহা আছে তাহাও যদি নষ্ট হয়, হউক ; কুষ্ঠ হইয়া যদি এই অঙ্গে পোকা পড়ে তাহাও পড়ুক। আর তুমি আমার বৈকুণ্ঠের লোভ দেখাইতেছে, বৈকুণ্ঠের বদলে যদি আমাকে সবংশে ঘোর নরকেও পড়িতে হয়, তাহাও স্বীকার্য্য, কিন্তু আমি তোমার ঐ কেশ-মুণ্ডন করিতে পারিব না।*

নিমাই দেখিলেন নাপিত প্রগাঢ় বিষ্ণু-মায়ায় বিমোহিত। ইঁহার মায়া দূর না করা পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধির আশা নাই। তখন নিমাই নাপিতকে কিঞ্চিৎ প্রভাব দেখাইলেন। নাপিত বুঝিল যে

---

* মোর ভাগ্য নাশ প্রভু যাউক সর্ব্বথায়।
কেমনে বা হাত দিব তোমার মাথায়॥
যদি মোর কুষ্ঠ হয়, গলি যায় অঙ্গ।
বংশ ঘোর নরকে যাক্ শুনহে গৌরাঙ্গ॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

যাঁহার সহিত সে কথা কাটাকাটি করিতেছে তিনি স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিতে কাহারও শক্তি নাই। নাপিত নিমাইর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়র ভাব দেখাইতে লাগিল।

কাটোয়া-বাসীরা এতক্ষণ নাপিতের প্রতিকূল তর্ক শুনিয়া তাহার ধন্য ধন্য করিতে ছিলেন। কিন্তু এখন যে নাপিতের ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়া হতাশ হইলেন। নিমাই বলিলেন, হরিদাস, বুঝিলে তো আমায় খালাস করিয়া দাও তোমার ভাল হইবে।" নাপিত তখন দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছে। বাসুঘোষের পদে নাপিতের উক্তি শুনুন :—

মধুশীল বলে গোসাঞি না ভাঁড়াও মোরে।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু জানিনু অন্তরে॥
পূরাব তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়।
জানিলুঁ তোমার আজ্ঞা নাহিক সংশয়॥
বলিতেছ কৃষ্ণের প্রসাদে রব সুখে।
মরণের পরে গতি হবে বিষ্ণু-লোক॥
যে কৃষ্ণ রাখিবে সুখে সেই কৃষ্ণ তুমি।
তব পদ বিষ্ণু-লোক; কিবা জনি আমি॥
মুড়াব চাঁচর কেশ হাতে দিব মাথে।
কিন্তু প্রভু শ্রীচরণ দাও আগে মাথে॥
মধুর বচনে প্রভু দিল শিরে পদ।
বাসু কহে যার কাছে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ॥

কাটোয়াবাসীদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে ভাবিতে ছিলেন মধু কিছুতেই মস্তক মুণ্ডন করিবে না, নিমাইরও সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইবে না। এখন মধুর কথা শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া সকলেই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন।

এই সময়ে ভারতী গোসাঞি ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "বাবা নিমাই, কেশ মুণ্ডন হইলেই তো সন্ন্যাস হইবে না। মধু না হয় তোমার কেশ মুণ্ডন করিয়া দিবে; কিন্তু তোমায় বৈদিক বিধিতে সন্ন্যাস দিবে কে? আমা হইতে এ কার্য্য হইবে না। তোমার বয়স অতি অল্প। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক না হইলে সংসার-রাগের নিবৃত্তি হয় না। তাহার পূর্ব্বে সন্ন্যাস বৈধ নয়। অপরন্তু এই কাঞ্চন নগরের লোক সকল তোমার সন্নাসের একান্ত বিরোধী।

নিমাই। দয়াময়, আপনি ওরূপ বলিলে আমার আর গতি কি? আমি শাস্ত্রের কথা কি বলিতে পারি? মানুষের জীবৎকালের কোন পরিমাণ স্থির নাই, দেখিতে দেখিতে মানুষ মরিয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যদি আমার মরণ হয়, তবে তো আর আমার ভাগ্যে আপনাদের ন্যায় গুরুর কৃপা-লাভের আশা নাই। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, সাধু ও কৃপাময়। এ অধমকে বঞ্চিত করিবেন না ইহাই আপনার শ্রীচরণে আমার প্রাণের ভিক্ষা।*

---

* এ বোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী।
তোমার সাক্ষাতে বুলি কি বলিতে জানি॥

ভারতী নীরব হইলেন, কিন্তু কাটোয়া-বাসিগণ এ সকল কথায় নিবৃত্ত হইলেন না। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে অনুনয়-বিনয় করিয়াও নিমাইকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন শোক-বেগে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও তাঁহার হৃদয় স্বভাবতঃই কোমল ও করুণ। কাটোয়া-বাসীদের রোদনে তাঁহায় হৃদয় বাস্তবিকই বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদিগের সান্ত্বনার জন্য যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে তাহার আভাস এইরূপ লিখিত আছে, যথা :—

এত অনুমান করি কান্দে সব লোক।
ডাকিয়া কহয়ে প্রভু না করিহ শোক॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে শুন মাতা পিতা।
সাধ লাগে কৃষ্ণের চরণে দিমু মাথা॥
যার যেই নিজ পতি সেই তাহা চায়।
তার চিত্ত বাধিবারে করয়ে উপায়॥
রূপ যৌবন যত এ রস-লাবণ্য।
নিজ পতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য॥
মনে মনে কর গো সবাই অনুভব।
পতি বিনা যুবতীর মিছা হয় সব॥
কৃষ্ণ পদ বিনা মোর অন্য নাহি গতি।
নিজ অঙ্গ দিয়া মোর ভজিব প্রাণ পতি॥

পঞ্চাশ হইতে যদি হয়ত মরণ।
তবে আর সাধু সঙ্গে হইবে কখন॥

ইহা বলি মহাপ্রভু করয়ে রোদন।
ক্ষণেক অন্তরে সব কৈল সম্বরণ॥

কাটোয়াবাসিগণ বুঝিলেন নিমাইকে ঘরে রাখা সম্ভবপর নয়, গৃহ বাস্তবিকই নিমাইর পক্ষে কারাগৃহ। কাজেই এ অবস্থায় নিমাইর মাতা ও পত্নী নিমাইর সুখের দিকে চাহিয়াই নিমাইকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহারা অনুপায় হইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

এ দিকে সন্ন্যাসের সমস্ত উদ্যোগ-শেষ হইল। নিমাইর মেসো নিমাইর আদেশে সন্ন্যাসের অনুষ্ঠানোপযোগী কৃষ্ণ-পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নয়ন জলে তাঁহার মুখখানি ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নদীয়ার ভক্তগণ প্রভুর অবস্থা বহুপূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। তাঁহারা কাটোয়ায় আসিয়া কেবল নীরবে রোদন করিতেছিলেন, আরও অধিক করিয়া শচীমাতা ও প্রিয়াজীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন নিমাইর সাহস দেখ, আমি উহার পিতৃস্থানীয়। আর আজ নিমাই আমাকে দিয়া সন্ন্যাসের কার্য্য করিয়া লইতেছে, যদি মিশ্র আজ জীবিত থাকিতেন, নিমাই বোধ হয়, তাহাকেও বলিত, "বাবা আমি মাথা মুড়াইয়া কৌপীন পরিয়া সন্ন্যাস লইতেছি, আপনি এ কার্য্যের সহায় হউন।"

যদি শচী দেবী নিমাইকে ফিরাইয়া লইতে কাটোয়া আসিতেন সম্ভবতঃ তাঁহাকেও আজ এই সন্ন্যাসের উপযোগী কৃষ্ণার্চ্চনের পুষ্প-পত্র ও নৈবেদ্যের আয়োজন করার জন্য নিমাই অনুরোধ করিত।

যাহাই হউক এখন তো নিমাইর আদেশই প্রতিপালন করি। আর নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইব না। ইহার পরে আর কোন্ মুখে নবদ্বীপে যাব? কি করিয়াই বা শচী দেবী ও বধূমাতাকে মুখ দেখাইব? আমি নিজে হাতে সন্ন্যাসের উদ্যোগ করিয়া আজ নিমাইকে সন্ন্যাসী করিরা বিসর্জ্জন দিয়া যাইতেছি, একথা শুনিয়া শচীদেবী আমাকে কি মনে করিবেন? গৃহিণীই বা কি মনে করিবে? আর বধূমাতাই বা আমাকে কি মনে করিবেন? আমি আর নদীয়ায় ফিরিব না, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া এ কঠিন প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। চন্দ্রশেখর এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে ছিলেন।

এ দিকে নাপিত বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া পড়িয়া ছিল। নিমাই বলিলেন "ভাই হরিদাস, এই শুভকার্য্যে আর বিলম্ব করিও না এখন এস, আমায় উদ্ধার করিয়া দাও।"

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নাপিত নিমাইর সম্মুখে আসিয়া বসিল। কাঁদিতে কাদিতে উহার চক্ষু ফুলিয়াছে, দেহ কাঁপিতেছে। অবশ ভাবে নাপিত প্রভুর সম্মুখে বসিল। উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই তখন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, নরনারীগণের মধ্যেই অনেকেই সংজ্ঞাহীন হইয়া কেহ বা বুক চাপড়াইয়া কে বা ধূলায় পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন। কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

নদীয়াবাসিগণ নিমাইর নিকটে ছিলেন। তাঁহারা অনেক দুঃখ সহিয়াছেন। তাঁহারা যাহা মনে করিয়াই দুঃখিত হইতেন আজ তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে। তাঁহারা পরিধান বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাই অতীব ব্যাকুলভাবে

ভাবে নাপিতকে বলিলেন—হরিদাস, আর বিলম্ব কেন? আমায় মুণ্ডন করিয়া দাও।"

নাপিত নিমাইর আহ্বানে এবার আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার চরণ ধূলি মাথায় লইয়া বলিল—"যে আজ্ঞা"।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের চরণস্পর্শমাত্রই নাপিত প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিল। তাঁহার নৃত্য ও প্রেমতরঙ্গ দেখিয়া নিমাই নিজেও প্রেমে অধীর হইয়া তাহার সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে দর্শক মাত্রেরই হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করিয়া দিলেন। মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিমাইর আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণ-ব্যাপার অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাস-গ্রহণ কালে এমন নৃত্য-কীর্ত্তন, এমন প্রেম-তরঙ্গ—এমন আনন্দের মহাবন্যা আর কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই।

ইহার উপরে নিমাই যখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতে ছিলেন, তখন তাঁহার দেহ হইতে যে অপূর্ব্ব লাবণ্যজ্যোতি ক্ষরিত হইতে-ছিল, তাঁহার বদন মণ্ডল হইতে যে অলৌকিক প্রসন্ন আনন্দ-মাধুর্য্যকিরণ ছড়াইয়া পড়িতেছিল, ভারতী প্রভৃতি দর্শকমাত্রেই তাহা দেখিয়া মনে করিলেন—ইনি মানুষ নহেন, সাক্ষাৎ **—আনন্দ বিগ্রহ।**

নিমাই বাহ্য জ্ঞান হারা হইয়া নাপিতের হাত ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে যদিও একটু জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি মুণ্ডনের জন্য ভূমিতে বসিলেন, কিন্তু বসিয়াও স্থির

হইতে পারিলেন না। তাঁহার কনক-অঙ্গ কদলী-কাণ্ডের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, নয়ন আনন্দসলিলে ভাসিয়া গেল, তিনি এক একবার "বোল বোল" বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন।

এইরূপ দিনমান প্রায় শেষ হইয়া হইয়া পড়িল। নিমাই তখন আত্মসংবরণ করিলেন এবং নাপিতকেও সুস্থ করিলেন। তখন নাপিত মুণ্ডন কার্য্য করিতে ক্ষুর হাতে লইল।*

কিন্তু ক্ষুর হাতে লইয়া তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, নয়নজলে নয়ন পূর্ণ হইল। সে আবার অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিল। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণও তখন ভুমিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

নিত্যানন্দ প্রভৃতি যতেক ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন॥

---

* প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি তার অশ্রুকম্প॥
বোল্ বোল্ করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর
গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরন্তর॥
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেম-রসে মহাকম্প বহে অশ্রুধারে।
বোল্ বোল্ বলি প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
ক্ষৌর-কর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥
কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে।
ক্ষৌর-কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥

ভক্তের কি কায যত ব্যবহারি লোক।
তাহারা কান্দিতে লাগিল করি শোক॥
হেন সে কারুণ্য রস গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণদি দ্রবয়ে অন্তরে॥

রমণীগণ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

কেমনে ধরিবে প্রাণ ইহার জননী।
আজি তাঁর পোহাইল কি কাল রজনী॥
কোন পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥
আমা সভাকার প্রাণ বিদরে দেখিতে।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ রাখিবে কি মতে॥

নিমাই দেখিলেন, নাপিত আবার কারুণ্য-রসে অধীর হইয়াছে। তখন তিনি উহাকে বল দিয়া স্থির করিলেন। নাপিত তখন প্রকৃতস্থ হইয়া গম্ভীর ভাবে ক্ষুর ধারণ করিয়া মুণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইল। হায় হায়, নিমাইর সেই সুন্দর কেশরাশি যখন মস্তক হইতে নাপিতের বস্ত্রে পড়িতে লাগিল, তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ মুকুন্দ ও চন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রভৃতি ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—সে ভাব দেখিয়া কাটোয়াবাসিনরনারীগণ আবার অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেই ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন। পদকর্ত্তা রসিকানন্দ লিখিয়াছেন—

তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।

করি অতি উচ্চরব কাঁদে যত লোক সব
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥

হরি হরি কি না হৈল কাঞ্চন নগরে।

যতেক নগরবাসী দিবসে দেখয়ে নিশি
প্রবেশিল শোকের সাগরে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়া অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।
"কি হৈল, কি হৈল" বলে, হাতে নাহি ক্ষুর চলে
"প্রাণ মোর বিদরিয়া যায়"॥
মহা উচ্চ রোল করি কাঁদে কুলবতী নারী
সবাই প্রভুর মুখ চাঞা।
ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ানযুগল ঝরে
ধারা বহে নয়ান বহিয়া॥
দেখি কেশ অন্তর্ধান অন্তরে দগধ প্রাণ
কাদিছেন অবধূত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ শোকানলে আনচান
এ দুখ ত সহন না যায়॥

মধু নাপিত নিমাইর কেশ মুণ্ডন করিয়া পুনর্ব্বার শোকাকুল হইয়া অনুতাপসহ বিলাপ করিতে লাগিল :—

কহে মধুশীল আমি কি দুঃশীল
কি কর্ম্ম করিনু আমি।

মস্তক ধরিনু পদ না সেবিনু
পাইয়া গোলক স্বামী॥
যে পদে উদ্ভব পতিত পাবনী
তাহা না পরশ হৈল।
মাথে দিনু হাত কেন বজ্রাঘাত
মোর পাপ মাথে নৈল॥
যে চাঁচর চুল হেরিয়া আকুল
হইত রমণী মন।
হৈনু অপরাধী পাষাণে প্রাণ বাঁধি
কেন বা কৈনু মুণ্ডন॥
নাপিত ব্যবসা আর না করিব
ফেলিনু এ ক্ষুর জলে।
পহুঁ সঙ্গে যাব মাগিয়া খাইব
রসিক আনন্দ বলে॥

বাসুঘোষ লিখিয়াছেন:—

নাপিত বলয়ে প্রভো করি নিবেদন।
এরূপ মনুষ্য নাহি এ তিন ভুবন॥
তব শিরে হাত দিয়া ছোব কার পায়।
এ বোল সে বোল প্রভু কাঁপে মোর কায়॥
কার পায় হাত দিয়া কামাইব নিতি।
অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি॥

. এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়।
না করিহ নিজ বৃত্তি আর পুনরায়॥
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোয়াইবা সুখে।
অন্তঃকালেতে গতি হবে বিষ্ণুলোকে॥

মধুশীল স্বয়ং ভগবান্ নিমাইর বাক্যে পরমানন্দ লাভ করিয়া গঙ্গাজলে চিরদিনের তরে স্বীয় ব্যবসায়ের ক্ষুর ফেলিয়া দিলেন।

নিমাইর শিখামুণ্ডনে ভক্তগণের দুঃখ বর্ণনা করিয়া শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস এই পদটী লিখিয়াছেন ঃ—

করিলেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শিখা সোঙরিয়া কাঁদে ভাগবতগণ॥
কেহ বলে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া না দিবহে উপরে॥
কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন।
কি মতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।
এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার॥
হরি হরি বলি কেহ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥

মুণ্ডনান্তে নিমাই গঙ্গায় অবগাহন করিলেন, দশদিক হইতে হরিধ্বনির তুমুল রব উঠিল। নিমাইর সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র লোক গঙ্গায় অবতরণ করিলেন। নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া কর-জোড়ে ভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ভারতী তিন খণ্ড অরুণ

বস্ত্র নিমাইর হাতে দিলেন। উহার একখানি উত্তরীয়,—একখানি বহির্বাস,—এবং অপর একখানি কৌপীন। নিমাই উহা মস্তকে ধারণ করিয়া পরিধেয় আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নবীন সন্ন্যাসীর বেশে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এই সন্ন্যাস বেশ দেখিয়া সকলেই আকুলভাবে কান্দিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে এক অভিনব বৈরাগ্য-ব্রহ্মজ্যোতি বিকিরণ হইতে লাগিল। উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিলেন—এই কনককান্তি সাক্ষাৎ দ্বিভুজ নারায়ণ।

উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া দীনাতিদীনভাবে নিমই বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার বান্ধব, আমার জন্য শোক করিও না। সকলে মিলিয়া আশীর্ব্বাদ কর, এই যে সন্ন্যাস করিলাম, ইহা যেন উপহাস না হয়, আমি যেন ব্রজে যাইয়া ব্রজনাথকে প্রাপ্ত
'তে সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেন কাহারও মুখে কোন বাক্য সরিল না, সকলেই নিশ্চলভাবে অঝোরনয়নে কাঁদিতে

---

* মুড়ায়ে চাঁচর চুলে স্নান করি গঙ্গাজলে বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকতগণ উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥
অরুণ দুই খানি কানি, ভারতী দিলেন আনি, আর দিল একটি কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌরহরি আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ কর নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস, ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে॥

লাগিলেন।* নিমাই কৌপীন বহির্বাস ধারণপূর্ব্বক ভারতীর বামদিকে উপবিষ্ট হইয়া ভারতীর কাণের নিকট চুপে চুপে বলি-লেন,—আমি স্বপ্নে সন্ন্যাসের এই মন্ত্র পাইয়াছি আপনি আমায় এই মন্ত্র দান করুন।"

শ্রীভগবানের সকল কার্য্যই অদ্ভুত। তিনি মন্ত্র লইতে গিয়া প্রকারান্তরে ভারতীকেই মহাপ্রেমমন্ত্র প্রদান করিলেন, মন্ত্র পাইয়া ভারতী অধীর হইলেন। ভারতী লৌকিক প্রথা অনু-সারে সেই মন্ত্রই নিমাইর কর্ণে প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নিমাইর পুনর্জ্জন্ম হইল, রীতি অনুসারে অভিনব নামকরণ হইল—**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**। ভারতী বলিলেন,—তুমি জগতের জীবকে শ্রীকৃষ্ণে চেতন করাইলে এইজন্য তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অথবা তোমার দর্শনে জগৎ-জীবের শ্রীকৃষ্ণ বিষয় চেতনা হইবে, এই নিমিত্ত তোমার নাম হইল,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

এ সম্বন্ধে বাসুঘোষ লিখিয়াছেন :—

---

* প্রভুর মুণ্ডন দেখি, কাঁদে যত পশুপাখী, আর কান্দে যত শ্রীনিবাসী।
বৎস নাহি দুগ্ধ খায়, তৃণ দন্তে গাভী ধায়, নেহারে গৌরাঙ্গ মুখ আসি॥
আছে লোক দাঁড়াইয়া, গৌরাঙ্গ মুখ চাহিয়া, কারো মুখে নাহি সরে বাণী।
দুনয়নে জল সরে, গৌরাঙ্গের মুখ হেরে, বৃক্ষবৎ হইল সব প্রাণী॥
ডোরকৌপীন পড়ি, মস্তক মুণ্ডন, ডুরি, মায়া ছাড়ি হৈল উদাসীন।
বৈসে ভগমগি হৈয়া, করেতে দণ্ড লঞা, প্রভু কহে আমি দীনহীন॥

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কাঁদিলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিমাইরে দিলা॥
পহু কহে গুরু মোর পুরাও মনের সাধ।
কৃষ্ণে মতি হউক এই দেহ আশীর্ব্বাদ॥
ভারতী কাঁদিয়া বলে মোর গুরু তুমি।
আশীর্ব্বাদ কি করিব কৃষ্ণ দেখি আমি॥
ভুবন ভুলাও তুমি সব নাটের গুরু।
রাখিতে লৌকিক মান মোরে কহ গুরু॥
আমার সন্ন্যাস আজি হইল সফল।
বাসু কহে দেখিলাম চরণ কমল॥

৫

নিমাই এখন,—**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**। তিনি সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ত্যাগ করিয়া অনন্তে ঝাঁপ দিয়াছেন। জগতের নরনারীমাত্রেই এখন তাঁহার মাতাপিতা। সমগ্র জগৎ এখন তাহার নিজ নিকেতন। এখন তিনি অনন্ত আনন্দধামের অবিরাম পথিক। গার্হস্থ্জীবনের কিছুতেই তাঁহার অধিকার নাই। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দণ্ড-করঙ্গ কৌপীনমাত্র।

সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কেশব-ভারতীকে প্রণাম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভক্তগণ ও অনন্ত লোকপ্রবাহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—আমি জগতে একক, আমি কাহারও নহি,

কেহই আমার নহে। আমি কেবল শ্রীকৃষ্ণের, এবং কেবল শ্রীকৃষ্ণই আমার। তোমরা আমার জন্য শোক করিও না,—আমার সঙ্গে আসিও না,—আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাও,—আর সকলেই আমায় আশীর্ব্বাদ কর,—আমি যেন ব্রজে গিয়া আমার ব্রজনাথকে প্রাপ্ত হই।"

এই বলিয়া নবীন সন্ন্যাসী আর কোনও দিকে দৃষ্টি না করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-উদ্দেশ্যে আকুলপ্রাণে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পশ্চিম-মুখে অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। একটী পদে লিখিত হইয়াছে—

নবীন সন্ন্যাসি-বেশে বিশ্বম্ভর ঊর্দ্ধশ্বাসে
বৃন্দাবন পানেতে ছুটিল।
কটিতে করঙ্গ বাধা মুখে রব রাধা রাধা
উধাউ হইয়া পহুঁ ধাইল॥
দু নয়নে প্রেমধারা বহে।
বলে কাঁহা মঝুরাই কাঁহা যশোমতি মাই
ললিতা বিশাখা মঝু কাঁহে॥
কাঁহা গিরিগোবর্দ্ধন কাঁহা সে দ্বাদশবন
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কই।
ছিদাম সুদাম সখা কাঁহা মুঝে দাও দেখা
কাঁহা মোর নীপতরু কই॥
কাঁহা নবলক্ষ ধেনু কাঁহা মেরি শিঙ্গা বেণু
কাঁহা মোর যমুনা পুলিন।

বৃন্দাবন দাস কয় আমার গৌরাঙ্গ রায়
কেনে হেন হইল মলিন ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এমন দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন যে অতি অল্পক্ষণেই তিনি উপস্থিত নরনারীগণের নয়নের অন্তরাল হইলেন। অনেকে দৌড়িয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে স্তম্ভিতভাবে পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নদীয়ার ভক্তগণের মধ্যে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর মুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রাণপণে দৌড়িয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। নিতাই সকলের আগে, তাহার পাছে চন্দ্রশেখর;—মুকুন্দ ও গোবিন্দ অনেক পাছে পড়িয়া রহিলেন। নিতাই বলিলেন ভাই, একটুকু ধীরে চল, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, আমি যে তোমার সহিত আর দৌড়িতে পারি না।"

কন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তখন ব্রজভাবে বিভোর, নিতাইর উচ্চ ধ্বনির একবর্ণও তাঁহার কর্ণে পৌছিল না। পদকর্ত্তা লিখিয়াছেন—

আর মোরে গৌরাঙ্গসুন্দর।
প্রেম জলে তিতিল সোণার কলেবর ॥
কটিতে করঙ্গ বাধা দিগ্ বিদিগ্ ধায়।
প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া না যায় ॥

নবীন সন্ন্যাসী কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া যেরূপ ভাবে গমন করিতেছিলেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করিয়া ভক্ত কবি প্রেমদাস এক স্থানে তাহার আভাস দিয়াছেন, যথা,—

অগ্র পশ্চাৎ কিছু না করে বিচার॥
সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হীন কলেবর।
কোথা যান ইতি উতি নাহিক ঠাওর॥
পথ বিপথ কিছু নাহিক জ্ঞেয়ান।
পথ পানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ন॥
কখন উন্মত্ত প্রায় উঠে ঊর্দ্ধ স্থানে।
কখনো বা পড়ে গর্ত্তে তাহা নাহি জানে॥
চলি চলি কখন ও পড়েন যাই জলে।
কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মেলে॥

শ্রীমতী রাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যও সেই ভাবে ধাবিত হইলেন। তাঁহার দিগ্‌বিদিক্‌ বা দিনরাত্রি জ্ঞান রহিল না। স্বীয় প্রেমানন্দে প্রমত্ত হইয়া নবীন সন্ন্যাসী ধাবিত হইলেন। কোন্‌ পথে কোথা যাইতেছেন, সে জ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দদত্ত, এই তিনজন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে যে দেখিতে পাইল, তাহারই হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূরিত হইল, আর তাহারই কণ্ঠে প্রেমানন্দে হরিধ্বনি উচ্চারিত হইলে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পথ হরিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।

গো-রাখালগণ মাঠে গরু চরাইতেছে,—নবীন সন্ন্যাসী সেই মাঠের মধ্যে যাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়েও প্রেমানন্দের সঞ্চার হইল, তাহারা উচ্চ কণ্ঠে হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, ভাই সব, তোমরা আমায় হরিনাম শুনাইয়া কৃতার্থ করিলে, আবার প্রেমভরে সবাই হরিনাম কর।”

৬

এই সময়ে নিতাই দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের অর্দ্ধ বাহ্যজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি চিরদিনই গৌরসুন্দরের মনের ভাব জানেন। নিমাই, রাখালদিগকে ডাকিয়া গোপনে বলিলেন,—দেখ, যদি উনি তোমাদের নিকট বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে ইঙ্গিতে গঙ্গার পথ দেখাইয়া দিও।”

ঘটনা ঠিক এইরূপই ঘটিল। একটুকু অগ্রসর হইয়াই প্রভু একজন রাখালকে জিজ্ঞাসিলেন,—গোপ বালক, আমি বৃন্দাবনে চলিয়াছি। পথ চিনি না, বল দেখি কোন পথে যাই।”

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের শিক্ষা ফলবতী হইল। রাখালের নির্দ্দেশে গৌরহরি প্রেমাবেশে গঙ্গাতীরের দিকে ধাবিত হইলেন। নিতাই প্রভুর ঝোঁক দেখিয়া আচার্য্যরত্নকে বলিলেন, “এবার এই প্রেমোন্মত্ত নবীন সন্ন্যাসীকে আমি ঠিক শান্তিপুরে অদ্বৈত মন্দিরে পৌঁছাইব। তুমি অদ্বৈত আচার্য্যকে এই খবর দিয়া নবদ্বীপে চলিয়া যাও, শচীমাতা প্রভৃতি ভক্তগণসহ তোমাকে আবার সত্বরেই শান্তিপুরে ফিরিতে হইবে।”

আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর মনের আহ্লাদে দ্রুতগতিতে সোজা পথে শান্তিপুরে পৌঁছিয়া অদ্বৈত আচার্য্যকে সংবাদ দিলেন। আচার্য্য

এক খানি নৌকা লইয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে আসিয়া উপস্থিত হইবার উদ্যোগ করিলেন।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর অর্দ্ধবাহ্য জ্ঞান পাইয়া দেখিতে পাইলেন, নিতাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। নিতাই বলিলেন, তুমি এত দ্রুতবেগে চলিতেছ যে আমি তোমাকে ধরিয়াও ধরিতে পারিতেছি না।

গৌর। শ্রীপাদ, আপনি কোথা যাচ্ছেন?

নিতাই। এই যে আমিও তোমার সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাই-তেছি। ভাল হলো, চল দুইজনে একত্র যাই। কিন্তু অত বেগে চলিলে আমি পারিব না। তোমার পাছে পাছে ছুটিয়া তিন দিন আহার নিদ্রা নাই। আমি কি অতি দৌড়িতে পারি?

গৌর। শ্রীপাদ, শ্রীবৃন্দাবনের পথ আপনার ভালই জানা আছে, বলুন ত শ্রীবৃন্দাবন আর কত দূর?

নিতাই। আর বড় বেশী দূর নহে। অই যে সম্মুখেই শ্রীযমুনা।

এই বলিয়া নিতাই গৌরসুন্দরকে লইয়া গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন। ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি গঙ্গা দেখিয়াই যমুনা মনে করিলেন, হাত জুড়িয়া শ্রীযমুনাকে প্রণাম করিয়া স্নানান্তে শ্রীযমুনা-স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী
অঘানাং লবিত্রী জগৎ ক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রি।

এই সময়ে নৌকাযোগে অদ্বৈতাচার্য্য গঙ্গার এপারে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সমক্ষে কৌপীন বহির্বাসসহ উপনীত হইলেন। আচার্য্য শ্রীগৌরচরণে নমস্কার করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ "নমো নারায়ণায়"বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন—আপনি ত আচার্য্য গোঁসাঞি বটেন!—তাইতো দেখ্‌ছি। আপনি এখানে কেন? আপনি কি করিয়া জানিলেন যে আমি শ্রীবৃন্দাবনে এসেছি।

অদ্বৈতাচার্য্য স্পষ্ট ভাষায় একবারেই সত্য কথা বলিয়া ফেলি-লেন। আচার্য্য বলিলেন,—ঠাকুর, বৃন্দাবন আবার অপর স্থানে কোথায়? যেখানে তুমি সেইখানেই বৃন্দাবন। আমার ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার শুভাগমন হইয়াছে। এখন এই বহির্বাস পরিবর্ত্তন কর, নৌকায় উঠ, চল ওপারে যাই।"

গৌর। তবে একি হইল? তবে কি শ্রীপাদ নিতাই আমাকে যমুনা বলিয়া গঙ্গাতটে লইয়া আসিলেন! শ্রীপাদ, তোমার একি বঞ্চনা। তুমি আমার বৃন্দাবনে যেতে দিলে না!

এই বলিয়া প্রভু বিমর্ষের ন্যায় হইলেন। আচার্য্য বলিলেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মিথ্যা কথা বলেন নাই, ঠিক্‌ই বলিয়াছেন।

গঙ্গায় যমুনা বহে হয়ে একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পুবে গঙ্গাধার॥

তুমি যমুনাতেই স্নান করিয়াছ। এখন এ দীনের আলয়ে চল।

প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস॥

একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছি পাক।
শুখ রুখ ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক॥

প্রভু চিরদিনই ভক্তের বশীভূত। তিনি নৌকায় চড়িয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন। সহস্র সহস্র নরনারী শান্তিপুরের ঘাটে তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। শ্রীগৌর সুন্দরকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়া তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যেই তিনি নৌকা হইতে তটে পদার্পণ করিলেন, ভক্ত অভক্ত বিদ্বেষী অনুরক্ত অমনি মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর "জয় গৌরহরি" রবে দশদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল।

পথের দুই দিকের লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়া আচার্য্য শ্রীগৌর নিতাইকে লইয়া আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে আচার্য্য গৃহিণী সীতা ঠাকুরাণী শ্রীগৌর সুন্দরের ভোগের জন্য বহু প্রকার রন্ধনের ঘটা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতগ্রন্থে পাঠকগণ সেই ভোগারাধনার সুন্দর বিবরণ পাঠ করিবেন।

তিনদিন উপবাসের পর শ্রীগৌরনিতাই আচার্য্য-গৃহে বহু উপচারে সেবা প্রাপ্ত হইলেন। অগণ্য লোক শ্রীশ্রীগৌরহরির দর্শনার্থ দলে দলে আচার্য্যগৃহে সমাগত হইতে লাগিলেন। কীর্ত্তনানন্দের তরঙ্গে শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়া পড়িল। নদীয়াবাসীরা সংবাদ পাওয়ামাত্রই শান্তিপুরের দিকে ধাবিত হইলেন। যাহারা বিদ্বেষ করিয়াছিল, এবার শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে তাহারাই অগ্রগণ্য ও

অগ্রগামী। ভিড় ঠেলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহারা আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া বলিল,—"দয়াময় আমরা পতিত পাষণ্ডী,—জগাই মাধাই হইতেও মহাপাপী। আমরা তোমার ক্ষমার অযোগ্য। তুমি স্বয়ং ভগবান্। আমরা তোমায় চিনিতে পারি নাই, চিনিতে না পারিয়া কত পাপ-কথা বলিয়াছি, এখন তাহা মনে করিলেও নিজকে মহা অপরাধে অপরাধী বলিয়া মনে হয়, দয়াময় আমরা তোমার শ্রীচরণে শরণ লইলাম, আমাদিগকে উদ্ধার কর।"

প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহানন্দে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা ভক্তিভরে হরিনাম কীর্ত্তন কর, পতিত-পাবন হরি তোমাদিগের অবশ্যই ত্রাণ করিবেন।" বিদ্বেষিগণ এবার দয়াময়ের কৃপা-লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং মুক্তকণ্ঠে "জয় পতিত-উদ্ধারণ গৌরহরি" এই সুধাময় নামধ্বনি করিতে করিতে প্রেমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। "জয় পতিত-উদ্ধারণ গৌরহরি" চারিদিকে এই ধ্বনি ছড়াইয়া পড়িল।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বিশ্রামের জন্য একটি নির্জ্জন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। নিতাই তাঁহার সঙ্গে থাকিলেন। নির্জ্জন পাইয়া নিতাই বলিলেন—"সন্ন্যাস লইলেই কি আপন জনের কথা একবারে ভুলিতে হয়?"

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু নিতাইর ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, সকলই মনে আছে। আমার মা জননীর জন্য বাস্তবিকই আমার প্রাণ কাঁদিতেছে, নদীয়ার শত শত নরনারী আমায় পুত্রের ন্যায় ভাল

বাসিতেন, আমার সন্ন্যাসে ও বিরহে তাঁহারা অধীর ও আকুল হইয়াছেন। সন্ন্যাস লইয়াছি, আর তো সম্প্রতি নদীয়ায় যাইতে পারিব না, নদীয়াবাসীরা কৃপা করিয়া আমায় দর্শন দিলে, আমি তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারি।"

নিতাই বাধা দিয়া বলিলেন,—তুমি ওরূপ করিয়া কথা বলিও না, উহাতে আমারই হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অপরের আর কথা কি? এই আমি নবদ্বীপে চলিলাম।" নিতাই ঘরের বাহির হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে আবার ফিরিলেন—ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন —যে যে আসিতে চায় সকলকেই আনিব তো?

গৌর। হাঁ, কাহারও বাধা নাই, সকলেই আসিতে পারিবেন।

নিতাই। মা ত অবশ্যই আসিবেন, আর আর সকলে আসিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকেও আনিব?

নিতাইর মনের ভাব গৌরসুন্দর বুঝিলেন, তিনি বুঝিলেন নিতাই প্রিয়াজীর দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহার কথাই বলিতেছেন। সন্ন্যাসীর আপন স্ত্রী-দর্শন-নিষেধ। নিতাই তাহা জানেন। কিন্তু নিতাই ইহাও জানেন, গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার আবার বিধিনিষেধ কি? তাই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে কৌশলে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। গৌরসুন্দর নিতাইর মনের ভাব বুঝিলেন। তিনি লোকধর্ম্মপালক হইয়া সন্ন্যাসের মর্য্যাদা ভঙ্গ করিবেন কেন? তাই নিতাইর কথার প্রত্যুত্তরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন—"সকলেই এখানে আসিয়া আমাকে দেখিতে পারেন—কেবল একজন ছাড়া।"

করুণাময় নিতাই কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে নবদ্বীপ অভিমুখে চলিলেন। এ সম্বন্ধে মুরারিগুপ্ত লিখিয়াছেন—

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া নগরে॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিতানন্দ রায়।
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥
ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলেন বাহিরে॥
দাঁড়াইয়া মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
কাতরে পড়িয়া শচী দেখয়ে নিতাই।
কাঁদি বলে "কোথা আছে, আমার নিমাই॥"
"না কাঁদিহ শচীমাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করি প্রভু গৌর গুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠায়ে দিল তোমা লইবারে॥"
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচৈতন্য হয়ে ভূমে পড়ে শচীমাতা॥
উঠাইল নিত্যানন্দ, "চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥"
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদীয়ানিবাসী।
"সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥"

কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদ না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে॥

মালিনী প্রভৃতি মহিলাগণ এই সময়ে সততই শচীদেবীর নিকটে থাকিতেন, প্রিয়াজীর সমবয়স্কা এবং তাঁহা হইতে কিঞ্চিৎ অধিক-বয়স্কা মেয়েরা তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সততই তাঁহাকে ঘেরিয়া থাকিতেন। মলিনী অনেক যত্নে শচীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলেন। মালিনী প্রভৃতি পূর্ব্বেই চন্দ্রশেখরের মুখে নিমাইর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া নিজের নয়নজল নিজে মুছিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া শচীর নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। কোন্ মুখে নিমাইর সন্ন্যাস সংবাদ দিবেন, এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখর এ কথা শচীমাতাকে জানাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল ইহাই বলিয়া দিয়াছিলেন যে "শচীদেবীকে বলিও, সত্বরেই তিনি নিমাইর দেখা পাবেন।"

মালিনী-শচীদেবীকে প্রবোধ দিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন বলিলেন, নিমাই সন্ন্যাস লইয়াছে, তখন শচীদেবী সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে শচীদেবী বলিলেন—"মালিনী, নিমাই শান্তিপুরে এসেছে, আমাকে লইবার জন্য নিতাইকে পাঠায়েছে, কিন্তু গিয়া কি দেখিব, আমার সোনার নিমাই সন্ন্যাসী সাজিয়াছে, মাথা মুড়াইয়াছে, কৌপীন পড়িয়াছে, আমি কোন্ প্রাণে সেই মূর্ত্তি দেখিব ?" এই বলিয়া নীরব হইলেন, আবার কিয়ৎক্ষণ-পরেই "নিমাই নিমাই" বলিয়া ঘরের বাহির হইতে চেষ্টা

করিলেন।* সকলে তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। শ্রীবাস বলিলেন, মা, দোলা আনিতে লোক পাঠাইয়াছি। দোলা আসিলেই আপনাকে লইয়া আমরা সকলেই নিমাইকে দেখিতে শান্তিপুরে যাইব।

নিতাই শচীমাতাকে সংবাদ দিয়া বাহির হইলেন। নগরে ভ্রমিয়া দেখিলেন নবদ্বীপের অবস্থা,—শ্রীকৃষ্ণশূন্য শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায়; —সর্ব্বত্রই শোক ও বিষাদ। এমন কি যে দুই চারি জন লোক শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণমাহাত্ম্য না বুঝিয়া তাঁহার বিদ্বেষী হইয়াছিল, এখন তাহারা পর্য্যন্ত শোকে অধীর † এবং তাঁহাকে দর্শন করার

হেদে গো মালিনীসই চল দেখি যাই।
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিমাই॥
সে চাঁচর কেশহীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব॥
এত বলি শচীমাতা কাতর হইয়া।
নবদ্বীপ মুখে যায় নিমাই বলিয়া॥
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব ঘোষ যায় কান্দিতে কান্দিতে॥

১। কান্দয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়।
একবার নদে এলে ধরিব তার পায়॥
না জানি মহিমাগুণ কহিয়াছি কত।
এইবার লাগাইল পেলে হব অনুগত॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি।
চরণ ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥

জন্য শান্তিপুর অভিমুখে ধাবিত। নিতাই, গৌরহীন নদীয়ায় ভক্তগণের অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। একটী পদে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা দৃষ্ট হয়ঃ—

কান্দে যত ভক্তগণ হইয়া অচেতন
হরি হরি বলে উচ্চৈঃস্বরে।

না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পেলে তার লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গী যত পারিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাশ।
কান্দিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস॥

২। নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক দুর্জ্জন
মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ারগণ॥
প্রভুর সন্ন্যাসশুনি কান্দিয়া বিকলে।
হায় হায় কি করিনু আমরা সকলে।
লইল হরির নাম জীব শত শত।
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত॥
যদি মোরা নামপ্রেম করিতাম গ্রহণ।
না করিত গৌরহরি শিখায় মুণ্ডন॥
হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো সবার।
পতিত-পাবন কেন না কৈনু স্বীকার॥
এইবার গোরা যদি নবদ্বীপে আসে।
চরণ ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে॥

কিবা মোর ধনজন কিবা মোর জীবন
প্রভু ছাড়ি গেল সবাকারে ॥
মাথায় দিয়া হাত বুকে মারে নির্ঘাত
হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা আমা সবা না বলিলা
কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর।
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি কান্দে মুকুন্দ মুরারি
শ্রীধর গদাই গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত তারা কাঁদে অবিরত
আঁখি মুদি কান্দে হরিদাস।
শুনিয়া ক্রন্দন রব নদীয়ার লোক সব
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ সবে পায় মহা শোক
কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া ॥:
নগরিয়া ভক্ত যত সবে শোকে বিগলিত
বালবৃদ্ধ নাহিক বিচার ॥
কাঁদে সবে স্ত্রীপুরুষে নিদারুণ শোকাবেশে
বৃন্দাবন করে হাহাকার ॥

ভক্তগণ যখন শুনিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ শান্তিপুরে আচার্য্যগৃহে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা অমনি শয্যাত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে যাওয়ার উদ্যোগ করিলেন।

আত্মীয় অনাত্মীয় ভক্ত ও অভক্ত সকলেই শান্তিপুরে যাইবার জন্য শচীমার বাড়ীতে সমবেত হইলেন। দোলা আসিল। বৃদ্ধা শচীদেবীকে মালিনী প্রভৃতি ধরাধরি করিয়া দোলার সম্মুখে লইয়া গেলেন। শচী দোলায় উঠিবেন, এই সময়ে অদূরে কতিপয় অল্প-বয়স্কা রমণীর চরণ-অলঙ্কারের শিঞ্জিনীশব্দ শুনিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে অবগুণ্ঠন-আবৃতা প্রিয়াজী সহচরীদের সঙ্গে আসিয়া শচীদেবীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

উপস্থিতজনগণ বুঝিলেন প্রিয়াজীও পতি-দর্শন করার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মহা শঙ্কটে পড়িলেন। প্রিয়াজীকে লইতে প্রভুর নিষেধ। এদিকে প্রিয়াজী প্রাণবল্লভকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে লোকলজ্জা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নিতাই তখন স্তম্ভিত হইয়া প্রভুর নিষেধের কথা ভাবিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিতাই বুঝিয়া লইলেন প্রভুর নিষেধ যুক্তিসঙ্গতই বটে। প্রভু সন্ন্যাস লইয়াছেন, তিনি স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-ভোগসুখ পরিবর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণভজন করিবেন এবং এই উপায়ে জগতের জীবকে ভগবৎপ্রেম শিক্ষা দিবেন। সুতরাং প্রিয়াজীকে তিনি দর্শন দিতে অসমর্থ। এ অবস্থায় তাঁহার যাওয়ায় কোন ফল নাই। নিতাই ভাবিয়া চিন্তিয়া হৃদয়বিদারক নিষেধবাক্য সকলকে শুনাইয়া অতি কাতরস্বরে বলিলেন,—"প্রভুর আদেশে সকলেই নদীয়ায় যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রিয়াজীর যাওয়ার আদেশ নাই।"

নিতাইর এই বাক্য শুনিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন। শচী সহসা গম্ভীরভাবে বলিলেন "তবে আমিও যাব না।"

শচীর বাক্যে সকলেই বিস্মিত হইলেন। ইহাতে প্রিয়াজী আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শাশুড়ীর আঁচল ছাড়িয়া দিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে নিঃশব্দে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়াজীর মনের দুঃখ বুঝিয়া সকলেই যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। নিতাইর নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। শচীমা দোলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি অমনি ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন,—কিয়ৎ-ক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "আমার শান্তিপুরে যাওয়া হইবে না। আমাকে বৌমার নিকটে লইয়া চল।"

শচী প্রিয়াজীর কাছে গিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "মা আমি শান্তিপুরে যাইব না।" প্রিয়াজী উৎসাহের সহিত বলিলেন, "আপনি অবশ্যই যাইবেন।" আমার জন্য ভাবিবেন না"

এই বলিয়া প্রিয়াজী নীরব হইলেন। চিত্তসংযমে শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মী-সমূহের আদর্শ। তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দের মুখে প্রভুর আদেশবাণী শুনিয়া প্রথমতঃ বজ্রাঘাতের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ের মেঘ সরিয়া গেল, চিত্ত-পরিস্কার হইল, সেই নির্ম্মল চিত্তাকাশে আনন্দচন্দ্র ফুটিয়া উঠিল।

প্রথমতঃ তাঁহার মনে হইতেছিল "একি অসঙ্গত আদেশ! জগতের লোকে তাঁহাকে পাইবে, কেবল আমিই দেখিতে পাইব না। আমি এতই অপরাধিনী? আমার অপরাধই বা কি? আমি

তো কোন অপরাধ দেখিতে পাই না। আমার প্রাণের প্রাণ,—প্রাণবল্লভ আমায় কত ভালবাসেন। যেদিন তিনি বুকে ছুড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, সেদিবস ও সারানিশি আমায় কত আদরে,—কত সোহাগে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। আমার একমাত্র অপরাধ এই যে আমি তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, তিনি এখন সন্ন্যাসী,—আর এখন আমি তাঁহার সন্ন্যাসের শত্রু। শত্রুর মুখ কে দেখিতে চায়? আমি যদি তাহার ঘরণী না হইতাম তবে আমি অবশ্যই তাহাকে দেখিতে পাইতাম *।

আবার প্রিয়াজী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—ছি ছি, একি মনে করিতেছি, আমাকে কেন তিনি শত্রু মনে করিবেন? তাঁহার ন্যায় প্রেমিক জগতে আর কে আছে? তিনি প্রেমময়। জীবের হিতের জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস। তাঁহার সন্ন্যাসে জীব উদ্ধার পাইবে। জীবের উদ্ধারের জন্য আমাকে কাঁদিতে হইবে, ইহাই তাঁহার বিধান। আমি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী। যাহা তাহার

---

* আমা লাগি প্রভু মোর করিল সন্ন্যাস।
ফিরিয়া যদ্যপি আইল অদ্বৈতের বাস॥
স্ত্রী পুরুষ বালবৃদ্ধ যুবতী যুবক।
দেখিতে আনন্দে ধেয়ে চলে সব লোক॥
কোন অপরাধে কৈনু মুঞি অভাগিনী।
দেখিতেও অধিকার না ধরে পাষাণী॥
প্রভুর রমণী যদি না করিত বিধি।
তবেত পাইতু দেখা প্রভুগুণনিধি॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

বিধান, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীরও তাহাই করাই উচিত। আমি তাঁহার সন্ন্যাসের বিরুদ্ধ কাজ কেন করিব?

আমার প্রাণবল্লভ ত্রিজগতের নাথ, আমি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের কথা আর কি আছে? তিনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, তাই আমায় দেখা দিবেন না। তাহাতে আমার অভিমানের বিষয় কি, অসহ্য দুঃখই বা কি? তিনি আমাকে দেখা দিন বা না দিন, তিনিত আমারই প্রাণবল্লভ! আমায় ত্যাগ করিয়া তিনি জগৎকে দেখাইলেন যে জীবের জন্য তিনি তাঁহার প্রণয়িনী পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছেন। আমাকে ত্যাগ করাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম ত্যাগের কার্য্য। ইহাতে বুঝিতেছি আমি তাঁহার অতি প্রিয়জন। ইহার উপরে আমার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?

এই সৌভাগ্য-আনন্দে প্রিয়াজীর হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তিনি মনে মনে আপন চিত্তকে প্রবোধ দিয়া প্রসন্ন-গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। শচীমা বধূর মুখের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শচী বলিলেন,—মা তুমি আমাকে শান্তিপুরে যাইতে বলিতেছ, কিন্তু আমি তোমায় ছাড়িয়া শান্তিপুরে যাইব না। তোমার অবস্থা দেখিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছে। * আমার প্রাণও বিদীর্ণ হইতেছে।

---

* বিষ্ণুপ্রিয়া দশা দেখি যত ভক্তগণ।
দ্বিগুণ হইল দুঃখ; না করে গমন॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

প্রিয়াজী। মা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি আমার কোনও দুঃখ নাই। আপনি না গেলেই আমি দুঃখিত হইব।

শচী এবার বুঝিলেন বউমা প্রকৃতপক্ষেই আনন্দের সহিত তাঁহাকে শান্তিপুরে যাইতে অনুমতি দিতেছেন। শচী তখন নিরুদ্বেগে শান্তিপুরে যাইতে সম্মত হইলেন। প্রিয়াজী সঙ্গিণীগণ-সহ গৃহে রহিলেন।

ভক্তগণ শচীদেবীকে দোলায় চড়াইয়া "হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ" ধ্বনি করিতে করিতে শান্তিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অগণ্য লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিল। * মুরারি গুপ্ত স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়া লিখিয়াছেন:—

চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী আর সব চলিলা পশ্চাতে॥

---

* লক্ষ লক্ষ লোকে ধায় উর্দ্ধমুখ করি
অন্নজল ঘরদ্বার সব পরি হরি॥
ঘর হইতে বাহির না হয় কুলনারী।
তারাও ধাইয়া যায় সব পরিহরি॥
বৃদ্ধসব নড়ি হাতে মন্দ মন্দ ধায়।
শিশুগণ আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ধায়॥
যে সব পণ্ডিত পূর্ব্বে উপহাস কৈল।
তাহারাও উৎসাহেতে ধাইয়া চলিল॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

"হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ" সবাকার মুখে।
নয়নে জলের ধারা হিয়া ফাটে দুঃখে॥
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া।
নিতাইর বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥
দেখিতে গৌরাঙ্গমুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুরে ধায় সবে হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাস॥
হইল পুরুষ শূন্য নদীয়া নগরী।
সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি॥

সমগ্র নদীয়া প্রায় লোকশূন্য হইল। এদিকে প্রিয়াজী শচী-মাতাকে যখন শান্তিপুরে যাইতে অনুমতি করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে স্বীয় সৌভাগ্য-গর্ব্বে আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীভগবান্ প্রিয়াজীর হৃদয়ে সে জ্ঞান অধিক্ষণ রাখিলেন না। প্রিয়াজীয় :বিরহ-যাতনা-জনিত নয়ন-জল-ধারাই জীব-উদ্ধারের খাটি পতিতপাবনী জাহ্নবী-ধারা। প্রিয়াজীর হৃদয়ে অমনি গৌর-বিরহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। তিনি আপন মন্দিরে আকুল হইয়া কান্দিতে লাগিলেন ঃ—

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লুটায়ে লুটায়ে ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে পাথারে ভাসায়ে গেলে
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥
এঘর জননী ছাড়ি মুঞি অনাথিনী করি
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস।

বেদে শুনি রঘুনাথ লইয়া জানকী সাথ
তবে সে করিল বনবাস ॥
পূরবে নন্দের বালা যবে মধুপুরে গেলা
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজতত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তা সবার প্রাণ ॥
চাঁদমুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব
না করিব সে সুখ-বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিব
বাসুর জীবনে নাই আশ ॥

সঙ্গিনীগণের প্রবোধে এবং পুনশ্চ জ্ঞানের উদয়ে প্রিয়াজী কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন।

এদিকে অনতিবিলম্বে শচীর দোলা শান্তিপুরে উপনীত হইল। শচীমাতার সঙ্গীয় ভক্তগণ দেখিলেন শান্তিপুর একবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে, পাদবিক্ষেপের স্থান নাই,—যেথানে সেথানে কেবলই গৌরাঙ্গের কথা,—শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য আকুলি ব্যাকুলি। শচীমা দোলায় থাকিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ তাঁহার দোলার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। আচার্য্যের প্রাঙ্গনে দোলা নামামাত্রই শ্রীগৌরাঙ্গ বহুদূর হইতে অপরাধীর ন্যায় করযোড় করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, মায়ের দুইখানি চরণ ধরিয়া প্রণত হইয়া রহিলেন। শচীমা একহাত শ্রীগৌরাঙ্গের মাথায়

রাখিয়া অপর হাতে চক্ষের জল মুছিতে ছিলেন, কিন্তু নয়ন-জল নিবারণ কবিতে পারিলেন না, মায়ের নয়ন-সলিলে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পরিসিক্ত হইলেন।

তিনি অমনি দাঁড়াইয়া মায়ের হাত ধরিয়া তাঁহাকে দোলা হইতে নামাইলেন। শচী স্তম্ভিত হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। নিমাই জননীকে আবার প্রণাম করিয়া স্তব পাঠ ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। নিমাই গদ্‌গদ্ কণ্ঠে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন ঃ—

মা

আদ্যা মহামায়া তুমি, প্রেমের প্রতিমা তুমি
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি,—দয়া অবতার।
জনম-নিদান তুমি ভকতি-মূরতি তুমি,
মুক্তির কারণ তুমি,—জগতের সার ॥
জীবনদায়িনী তুমি, জীবনরক্ষিণী তুমি,
জীবন-নন্দনী তুমি,—সৌন্দর্য্য-আধার।
তুমি জ্ঞান, তুমি শক্তি, তুমি মাগো কৃপা-ভক্তি,
অন্তিমে মা তুমি গতি,—মূর্ত্তি-করুণার ॥
তোমা হ'তে এই দেহ, ভুলিব না তব স্নেহ,
অন্য ধর্ম্ম অন্য কর্ম্ম—সকলি অসার।
তুমি যদি কৃপা কর কৃষ্ণভক্তি দিতে পার
আমি মাগো চিরদিন,—তোমার তোমার ॥

নিমাই করযোড়ে এইরূপ স্তব করিতে করিতে এক

একবার জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হইতে লাগিলেন।

অসংখ্য লোক স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া নিমাইর মাতৃভক্তি দেখিতেছেন। অতিবড় পাষণ্ডীদের হৃদয়েও মাতৃভক্তি উদয় হইয়া তাহাদের হৃদয় দ্রব করিয়া দিতেছে।

কিন্তু শচীদেবীর নিকট ইহা একবারেই ভাল লাগিতেছে না। পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক, অরুণ-বহির্ব্বাস ও কৌপীন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তিনি নয়ন-জল সম্বরণ করিতে গিয়াও সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার দেহ কাঁপিতেছে। নিমাই দেখিলেন,—মা বুঝি মূর্চ্ছিত হইবেন। অদ্বৈত আচার্য্যও সেইখানে ছিলেন, তিনি ভাবগতি দেখিয়া শচীদেবীকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া সুস্থ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মায়ের নিকট গিয়া বসিলেন। বৃদ্ধা শচীদেবী তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মনের আবেগে যে সকল বিলাপ করিলেন, তাহা ভক্তগণ অনুমানে বুঝিয়া লইতে পারেন, কিন্তু আমাদের ভাষায় তাহার বর্ণনা অসম্ভব। বাসুঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার রচিত পদটী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইলা সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ ধরেছে সন্ন্যাসিবেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥

করযোড় করি আগে দাঁড়ালো মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিল চাঁদ মুখে
কান্দে শচী গলাটি ধরিয়া॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত
এ দুঃখ কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥
এ ডোর কৌপীন পড়ি কি লাগিয়া দণ্ডধারী
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্তে থাকিতে মায় উহা নাকি দেখা যায়
কার বোলে হইলে বিরাগী॥"
গৌরাঙ্গের বৈরাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে
ত্রিজগতে করিল ঘোষণা॥

নবীন সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিয়া জননীর চরণ দর্শন করিতে লাগিলেন। শচীদেবী আবার বলিতেছেন ঃ—

হাদেরে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই।
অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই॥
এত বলি ধরে শচী গৌরাঙ্গের গলে।
স্নেহভাবে চুম্ব খায় বদন কমলে॥

মুই বৃদ্ধা মাতা তোর, মোরে ফেলাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বধূ দিলি গলায় বাঁধিয়া॥
তোর লাগি কান্দে যত নদীয়ার লোক।
ঘরেরে চলরে বাছা দূরে যাক্ শোক॥
শ্রীবাস হরিদাস যত ভক্তগণ।
তা সবারে লয়ে বাছা করগে কীর্ত্তন॥
মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস।
এ সব ছাড়িয়ে কেন করিলে সন্ন্যাস॥
যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া।
পুন যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণ আনিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর বাণী।
পুনরায় নদে চল গৌর গুণমণি॥

নিমাই অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া এক একবার ঢল-ঢল নয়নে মায়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন—যেন কৃপার ভিখারী।

শ্রীগৌরসুন্দর জননীকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য কাতরকণ্ঠে যাহা বলিয়াছিলেন, বাসুদেব ঘোষের একটী পদে তাহা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

শুনিয়া মায়ের বাণী কহে প্রভু গুণমণি
"শুন মাতা আমার বচন।
জন্মে জন্মে মাতা তুমি তোমার বালক আমি
এই সব বিধির নিয়ম॥

ধ্রুবের জননী ছিল পুত্রকে বৈরাগ্য দিল
ভজে তেঁই দেব চক্রপাণি।
রঘুনাথ ছাড়ি ভোগে বনে বনে ফিরে শোকে
ঝুরে সদা কৌশল্যা জননী॥
তবে শেষ-দ্বাপরে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে
ঘরে নন্দরাণী নন্দ পিতা।
সর্ব্বপরে এই হয়ে এ কথা অন্যথা নহে
মিথ্যা শোক করিতেছ মাতা॥
বিধাতা নির্ব্বন্ধ যাহা কেবা খণ্ডাইবে তাহা
এত জানি স্থির কর মন।
ভজ কৃষ্ণ কর সার মিছা এহি সংসার
পাইয়া পরম পদধন॥
রোদন করিলে তুমি ডাকিলে আসিব আমি
এই দেহ তোমার পালিত।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে যাই নীলাচল পুরে
তুমি চিত্ত কর সন্নিহিত॥"
প্রভু স্তুতিবাণী কহে শচী নির্ব্বচনে রহে
পড়ে জল নয়ন বহিয়া।
বাসু কহে গৌরহরি এই নিবেদন করি
পুনরপি চলহ নদীয়া॥

শচী বলিলেন,—নিমাই তুমি কৌপীন পরিয়া, দণ্ডকরঙ্গ হাতে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে ঘুরিয়া বেড়াইবে,

ছেঁড়াকাঁথা গায়ে দিয়া শীত কাটাইবে, গ্রীষ্মের দারুণ রোদে কত কষ্ট পাইবে। ক্ষুধার সময়ে কে তোমায় এক গ্রাস অন্ন দিবে, আর আমি অভাগিনী তোমার দুঃখ ভাবিয়া ভাবিয়া কিরূপে ঘরের তলে বাস করিব? আমি তোমার মা হইয়া কিরূপে এ দুঃখ সহিব? আমার সোণার প্রতিমা বউমারই বা কি হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। আমি তোমাকে ঘরে নিতে আসিয়াছি। মনের আবেগে যাহা করিয়াছ, তাহার আর কি হইবে? আবার ব্রাহ্মণ দ্বারা তোমার পৈতা দিব, চল, এখন বাড়ী চল।"

এই বলিয়া শচী কাঁদিতে লাগিলেন। নিমাই তখন গদ্গদকণ্ঠে অপরাধীর ন্যায় করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—মা জননি, চিত্তের আবেগে আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে তোমার দারুণ যাতনা হইয়াছে, আমি তাহার সকলি বুঝিতে পারি, তোমাকে দুঃখ দিলে আমার কোনও ধর্ম্ম হইবে না। এ দেহ তোমার, তুমি যাহা ভাল মনে কর, আমি তাহাই করিব। যদি আমার আবার সংসারে প্রবেশ করাই তুমি ভাল মনে কর, আমার তাহাই কর্ত্তব্য। মা, এখন তুমি বিশ্রাম কর।"

এই বলিয়া প্রভু কিয়ৎক্ষণের তরে বাহিরে আসিলেন। সীতাদেবী শচীমাতাকে নানা প্রকার বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং ইহাও বলিলেন "দেবি, শ্রীগৌরের সন্ন্যাস করা বা না করা এখন আপনার বাক্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে। আপনি যাহা আদেশ করিবেন, নিমাই তাহাই করিবেন। এখন আপনি শান্ত হউন।"

কিন্তু ইহাতে শচীদেবীর মুখখানি আরও গম্ভীর এবং আরও যেন মলিন দেখাইতে লাগিল। এদিকে প্রভু নদীয়ার ভক্তগণের নিকট আসিয়া বলিলেন,—আমি জননী ও তোমাদিগকে দুঃখ দিয়া বৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, কিন্তু যাইতে পারিলাম না। নদীয়াবাসীরা আমার জন্ত কাতর। আমি মাথা মুড়াইয়া পৈতা ফেলিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। এখন সংসারে প্রবেশ করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমি নিন্দনীয় হইব। কিন্তু এ দিকে আবার আমার বিরহে জননী প্রাণে মরিবেন,—তোমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। মায়ের দুঃখ সহিতে না পারিয়া আমি মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি, যে তাঁহার আদেশ ভিন্ন আর কোনও কার্য্য করিব না। তিনি যদি এখন সংসারেও প্রবেশ করিতে বলেন, ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমি তাহাই করিতে বাধ্য। এখন আমি মায়ের আদেশ শুনিতে চাই। আমি নিজে আর কিছু বলিব না। তিনি নিজের মনের কথা সরল-ভাবে আমার নিকট বলিতেও সমর্থ হইবেন না। তোমরা যাইয়া তাঁহাকে বল, আমি চিরদিনই তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস। তিনি যদি বলেন, আমার সংসারে প্রবেশ করাই ভাল,—আমি নিশ্চয়ই তাহাই করিব।”

ভক্তগণ ইহাতে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন আবার হয়ত গৌরশশী নদীয়ায় উদিত হইবেন, আবার হয়ত নদীয়ার আঁধার দূর হইবে। কেননা, শচীমা কখনও নিমাইকে ঘর ছাড়িয়া উদাসীন হইতে অনুমতি করিবেন না। তাঁহারা প্রফুল্লমনে শচীদেবীর নিকটে যাইয়া প্রভুর কথা জানাইলেন।

শচীদেবী নীরবে এই কথা শুনিলেন, নীরবে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু নীরবে গড়াইয়া পড়িল। তিনি কিছুক্ষণ মুখখানি অবনত করিয়া রহিলেন, কোনও কথা তাঁহার মুখে ফুটিল না।

উৎকণ্ঠিত ভক্তগণ শচীদেবীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন,—এ কি মা, এমন সুখের সময়ে আপনার মুখ এমন মলিন হইল কেন? একবার বলিয়া ফেলুন "নিমাই এখন বাড়ী চল" এই বলিয়া উঁহার হাত ধরিয়া নবদ্বীপে লইয়া চলুন।"

শচীদেবী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন "নিমাই, আমার অনুমতি চাহিতেছে, আমার যে কি সাধ, তাহা ত নিমাইর অজ্ঞাত নয়। নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া জগতের যত দুঃখ আছে, সেই সকল দুঃখ সহিবে, আর আমি ঘরে বসিয়া থাকিব, ইহাও কি মায়ের প্রাণে সহ্য হয়? নিমাইকে যদি বাড়ী লইয়া যাই, তবে বউমার, আমার ও তোমাদের যাতনা অবশ্যই দূর হয়। কিন্তু আমি ভাবিতেছি, তাহাতে নিমাইর মঙ্গল হয় কি না? বাছা আমার সন্ন্যাস লইয়াছে, সন্ন্যাস লইয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার ধর্ম্মনষ্ট হইবে। অপরন্তু লোকতঃও নিন্দা হইবে। আমি মা হইয়া বাছার এই অমঙ্গল কিরূপে করিব? বরং আমি শোকে শোকে মরিয়া যাইব, তাহাও ভাল, তথাপি নিমাইর ধর্ম্মনষ্ট করিয়া তাহার অমঙ্গল করিতে পারিব না। নিমাই যাহা করিয়াছে, দৃঢ়রূপে সেইরূপ অনুষ্ঠান আচরণ করুক। তবে নিমাই নীলাচলে থাকিলে ভক্তগণের যাতায়াতে আমি সতত তাহার সংবাদ পাইব।"

ধন্য শচীদেবী,—তোমার ধর্ম্ম-জ্ঞান এত প্রবল না হইলে কি স্বয়ং শ্রীভগবান্ তোমার উদরে জন্মগ্রহণ করেন ?

শচীমাতার উক্ত কথা শুনিয়া ভক্তগণ বজ্রাহতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন যথা :—

শচীর বচন শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ।
বিবশ হইয়া কহে করিয়া রোদন॥
"হেনবাক্য কেন মাতা কহিলে আপনে।
শ্রুতিবাক্যসম ইহা খণ্ডে কোন জনে॥
নীলাচলে যাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে।
দুর্লঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কেন বা কহিলে॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

ভক্তগণের হৃদয়ে সহসা যে আশার আলোক প্রবলরূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, নির্ব্বাণ-উন্মুখ দীপের ন্যায় অমনি তাহা নিভিয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে অবস্থান করিবেন, শচীদেবীর বাক্যে তাহা একবারে স্থির হইয়া গেল। শচীদেবী শেষবার অনুমতি দিয়া ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাঠাকুরাণীর অনেক প্রযত্নে তিনি চেতনা পাইলেন বটে, কিন্তু একবারে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে পড়িয়া রহিলেন। ভক্তগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বাসুঘোষ লিখিয়াছেন :—

শ্রীবাসের উচ্চরায় পাষাণে মিলায়ে যায়
গদাধর না বাঁচে পরাণে।

বহিছে প্রেমের ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ও দুটী নয়নে॥
কান্দে শান্তিপুর নাথ শিরে দিয়ে দুটি হাত
কি হৈল কি হৈল বলি কান্দে।
অদ্বৈত-ঘরণী কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
মরা যেন পড়িল ভূমিতে॥
"এ তোমার জননী ছাড়ি যুবতী রমণী এড়ি
এবে তোমার সন্ন্যাসে গমন।
গঙ্গায় শরণ নিব এ তনু গঙ্গায় দিব"
বাসুঘোষের অনলে জীবন॥

নিমাই ভক্তগণের মুখে মাতার মনোগত কথা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গ আরম্ভ হইল। এইরূপে কীর্ত্তনানন্দে দশদিন অতিবাহিত হইল। দশদিনান্তে প্রভাত সময়ে শ্রীগৌর-সুন্দর মায়ের নিকটে গেলেন, ভক্তগণকেও সেই স্থানে আহ্বান করিলেন, আহ্বান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে গদ্‌গদভাবে বলিলেন—"আজ আমি সকলের নিকট শেষ বিদায় লইতেছি। তোমরা আমার চিরসুহৃদ্, তোমাদের ঋণ কখনও শোধিতে পারিব না, তোমরা আমার প্রতি দয়া রেখো, তোমরা গৃহে গমন করিয়া কৃষ্ণভজন কর, আমি বৃন্দাবনে যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নীলাচলে চলিলাম, সকলে আশীর্ব্বাদ করিও,—নীলাচলচন্দ্র যেন আমায় দয়া করেন।"

এই কথার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া, তাঁহার

পদধূলি লইয়া .নিরপেক্ষভাবে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। আর শান্তিপুরে অমনি ক্রন্দনের রোল উঠিল।*

চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত হইয়াছে :—

এ বোল বলিয়া প্রভু বোলে হরিবোল।
সত্বরে চলিলা, উঠে ক্রন্দনের রোল॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে আর একটুকু বিশেষ বিবরণ আছে। তাহা এই :—

---

* শ্রীপ্রভু করুণ স্বরে ভকত প্রবোধ করে
কহে কথা কাঁদিতে কাঁদিতে।
দুটি হাত যোড় করি নিবেদয়ে গৌরহরি
"সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে॥
ছাড়ি নবদ্বীপ বাস পরিনু অরুণ বাস
মাতা আর পত্নীরে ছাড়িয়া।
মনে এবে এই আশ করি নীলাচলে বাস
তোমা সবা অনুমতি পেয়ে॥
নীলাচল নদীয়াতে লোক করে যাতায়াতে
তাহাতে পাইবে তত্ত্ব মোর।"
এত বলি গৌরহরি নমো নারায়ণ করি
অদ্বৈত ধরিয়া দিছে কোর॥
শচীরে প্রবোধ দিয়ে তার পদধূলি লয়ে
নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল।
এ রূপ করুণ বোলে গোরা চলে নীলাচলে
শান্তিপুরে ক্রন্দন ভরিল॥

মায়ের চরণে প্রভু কৈল নমস্কার।
শচীর নয়নে বহে অবিচ্ছিন্ন ধার॥
প্রভু বলে "মাতা দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সর্ব্বসিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ-আরাধনে॥
যদি আমা প্রতি শ্রদ্ধা আছে সবাকার।
কৃষ্ণ ভজ, তবে সঙ্গ পাইবে আমার॥"

প্রভু তখন সীতাঠাকুরাণী ও অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বিদায় লইতে প্রয়াস পাইলেন। ইহাতে আচার্য্য ও সীতাদেবী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। ইঁহাদের রোদনে গৌরসুন্দরের নয়ন হইতে শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। প্রভু বলিলেন, আচার্য্য তুমি কেন প্রাকৃত লোকের ন্যায় শোক করিতেছ, যদি নীলাচলে না যাই তবে এই লীলার কোনও সার্থকতা হইবে না, তুমি যে পাতকি-উদ্ধারের জন্য আমায় ডাকিয়াছ, আমি এখানে থাকিলে তোমার সেই উদ্দেশ্য বিফল হইবে।*

---

* ১। প্রভু মোর অদ্বৈত মন্দির ছাড়ি চলে।
শিরে দিয়ে দুটি হাত, কান্দে শান্তিপুর নাথ, কিবা ছিল কিবা হৈল বলে।
কৃপা করি মোর ঘরে, অবধূত বিশ্বম্ভরে, কত রূপ করিলা বিহার।
এবে সেই দুই ভাই, কি দোষে ছাড়িয়া যাই, শান্তিপুর করিয়া আঁধার॥
অদ্বৈত-ঘরণী কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, প্রভু বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, প্রেমকীর্ত্তন করি রঙ্গে, কে আর নাচিবে মোর ঘরে॥
শান্তিপুরবাসী যত, তারা কান্দে অবিরত, লুটায়ে লুটায়ে ভূমিতলে।
এ শচীনন্দন ভণে, শান্তিপুর হৈল যেন, পূরবে শুনিল যে গোকুলে॥

মাতাকে সান্তনা দিয়া শ্রীল অদ্বৈতাদি ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচল অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিলেন।

ধাইয়া চলিল পাছে সব ভক্তগণ।
কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন॥
কান্দিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ।
উঠিয়া পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ॥

দয়াময় তখন তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ তোমরা আপন ঘরে ফিরিয়া যাইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন কর। কৃষ্ণভজনে-শোক থাকে না। আর একটী কথা এই যে যাহারা অনুরাগে

২। অদ্বৈতের বিলাপে প্রভু হইলা বিকল।
শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে পড়ে জল॥
কহেন অদ্বৈতাচার্য্যে এত কেন ভ্রম।
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম॥
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা।
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা॥
কিরূপে বা হরিনাম হইবে প্রচার।
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার॥
প্রাকৃত লোকের প্রায় শোক কেন কর।
তব সঙ্গে সদা আমি এ বিশ্বাস কর॥"
প্রভু বাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ।
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাসু ঘোষ॥

কৃষ্ণভজন করিবেন, তাঁহারা সততই আপন হৃদয়ে আমাকে দেখিতে পাইবেন :—

কাহারো হৃদয়ে নহিবেক দুঃখ-শোক।
সঙ্কীর্ত্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্ব্বলোক॥
কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥

চৈতন্যমঙ্গল।

শ্রীগৌরাঙ্গ সজলনয়নে এই কথা বলিতে বলিতে করযোড়ে ভক্তগণকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। ভক্তগণও সজল-নয়নে বজ্রাহতের ন্যায় স্থগিত হইয়া দাঁড়াইলেন, কেহবা ভূতলে পড়িয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরসুন্দর আর কোনদিকে না তাকাইয়া দ্রুতবেগে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য ও সীতামাতা আদি গৌর-বিরহে কান্দিতে কান্দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কীর্ত্তনানন্দ-মুখরিত শান্তিপুর সহসা নীরব হইল, শান্তিপুরের চাঁদের হাট সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। নদীয়ার ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বিদায় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিতা শচীমাতাকে লইয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। সর্ব্বত্রই হাহাকার ও অবিরাম নয়ন-ধারা বহিয়া চলিল।

শচীমাতার বিলাপ।

মালিনী প্রভৃতি মহিলারা বহুযত্নে শচীদেবীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। তিনি চেতনা পাইয়া দেখিলেন, তাঁহার পদতলে বউমা পড়িয়া রহিয়াছেন। শচীদেবী প্রিয়াজীর মুখের দিকে চাহিয়া দ্বিগুণ শোকবেগে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন কি আবার তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। প্রিয়াজী তখন নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া প্রভুর আদেশ স্মরণ করিলেন। প্রভু যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আমি কেবল তোমারই ভরসায় মাকে রাখিয়া জীবোদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস লইতেছি, তুমি আমার হইয়া আমার মাকে দেখিও।"

প্রিয়াজী এই আদেশ স্মরণ করিয়া নিজের নয়নজল মুছিয়া মায়ের সম্মুখে বসিয়া বলিলেন,—"মা, আপনি আমার জন্য ভাবিবেন না। আপনার চরণ-সেবার ভার আমার উপরে। আপনার চরণসেবা করিতে পারিলেই আমার দুঃখ দূর হইবে। আপনি ধৈর্য্য ধরুন, শান্ত হউন।"

বধূমাতার কথায় এবং তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রসন্ন-গম্ভীর ভাব দেখিয়া শচীমাতা কোনরূপে নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া বলিলেন—"মা, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন আমার অধিক যাতনা কেবল তোমার কথা ভাবিয়া। তোমার এই কচি বয়স,"—এই কথা বলিতে বলিতে আবার শচীমাতা কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রিয়াজী নিজের অঞ্চলে তাঁহার চক্ষুর জল মুছাইয়া বলিলেন—"মা, আপনার চরণাশীর্ব্বাদে আমি সকল দুঃখই সহিতে পারিব। আমি বুঝিয়াছি, এ দেহ কিছুই নয়, এ দেহের সুখও কিছুই নয়। আমার জন্য আপনি ভাবিবেন না। তবে এক কথা এই যে আপনাকে অস্থির দেখলে আমি স্থির থাকিতে পারিব না। আপনি আমার দিকে চাহিয়া স্থির থাকিবেন, আমি আপনার চরণের চিরদাসী, চিরদিন এই চরণসেবা করিব।"

প্রিয়াজী এমনভাবে এই কথাগুলি বলিলেন যে তাহাতে শচী-দেবী বিস্মিতা হইয়া বউমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শচী বলিলেন,—"মা লক্ষ্মী, আমার আবার সেবা কি? তোমার মুখখানি প্রসন্ন দেখিলেই আমি সুস্থির থাকিব। তবে আমার চক্ষু আমার বাধ্য নয়, চখের জলঝরা আমি নিবারণ করিতে পারিব না, উহা দেখিয়া তুমি সর্ব্বদা ব্যস্ত হইও না। আমার দীর্ঘনিশ্বাসও থামাইতে পারিব না। কিন্তু তোমার মুখখানি মলিন দেখিলে আমার হৃদয়ের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।"

প্রিয়াজী যদিও গৌরবিরহে অধীরভাবে বিলাপ করিতেছিলেন শাশুড়ীর আগমনে সে ভাব সংবরণ করিলেন। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল।

প্রিয়াজীর যে কি দারুণ শঙ্কট পাঠকমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। শ্রীগৌর-বিরহে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে অথচ শাশুড়ীর ভয়ে তাহার ফুকারিয়া কান্দিবার যো নাই, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হৃদয়ের তাপ বাহির করার উপায় নাই, নীরবে নয়নজল

মোচন করারও সাধ্য নাই। হৃদয়ের আগুন হৃদয়ে চাপা দিয়া শাশুড়ীর নিকট প্রিয়াজীকে প্রসন্নবদনে থাকিতে হইবে, কেননা তাঁহার মলিনমুখ দেখিলে শাশুড়ীর হৃদয়ের আগুন শতগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিবে। শ্রীভগবানের মহাশক্তিময়ী কনকপ্রতিমা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভিন্ন জগতে এইরূপভাবে শোকের আগুনে সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত চাপা দিয়া রাখিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের বিদায়ের পরে শচীমাতা অনেক সময়ই তন্দ্রাতে যাপন করিতেন, তন্দ্রাতে তাঁহার বিরহ-বোধ অনেক কম থাকিত। প্রায় সততই স্বপ্নে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাইতেন, যথা পদে :—

ভাবে গদগদ বুক শ্রীগৌরাঙ্গের চাঁদমুখ
ভাবিতে শুইল শচীমায়।
কনক কষিত তনু গৌরসুন্দর জনু
আচম্বিতে দরশন পায়॥
মায়েরে দেখিল গোরা অরুণ নয়নে ধারা
চরণের ধূলি নিল শিরে॥
সচকিতে উঠি মায় ধেয়ে কোলে করে তায়
ঝরঝর নয়নের নীরে॥
দুহু প্রেমে দুঁহু কান্দে দুহুঁ থির নাহি বাঁধে
কহে মাতা গদ গদ ভাষে।
"আন্ধল করিয়া মোরে ছাড়ি গেলা দেশান্তরে
প্রাণহীন,—তোমার হুতাশে॥

যে হউ সে হউ বাছা আর না যাইও কোথা
ঘরে বসি করহ কীর্ত্তন।
শ্রীবাসাদি সহচর পরম বৈষ্ণব বর,
কি ধরম সন্ন্যাস-করণ ॥"
এতেক কহিতে কথা জাগিলেন শচীমাতা
আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকরি কাঁদিয়া উঠে ধারা বহে দুই দিঠে
প্রেমদাস মরিয়া না যায় ॥

শোকাকুলা জননীর নিদ্রাতেই শান্তি,—স্বপ্নে সুখ-সম্মিলন; কিন্তু জাগরণেই,—মরণ। শচীমাতারও এই দশাই ঘটিত।

নিদ্রাভঙ্গে শচীমাতা নিশি অবশেষে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে নিমাইর উদ্দেশে ॥
দুখিনী মায়েরে যদি করিবি স্মরণ।
দেখা দিয়া কেন তবে লুকালি বাপধন ॥
মরমে মরিয়া ছিনু হারাঞা বিশাই।
তোরে পেয়ে প্রাণ পুন পাইনু নিমাই ॥
নিমাই পণ্ডিত সবে কহিত সংসারে।
মাতৃবধ করাইতে কি পড়াইনু তোরে ॥
"বৃদ্ধকালে পালে, করে মৈলে পিণ্ডদান।"
কামনা করয়ে লোকে এ লাগি সন্তান ॥
আমার কপাল-ক্রমে সব বিপরীত।
সন্ন্যাসী হইলি বাছা এই কি উচিত ॥

সন্ন্যাসী হইলি তবু পাইতাম সুখ।
দেখিতাম দিনান্তে যদ্যপি তোর মুখ॥

শচীদেবী কেবল নিজের দুঃখের জন্য ব্যাকুল নহেন, বউমার জন্যই তাঁহার যত কিছু চিন্তা। তিনি তাই বলিতেছেন :—

"আমি যে মরিব বাছা তার নাহি দায়।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥
এ নব যৌবন বধূর জ্বলন্ত আগুনি।
জ্বালি কিরে গেলি বাছা পোড়াতে জননী॥
জগতের জীব লাগি পরাণ কাঁদিল।
জননী গৃহিণী তোর কি দোষ করিল॥"
শচীর বিলাপ শুনি বৃক্ষপত্র ঝরে।
পশুপাখী কাঁদে আর পাষাণ বিদরে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা সম্বিত হারায়।
তা দেখি মালিনী দুখে করে হায় হায়॥
কি করিলে গোরাচাঁদ কহে প্রেমদাস।
মাতৃহত্যা করিতে কি লইলা সন্ন্যাস॥

শচীমাতার রোদনে সেখানে মালিনী উপস্থিত হইলেন। মালিনীকে দেখিয়া শচীমাতা স্বপ্নের বিবরণ বলিতে লাগিলেন :—

শুনলো মালিনী সই দুখের বিবরণ।
আজুকার নিশিশেষে, নিদারুণ নিদ্রাবেশে
দেখিয়াছি সুখের স্বপন॥

যেন বহুদিন পরে আমারে মনেতে কৈরে
মা বলি আসিয়াছিল নিমাই রতন।
কিন্তু যেই মেলিনু আঁখি আচম্বিতে চেয়ে দেখি
প্রাণের নিমাই মোর হৈল অদর্শন॥
নাই সে চাঁচর কেশ অস্থি-চর্ম্ম অবশেষ
বহির্ব্বাস কৌপীন পিন্ধনে।
ধূলায় সে অঙ্গ-ভরা যেমন পাগল পারা
প্রেমধারা বহে দুনয়নে॥
হারা হৈয়া বিশাই পাইনু সোণার নিমাই
পূর্ব্ব দুখ ছিনু পাসরিয়া।
কিন্তু হৈল সর্ব্বনাশ কৈল নিমাই সন্ন্যাস
রাখি ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া॥
এ পূর্ণ যৌবন তার যেন জ্বলন্ত অঙ্গার
তাহা লইয়া সদা করি বাস।
বিনে প্রাণের নিমাই মা বলিতে কেহ নাই
শুনি ঝরে এ বল্লভদাস॥

শচীদেবী মালিনীকে পাইয়া অপর একদিন আবার স্বপ্নের কথা বলিতেছেন :—

আজিকার স্বপ্নের কথা শুনলো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।

আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া   গৃহপানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে ॥
ঘরেতে শুইয়াছিলাম   অচেতনে বাহির হৈলাম
নিমাইর গলার সারা পাইয়া।
আমার চরণের ধূলি   নিল নিমাই শিরে তুলি
পুন কাঁদে গলাটি ধরিয়া ॥
"তোমার প্রেমের বশে   ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে   আসিলাম নদেপুরে"
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে ॥
"আইস মোর বাছা" বলি   হিয়ার মাঝারে তুলি
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে   পরাণ কেমন করে
কান্দিয়া রজনী পোহাইল ॥
সেই হ'তে প্রাণ কান্দে   হিয়াথির নাহি বাধে
কি করিব কহগো উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কন   গৌরাঙ্গ তোমারি হন
নহিলে কি দেখা পাও তায় ॥

শচীদেবী বধূমাতার মনের দিকে চাহিয়া মনের শোক মনে চাপা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু প্রায়শঃই তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইত। তিনি হৃদয়ের দ্বার উঘারিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া

পুত্র-বিরহে কান্দিতে কান্দিতে অঝোরনয়নে ঝুরিতেন, আর দিবা-নিশি "নিমাই নিমাই" বলিয়া হাহাকার করিতেন। বংশীবদন সততই শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। শচীদেবীর মর্ম্মের কথা এই বংশীবদন একটি পদে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা তিলকা কাচ।
আর না হেরিব সোণার কমলে
নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে
সকল ভকত লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আর না দেখিব যাত্রা॥
আর কি দু-ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই বলিয়া ফুকারি সদায়
নিমাই কোথাও নাই॥
নিদয় কেশব— ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দরে না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ॥

কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া
বংশী গড়াগড়ি যায়॥"

শচীমাতা ধৈর্য্য ধরিয়া শোক সংবরণ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া এমন ছট্‌ফট করিয়া উঠিত যে অমনি তথন আকুলি বিকুলি করিয়া রোদন করিতেন। বাসু-ঘোসের একটী পদে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যথা :—

আমার নিমাই গেলরে,—কেমন করে প্রাণ।
তুলসীর মালা হাতে যায় নিমাই ভারতীর সাথে
যারে দেখে তারে নিমাই বিলায় হরি নাম।
কান্দে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় অঙ্গ আছাড়িয়া
কেমনে দড়াবে হিয়া, না হেরে বয়ান।
বাসুদেব ঘোষের বাণী শুন শচী ঠাকুরাণী
জীব নিস্তারিতে ন্যাসী হলেন—**ভগবান্‌**।

শচীমাতার ব্যাকুলতাময় বিলাপে পাষাণ গলিয়া যায়। শচীর শোকে ব্যথিত হইয়া, তাঁহার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া শত শত কবি শচীর যাতনাময় বিলাপ-পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখনও বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে সেই করুণরসাত্মক বিলাপের মর্ম্ম-বিদারক রোদনধ্বনি সঙ্গীতের আকারে প্রবাহিত হইতেছে। এস্থলে উহার আভাস দেওয়া হইল মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বিরহে নদীয়ার ভক্তগণ শোকে-দুঃখে কি প্রকার মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন মহাজনী পদে তাহারও আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।*

১। গোরা গুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেল পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্ল্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া॥
আকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া।
গোরাবিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া।
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া॥

২। কোথা গেল গোরাচাঁদ নদীয়া ছাড়িয়া।
মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া॥
কীর্ত্তন বিলাস আদি যে করিলা সুখ।
সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয়ে বুক॥
নদীয়ার লোক সব কাতর হইয়া।
ছট্‌ফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
এবার নদীয়া চল প্রভু গৌরহরি॥

৩। কতদিনে হেরব গোরাচাঁদের মুখ।
কবে মোর মনের মিটব সব দুখ॥
কত দিনে গোরা পহুঁ করবহি কোর।
কত দিনে সদয় হইবে বিধি মোর॥
কত দিন শ্রবণে হইবে শুভ দিন।
চাঁদমুখের বচন শুনিব নিশিদিন॥
বাসুঘোষ কহে গোরা গুণ সোঙরিয়া।
ঝুরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া॥

বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া।

(১)

ভুবন-মঙ্গলা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্ব শ্রীগৌরলীলার এক গূঢ় গভীর রহস্য। মহানুভব ভক্তগণ এ সম্বন্ধে আপন আপন সাধনায় যাহা কিছু অনুভব করিয়া গিয়াছেন, ভাষায় তাহা তাঁহারা ব্যক্ত করিয়া যান নাই। কাজেই আমাদের উহার বিন্দুমাত্রও জানিবার সুবিধা নাই। শ্রীশ্রীগৌর ভগবান্ যে প্রেমভক্তি জগতে প্রকট করেন, শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর সহিত সেই ভক্তির কি গূঢ় গভীর সম্বন্ধ, লীলা লেখকগণ জীব-জগতে তাহার আভাস প্রকাশ করেন নাই। সম্ভবতঃ আমাদের ন্যায় পতিত পাষণ্ড জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকট সে রহস্য প্রকাশযোগ্য নহে বলিয়াই মহানুভবগণ তাহা গোপন রাখিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠাবান্ ভক্তগণের সাধনাসিক্ত হৃদয়ে এখনও হয়তো সে রহস্য প্রকটিত হয়, এখনও হয়তো নিষ্ঠাবান্ গৌরভক্তগণ সেই সুধা-ধারায় প্রেমভক্তি লাভের বিপুল শক্তি সঞ্চয় করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা বিরহ-রসময়ী। গয়াক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই বিরহ-রস ক্রমেই পরিস্ফুট হয়। শ্রীরাধার বিরহ-ভাব শ্রীগৌরাঙ্গে ক্রমশই অভিব্যক্ত হয়। গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ একবারেই শ্রীরাধাভাবের মূর্ত্তি। জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌর-বিরহে যে ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ চিন্তা করিতেন, তাহা এক গভীর রহস্যময়

ব্যাপার। আমাদের মনে হয় সে ভাব, সত্যভামার ভাব নহে, শ্রীরাধিকার ভাবও নহে। প্রিয়াজীর গূঢ়গম্ভীর বিরহ-বিধুরতায় যে জীব-মঙ্গলদায়িনী শক্তি প্রকাশ পায়, কোথাও তাহার তুলনা নাই। শ্রীগৌরলীলা বুঝিতে হইলে এই লীলার মূলশক্তি শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর প্রগাঢ় ভাবের ধ্যান-ধারণার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণ চিরদিনই অতি গূঢ়ভাবে জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পদাশ্রয় গ্রহণ করেন।

আমরা অতি দীন ও ভজনহীন, কিন্তু তথাপি মনে সাধ হয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীপাদপদ্মের শরণ লই; শরণ লইয়া বলি,—"মা, এ দীনহীন অযোগ্য সন্তানের প্রতি দয়া কর। দয়াময়ী মা একবার তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ দুইখানি এই মহাপাতকীর মাথায় তুলিয়া দাও। জ্ঞানে তোমায় জানিতে পাইব না, অনুসন্ধানে সে আশা নাই, তোমার তত্ত্ব জানিতে স্বয়ং ব্রহ্মা যাহা পারেন নাই, মুনীন্দ্র যোগীন্দ্রগণ যাহা পারেন নাই, এ অসাধু পাষণ্ডের সে প্রয়াসে কোনও লাভের আশা নাই। মা দয়াময়ী, মা শ্রীশ্রীগৌরবল্লভা, পাতকী-তারণের জন্যই তোমার আবির্ভাব। তুমিই দয়া করিয়া আপন প্রাণবল্লভকে জগতের পাপি-তাপীর উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিতে প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি দিয়াছিলে। মা, তোমার সেই বিরহবিধুরা মুর্ত্তিখানি ভক্তহৃদয়ে অতি ক্লেশকর, সম্ভবতঃ সেইজন্যই সে কথা লীলা লেখকগণ বিস্তারিতরূপে বলেন নাই। তোমার যে রূপ তাঁহাদের প্রাণারাম ও নয়ন-তৃপ্তিকর, তাঁহারা তোমার সেই রূপের বিষয়েই বর্ণনা করিয়া-

ছেন, তাহাই ভক্তগণের ধ্যানের বিষয়। শক্তি দাও, যেন সেই মাধুর্য্য-সিন্ধুর কণামাত্রও আস্বাদন করিতে পারি—শক্তি, দাও তোমার জীবনিস্তারিণী বিরহ-বিধুরা মূর্ত্তিখানিও যেন একবার ধ্যান করিয়া লইতে পারি।

শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর নিদারুণ গৌর-বিরহ বর্ণনার পূর্ব্বে এ স্থলে তাঁহার চরিতামৃত সম্বন্ধে দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজনীয়।

মহালক্ষ্মী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৃহধর্ম্মের ও পাতিব্রাত্যধর্ম্মের আদর্শ ছিলেন। একান্ত পতিব্রতা রমণীগণও তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া অপরা রমণীগণকে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উপদেশ দিতেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বহিরঙ্গ ভাব নারীধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ ছিল। আমাদের শাস্ত্রাদিতে স্ত্রীলোকদের যে সকল সদ্‌গুণের কথা আছে, প্রিয়াজীতে সেই সকল সদ্‌গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে কতিপয় দিবস গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপিণী মাতার স্নেহে ও পতিব্রতা পত্নীর প্রেমে তাঁহার সংসার আদর্শ সংসাররূপে পরিণত হইয়াছিল,—ধনে মানে যশে গৌরবেও নদীয়াবাসিমাত্রেরই আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীপাদ মুরারি গুপ্ত এই সময়ে তাঁহার নিত্যসহচর ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য সবিশেষ মনোযোগের সহিত দর্শন করিতেন, বিচার করিতেন, এবং প্রতি পদেই তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তায় কতবার মুরারির

মনে সন্দেহ আসিত। তিনি সন্দেহের চক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের গার্হস্থ্যাশ্রমের কার্য্যাবলী বিচার করিতে যাইয়া অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় তাহাতেও ভগবত্তা দেখিতে পাইলেন। এই মুরারি গুপ্ত মহোদয় মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য লীলার যে আভাস দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"রসপূর্ণ রসিকশেখর কনকগৌর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য-বিলাস-বিভ্রমে বিরাজ করিতেন, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিরন্তর তাঁহার পাদপদ্মের সেবা করিতেন।" গৃহী ভক্তগণের এই শ্রীমূর্ত্তিযুগলই উপাস্য ও ধ্যেয়।

শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলাই জীব-শিক্ষার নিমিত্ত। তাঁহার এই গার্হস্থ্য-লীলাও গৃহস্থ মাত্রেরই নিরতিশয় শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু তাঁহারই অংশ শ্রীরামচন্দ্র, এই গার্হস্থ্য-লীলার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অংশরূপিণী জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবী পাতিব্রত্য ধর্ম্মের আদর্শ জগতের মহিলাকুলের সমক্ষে প্রকটি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় শক্তিসহকারে জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার অংশসমূহ অবশ্যই তাঁহার মধ্যে বিরাজ থাকেন, এবং অংশাদির কার্য্যও স্বয়ং ভগবান্ দ্বারা প্রকাশ পায়। কিন্তু ভূভার-হরণ, অসুর

* সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস-বিভ্রমৈঃ
ররাজ রাজদ্বরহেমগৌরঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-লালিত-পাদপঙ্কজো
রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্রমৌলিঃ॥

সংহার বা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রকটন, স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে। জীবগণের হৃদয়ে প্রেমভক্তির বীজ অঙ্কুরিত করা ও ভক্তিলতার বিকাশ সাধন করাই তাঁহার অবতারের প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই কার্য্য অংশ দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। আবার অপর পক্ষে অংশকলা দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, স্বয়ং ভগবানের অবতরণে আনুসঙ্গিক ভাবে সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু স্বয়ং ভগবানের অবতরণে যাহা প্রধানতম প্রয়োজন, তাঁহার লীলায় সেই ভাবটীই মুখ্যতমরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, অপরাপর ভাব আনুসঙ্গিক ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সেইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় আমরা গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রকটন মুখ্যভাবে দেখিতে পাই না। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার মুখ্যভাব,—প্রেম-প্রকটন। ইহা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য। অংশকলা দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ লীলাতেও অসুর সংহার, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-প্রকটন, ভূভার হরণ ও প্রেমলীলা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শ্রীভগবান্ গৌর-লীলায় যেরূপ প্রেম-প্রকটন করিয়াছেন, কৃষ্ণ লীলাতে সেইরূপ করেন নাই, তখন কেবল স্বীয় হ্লাদিনী-শক্তি-গণের মধ্যেই মুখ্য ভাবে তাঁহার প্রেম প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি তখন সর্ব্বত্র উদার ভাবে প্রেম-প্রকটন করেন নাই। শ্রীগৌর-লীলায় সর্ব্বজীবে প্রেম-প্রকটনই অতি মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই এই লীলায় গার্হস্থ্যধর্ম্ম-প্রদর্শনে তেমন স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ করিয়া গিয়াছেন ইহা অতি সত্য। কিন্তু রামলীলায় যেমন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা-

দানই প্রধানতম, গৌরলীলায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মের তেমন প্রাধান্ত বর্ণিত হয় নাই। প্রেমভক্তি-বিতরণই এ লীলার সার সর্ব্বস্ব। তাই পূজ্যপাদ লীলা-লেখকগণ এই লীলার মুখ্যভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আলোচনা করেন নাই।

কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পাতিব্রাত্য-ধর্ম্ম, সীতাদেবীর পাতিব্রাত্য-ধর্ম্ম হইতেও অধিকতর কঠোর, অধিকতর গভীরও অধিকতর ঘনীভূত। সীতাদেবী বনে যাইয়াও প্রত্যক্ষ ভাবে রঘুবরের চরণ সেবা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে বনবাসের ক্লেশ তাঁহার নিকট ক্লেশ বলিয়াই মনে হয় নাই। নির্ব্বাসন-কালেও সন্তান-পালনে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট থাকিত।

কিন্তু শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর প্রাণবল্লভ গৃহে থাকিয়াও অধিকাংশ সময়ে তাঁহার নয়নের অন্তরালে বিরাজ করিতেন, ছাত্রগণেব সঙ্গে ও ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহার দিন রজনী অতিবাহিত হইত। আরও একটী কথা এই যে,—রাজা রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনে দিলেন, রামহীন হইয়া সীতাদেবী বনবাসিনী হইলেন। পতিবিরহে তাঁহার মর্ম্ম ছিড়িয়া যাইতে লাগিল, তথাপি বনবাসে তাঁহার মনে এ সুখ ছিল যে, তাঁহার পতি অযোধ্যার রাজা তিনি রাজসুখ উপভোগ করিতেছেন, এখন আর তাঁহার প্রাণবল্লভের বনবাসের কষ্ট নাই। সীতা মনে করিতেন, "আমি বনে যেমনই থাকি,—থাকিব। কিন্তু আমার প্রাণবল্লভের তো কোন কষ্ট নাই। তিনি অযোধ্যার রাজা, রাজ-পদে সমাসীন, আমাকে বনে দিয়াও তিনি যে প্রজার মনোরঞ্জন করিতে পারিয়া আত্মপ্রসাদ

লাভ করিতে পারিয়াছেন ইহাই আমার পরম সুখ—আমি দারুণ বিরহের আগুনে জ্বলিয়া মরিলেও আমার প্রাণবল্লভের সুখের কথা স্মরণ করিলেই আমার সকল দুঃখ দূরে যায়।" সীতাদেবীর মনে এই এক শান্তি ছিল।

কিন্তু শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর বিরহ অতি কঠোর, অতি ভয়ঙ্কর। শ্রীগৌরসুন্দর চাঁচর চুল মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইলেন, কৌপীন পড়িলেন, হাতে করঙ্গ লইয়া পথের ভিখারী হইলেন,—প্রবল মাঘের শীত সেই সুকোমল দেহের উপর দিয়া বহিয়া চলিল, তাঁহার গায়ে একখানি কাণি নাই, বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে বসিয়া প্রভুর কথা ভাবিতে লাগিলেন, "আমি ঘরে রহিয়াছি, আর আমার প্রাণবল্লভ এখন পাগলের ন্যায় নগ্নদেহে পথে পথে বেড়াইতেছেন,—না হয়ত গাছের তলে পড়িয়া রহিয়াছেন, আমার চিত্ত কি কঠিন, যে এখনও উহা বিদীর্ণ হইতেছে না। আমি ঘরে বসিয়া যথাসময়ে পেটের ক্ষুধার শান্তি করিতেছি, আর আমার প্রাণের প্রাণ কৌপীন পড়িয়া করঙ্গ লইয়া ভিখারীর বেশে ভ্রমণ করিতেছেন।"

এইরূপ বিরহের ভীষণতম ছবি হৃদয়ে লইয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে গৃহে বাস করিতে হইয়াছিল। সীতা বনে প্রেরিতা হইয়া বনবাসিনী হইয়াছিলেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৃহে থাকিয়াও তদপেক্ষা বহুগুণ অধিকতর কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। সুতরাং সীতা অপেক্ষাও বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিকতর সংযম-শক্তি পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে আমরা বিরহ-বিধুরা শ্রীমতীর ব্যাকুলতাময়ী

প্রতিচ্ছবি দেখিয়া স্তম্ভিত হই। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবলতম আবেগে সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি ঘৃণা, লজ্জা, লোক-কলঙ্কভয়- এমন কি সতীর ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার পথ পাইয়াছিলেন। তীব্র রোদনে, আকুলতাময় ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার বিরহ-বেদনা বাহির হইবার পথ পাইত, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-বেদনা বাহির হইবার পথ ছিল না। ঘরে বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা, প্রিয়াজী গৌরবিরহে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাকুলতা দেখালেই বৃদ্ধা শচীমাতা মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন, তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা উপস্থিত হইত। প্রিয়াজী মনের বেদনা মনে চাপা দিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা করিতেন। তিনি কুলবধূ,—ঘরের বাহির হইয়া কাহারও সহিত দুঃখের দুইটা কথা বলিয়া মনের ভাব লঘু করিতে পারিতেন না, মনের দুঃখ মনে লইয়া গুমরিয়া মরিতেন, বিরহের আগুন ঘনীভূত হইয়া হৃদয়ে জ্বলিত, অনন্ত তাপের সৃষ্টি করিত, কিন্তু সে তাপ-বিকি-রণের কোনও উপায় ছিল না,—উচ্চ আৰ্ত্তনাদ ছিল না,—হাহাকার ছিল না,—শ্রীমতীর ন্যায় ব্যাকুলতাময় ভাবোচ্ছ্বাস ছিল না, সুতরাং ভিতরের জ্বালা বাহির হওয়ার পথ পাইত না। যুগযুগান্ত সঞ্চিত- ভূগর্ভস্থ তাপ,—ভূকম্পনে ও আগ্নেয়গিরি-উৎপাদনে বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপে সর্ব্বংসহা বসুমতীও নিজের আভ্যন্তরীণ তাপ বাহিরে ঢালিয়া দিয়া তাপভার লঘুতর করেন, কিন্তু শ্রীশ্রীপ্রিয়াজী বসুমতী হইতেও অধিকতর সর্ব্বংসহা—তাঁহাতে শোক-বির-হের ভূকম্পন পরিলক্ষিত হইত না, আগ্নেয়গিরির ন্যায় জ্বালাময়

হা-হুতাশও বাহিরে প্রকাশ হইত না। তিনি নীরবে নীরবে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহের মহানল হৃদয়ে ধারণ করিতেন। তাঁহার শক্তি অনন্তগুণে মহিয়সী। এইরূপ অনন্ত গভীর শক্তি-সংযম, মহীয়সী মহাশক্তি ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবপর নহে। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার মহামহা-শক্তি বাস্তবিকই মহর্ষিগণেরও জ্ঞানের দুরধিগম্যা। জড়াধম আমরা আর কি বুঝিব?

প্রেমময় প্রাণবল্লভের সন্ন্যাসের পর হইতে প্রিয়াজীর হৃদয়ে দিবানিশি যে বিরহ আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া সেই সোনার লতাকে নীরবে নীরবে দগ্ধ করিতেছিল, মানুষের হৃদয়ে সে যাতনার কোটি অংশের এক অংশও অনুভব করিতে পারে না, মানুষের ভাষায় তাহার সে বিরহ-যাতনা-সমুদ্রের একবিন্দুও প্রকাশ পাইতে পারে না। অসীম অনন্তমরুর অনন্ত ধূ-ধূময় নিদারুণ ভাব কে কবে ধারণা করিতে পারে,—কেই বা উহার অনন্ত জ্বালাময় ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়?

কোমলপ্রাণ লীলা লেখকগণ প্রিয়াজীর বিরহকাহিনী গোপন রাখিয়াছেন,—তাঁহারা সেই ভীষণ মরুর নিদারুণ চিত্র পাঠকগণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। উহা বাস্তবিকই মানুষের অসহ্য। দুই একটী পদকর্ত্তা প্রিয়াজীর বিরহ-তাপের লেশাভাস হৃদয়ে ধারণা করিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াই আমাদিগকে অধীর ও আকুল হইতে হয়—সে অনন্তমরুর লেশাভাস মনে করিতে গেলেই হৃদয় ব্যাকুল ও অধীর হইয়া উঠে।

কিন্তু এই নিদারুণ করুণরস অসহনীয় হইলেও উহা জীবের পক্ষে মহা উপকারী। প্রিয়াজীর বিরহ-তাপ দ্বারাই দয়াময় মহাপ্রভু জীবের লৌহ-কঠিন হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া ভগবৎপ্রেমের উপযোগী করিয়া তোলেন। লৌহ অতি কঠিন দ্রব্য। উহাকে কোমল ও তরল করিতে হইলে সাধারণ তাপে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। প্রবল সন্তাপের প্রয়োজন। সেইরূপ অতি পাষণ্ডী পতিত জীবের কঠিন হৃদয়েও প্রেমাঙ্কুর বপন করিতে হইলে অতি তীব্র করুণরসে কঠোরতম জীবদহৃয়কে কোমল করা প্রয়োজনীয়। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ, ভক্ত-পাঠকগণের অসহ্য হইলেও জীবের মঙ্গলসাধনার্থ উহা একান্ত উপযোগী। জীবের ভগবদ্‌বিস্মরণ ও ভগবদ্‌বিমুখতাই প্রিয়াজীর এই নিদারুণ মহাবিরহের এক প্রধানতম কারণ। এই গভীর বিরহ-সন্তাপের আভাসমাত্রও প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা এস্থলে কোন কোন মহাজনের কতিপয় পদ অবলম্বন করিয়াই এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

২

শুভ বিবাহের রাত্রিতে প্রিয়াজীর পায় যখন উছট্ লাগে, তখনই তিনি ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এই শুভ মিলনে যে কত বিঘ্ন বিপদ আছে সেই মুহূর্ত্তেই প্রিয়াজী তাহা মনে করিয়া অধীর হইয়া ছিলেন। কিন্তু পরম প্রেমিক গৌর-সুন্দর শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর বর্ত্তমান অমঙ্গল আশঙ্কায় সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে

স্থির করিলেন। তাহার পর গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীগৌরাঙ্গের যে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল, দেবী তাহা দেখিয়া অতিমাত্রায় আশঙ্কিত হইলেন। তাঁহার প্রাণবল্লভ দিবানিশি রোদন করেন। তাঁহার মুখখানি শুষ্ক পদ্মের ন্যায় বিমলিন, তিনি সততই ভক্তগণ সঙ্গে দিনযামিনী কৃষ্ণ-নামে ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মগ্ন থাকেন, হাহাকার করিয়া রোদন করেন, ধূলায় গড়াগড়ি দেন, তাঁহার সোনার অঙ্গ ধূলায় সততই ধূসরিত থাকে। তিনি কথা বলিতে গেলেও তাঁহার প্রাণবল্লভ তাঁহার মুখের দিকে ঢল ঢল ভাবে চাহিয়া কেবল রোদন করেন, কোন কথার উত্তর করেন না, কেবল বলেন,—"আমার কি হইল বলিতে পারি না, আমি আমার বশে নাই। এ সংসার আমার নিকট বিষের মত বোধ হইতেছে, হরিনামভিন্ন আর কিছুতেই আমার প্রাণের জালা শান্ত হয় না।"

এইরূপ দুই এক কথা বলিয়াই প্রভু ঘরের বাহির হইয়া পড়েন। প্রিয়জী এই এই সকল ভাব দেখিয়াই বুঝিতে লাগিলেন, এই নবযৌবনে এই দেবদুর্ল্লভ ভুবনমোহন পরমসুন্দর পরম-প্রেমিক স্বামীর সুখময় সঙ্গ বুঝি তাঁহার ভাগ্যে নাই। তিনি নীরবে মনের দুঃখ মনে চাপা দিয়া দিনযামিনী দুঃখে দুঃখে যাপন করিতেন। কিন্তু তখনও তিনি একবার নিরাশ হয়েন নাই, তখনও তাঁহার এরূপ মনে হয় নাই যে তাঁহার প্রেমময় স্বামী তাঁহাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবেন,—সন্ন্যাসী হইয়া একবারে নদীয়া ছাড়িয়া চিরদিনের তরে তাঁহার নয়নের মণি, তাঁহার

নয়নের অন্তরাল হইবেন, নদীয়া আন্ধার করিবেন, আর তাঁহাকে সেই দুঃখের ভীষণ আঁধার পাথারে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের কতিপয় দিবস পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সংসারে মন দিলেন। তখন সকলেরই মনে হইল, প্রভুর চিত্ত বুঝি শান্ত হইল, আর বুঝি তিনি ঘরের বাহির হইবেন না। প্রিয়াজীর হৃদয়েও ক্ষণিকের তরে এই শান্তি দেখা দিল। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। ভাবী বিপদ অতর্কিতভাবে প্রিয়জনের হৃদয়ে নীরবে উহার ভীষণ ছায়া বিস্তার করে। প্রিয়াজী এই দুঃখের দিনেও মধ্যে মধ্যে শ্রীগৌর-বিরহের আশঙ্কায় অধীর হইতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন প্রিয়াজীকে ভরপুর মিলন-সুখদান করিতেছিলেন, সেই সুখের পাথারে থাকিয়াও সময়ে সময়ে প্রিয়াজী বিরহের আশঙ্কায় কিরূপ ব্যাকুল হইতেন, কোন কোন পদকর্ত্তা তাহার কিছু কিছু আভাস দিয়াগিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর একদিন মায়ের নিকট বসিয়া আহ্লাদে কত কথা বলিতেছেন। অপর গৃহে প্রিয়াজী সখীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। প্রিয়াজীর মুখখানি বিমলিন দেখিয়া তাঁহার মর্ম্মসখী বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সখি, আজ তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? যেন কোন নিদারুণ চিন্তায় আনমনা ভাবে রহিয়াছ।" প্রিয়াজী ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষের একটি পদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, উহা এই—

বিষ্ণুপ্রিয়া সখীসনে কহে ধীরে ধীরে।
আজ কেন প্রাণ মোর অকারণে পুড়ে॥
কাঁপিছে দক্ষিণ আঁখি, যেন স্ফুরে অঙ্গ।
না জানিয়ে বিধি কি যে করে সুখভঙ্গ॥
আর কত অস্ফুরণ স্ফুরয়ে সদাই।
মনের বেদনা কহিবারে ভয় পাই॥
আরে সখি, পাছে মোর গৌরাঙ্গ ছাড়িবে।
মাধব এমন হলে পরাণে মরিবে॥

আর একদিন সখীকে বিরলে পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাকুলভাবে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতেছেন, "সখি, আমার এমন হইল কেন? এই সুখময় নদীয়া যেন উদাস-উদাস বোধ হইতেছে। মনে সুখ পাইতেছি না। নয়নের জল সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিয়াও সামলাইতে পারিতেছিনা। আমার ডান চক্ষু ও ডান অঙ্গ কাঁপিতেছে, সহসা কাণের অলঙ্কার খসিয়া পড়িয়াছে। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া দেখি তরুলতা যেন মলিন দেখা যাইতেছে, নদীর তীরে গাছে গাছে ফুলে ফুলে ভ্রমর গুঞ্জরণ করিত, আজ আমি সেরূপ দেখিতে পাইলাম না, আমার মনে হইল গাছের পাতাগুলি যেন শুকাইয়া গিয়াছে, লতাবল্লরীতে আর ফুল বা ভ্রমর নাই, সকলই যেন শুষ্ক ও মৃতপ্রায়। জাহ্নবীর ধারা যেন স্থগিত হইয়াছে। সখি, আমার এরূপ উদাস-উদাস বোধ হইতেছে কেন? আমার মনে বড় ভয় হইতেছে,—আর বুঝি প্রভুকে ঘরে দেখিতে পাইব না।"

বাসুঘোষের পদে এই ভাবটী প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী বাসুঘোষ লিখিয়াছেন—

বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গিনীরে পাইয়া বিরলে।
ব্যাকুল হিয়ায় গদ-গদ কিছু বলে॥
আজি কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে।
অঙ্গে নাহি পাই সুখ, দুটি আঁখি ঝরে॥
নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ, দক্ষিণ নয়ন।
খসিয়া পড়িল মোর কর্ণের ভূষণ॥
সুরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা।
ভ্রমর না খায় মধু শুখাইল পাতা॥
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা।
কোকিলের রব নাহি যেন মুকপারা॥
এই বড় লাগে ভয় বাসুর হিয়ামাঝে।
নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা দ্বিজরাজে॥

আবার যে দিবস শ্রীগৌরসুন্দর নানাপ্রকার রস-কেলি-বিলাসে প্রিয়াজীকে বিমুগ্ধ করিয়া তাঁহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় শয্যায় ফেলিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য কাটোয়ায় গমন করিলেন, সেইদিনকার স্নানের বেলায় যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই নিদারুণ ঘটনা এইরূপ :—

প্রিয়াজী গঙ্গার ঘাট হইতে পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া শাশুড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন, শচী দেখিলেন বউমা ভিজা বস্ত্রে ভিজা চুলে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত। শচীমাকে দেখিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ফাপর হইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখে কোন কথাই সরিল না। শচীমা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বউমা হয়েছে কি, সত্বর বল, তোমার চক্ষের জল দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া পড়িতেছে।"

প্রিয়াজী তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে গদ্‌গদ কণ্ঠে ফাপর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মা আর কি বলিব, আমি রাত্রি দিন কেবল অমঙ্গলই দেখিতেছি। আজ স্নান করিতে গঙ্গায় নামিলাম, হঠাৎ নাকের বেশর নাক হইতে খসিয়া গঙ্গায় পড়িয়া গেল। মা একি অমঙ্গল? মনে হইতেছে মাথায় না-জানি-কি বজ্র পড়িবে—অভাগিনীর কপাল ভাঙ্গিবে। আমি এখন সর্ব্বদাই হা-হুতাশ বোধ করিতেছি। থাকিয়া থাকিয়া সময়ে সময়ে অকারণে আমার প্রাণ আকুল হয়। ডান অঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠে, আমার মনে হয় যেন আমার ডান দিক দিয়া সাপ চলিয়া যায়। এমন কেন হইল, মা। আজ আবার এ কি বিপদ্। না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে।" এই বলিয়া প্রিয়াজী অঝোরনয়নে ভিজা কাপড়ে ভিজা চুলে কাঁদিতে লাগিলেন।*

শচীদেবীর মুখ শুকাইয়া গেল, দেহ অবশ হইল। মনের

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্রচুলে।
ত্বরা করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বোলে॥
বলিতে না পাড়ে কিছু কাঁদিয়া ফাঁপর।
শচী বলে "মাগো এবে কি লাগি কাতর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বোলে "আর কি কব জননী।
চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণী॥

ভাব মনে চাপা দিয়া তিনি বউমার চুল মুছিয়া দিলেন। তাঁহাকে অতি সুন্দর বিচিত্র সাড়ী পড়িতে দিলেন। তাঁহার সখীরা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া তাঁহার সীমন্তে সিন্দুর ও কপালে সিন্দুর-ফোটা দিয়া ও মুখে পান দিয়া বলিলেন,—সখি, তুমি যেমন বৃথা আশঙ্কা করিয়া দুঃখ করিতে পার, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। তোমার পতি অতি প্রেমিক, তোমাকে খুবই ভাল বাসেন। যেখানে ভালবাসা বেশী, সেখানে আশঙ্কাও বেশী। এমন অমঙ্গলের আশঙ্কাও কি মনে স্থান দিতে আছে? নাকের বেশর কাহারই বা খসিয়া না পড়ে। হয়ত কোড়াটা ক্ষয় পাইয়া গিয়াছিল, নয়ত মুখটা একটু আল্‌গা হইয়াছিল, বেশর খানা তোমাদের বালাই লইয়া পড়িয়া গিয়াছে, উহাতে আর কি হইবে। কত জনের নাক হইতেই বেশর পড়ে, তাহাতে আবার কি হয়?"

এইরূপ প্রবোধ দিয়া নর্ম্মসখী প্রিয়াজীকে শান্ত করিলেন। অল্পক্ষণ পরে গৌরসুন্দর গৃহে আসিলেন, তিনি প্রিয়াজীর এই ব্যাকুলতার কথা শুনিয়া একটুকু হাসিয়া বলিলেন,—"অনিত্য সুখকে যাহারা সুখ বলিয়া মনে করে, তাহারা এমনিভাবেই বৃথা

নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিল কপাল, মাথে পড়িবে বজর॥
থাকি থাকি প্রাণ কান্দে নাচে ডান আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি॥
কাঁদি কহে বাসু ঘোষ কি কহিব সতী।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি॥

দুঃখের আশঙ্কায় যাতনা পায়। এ সংসারের সুখও মিথ্যা—দুঃখও মিথ্যা। হরিচরণে মন না রাখিলে খাটি আনন্দ লাভ হয় না।”

প্রিয়াজী অঙ্গুলিদ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীচরণ দেখাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—“আমি এই হরিচরণেই মন রাখিয়াছি, পাছে বা শ্রীচরণ-সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হই, ইহাই আমার আশঙ্কা।”

নিমাই প্রিয়াজীর চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন,—“প্রিয়ে, চির দিনই তুমি আমার, আমি তোমার। এ মিলনে বিরহ নাই। তোমাকে ইহা খাটি বলিলাম—তবে” এই বলিয়া নিমাই নীরব হইলেন। প্রিয়াজী তাঁহার কথায় আনন্দে এমন বিহ্বল হইলেন, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কথা শেষ করার পূর্ব্বে যে “তবে” বলিয়া কি বলিতে ছিলেন, তাহাতে কর্ণপাত না করিয়াই আনন্দচিত্তে গৃহকার্য্য করার জন্য গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। অতঃপর এই দিবস রজনীতে প্রিয়াজীর সহিত গৌরসুন্দরের যে শেষ-রসকেলি হইয়াছিল, সেই অবস্থাতে ও প্রিয়াজী রসিক-শেখরের কোলে থাকিয়াও প্রেম-বৈচিত্ত্যে বিরহ-তাপ অনুভব করিয়াছিলেন, যথা :—

নদীয়া-বিহারী হরি প্রিয়াজীরে কোলে করি
মুখ’পরি মুখ রাখি করেন চুম্বন।
অনিমিখে বিষ্ণুপ্রিয়া পতিমুখ নিরখিয়া
জাগরে বিবশাপ্রায়,—যেন অচেতন॥
ব্যাকুল সজল নেত্রে মৃদুল কম্পিত গাত্রে
বলে দেবী “কোথা মম প্রিয়-প্রাণধন।

একাকিনী হেথা ফেলে পাথারে ভাসায়ে গেলে
ভাঙ্গি গেলে অভাগীর সুখের স্বপন॥”
প্রেমের বৈচিত্ত্য দেখি প্রভুর সজল আঁখি
বলিলেন গোরাচাঁদ—“একি গো স্বপন।
এই তুমি কোলে মোর, কি ভাবে হয়েছ ভোর
জাগ জাগ প্রিয়তমে, আজি শুভক্ষণ।
তোমারে পাইয়া কোলে উলাসে গিয়াছি গলে
একি তব মোহময় বিরহ-বেদন॥”
ভাঙ্গিল ভাবের ঘোর, আনন্দের নাহি ওর
লজ্জায় ঢাকিলা মুখ প্রিয়াজী তখন।
প্রভাদেবী অন্তরালে মুচকি হাসিয়া বলে
এই ভাবে সেবি যেন যুগলচরণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের পরক্ষণেই প্রিয়াজী ও শচীদেবী তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া যেরূপ নিদারুণ শোক-তাপে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সে বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পূজনীয়া শ্রীমতী গৌরপ্রভা দেবীর একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

মাঘের সুখের নিশি অবসান প্রায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বক্ষে দেবী সুখে নিদ্রা যায়॥
জাগিলা নেহারি এক দারুণ স্বপন।
অন্ধকার, শূন্যঘর,—নাই প্রাণধন॥

পালঙ্কে বুলায় হাত ইতি-উতি চায়।
অধীর পরাণ, উঠি বসিলা শয্যায়॥
"কোথা প্রাণনাথ" বলি ডাকে ঘন ঘন।
না পাইল কোন সাড়া. মন উচাটন॥
কপাট রয়েছে খোলা আসিলা বাহিরে।
ডাকিলেন আর্ত্তনাদ করি শাশুড়ীরে॥
"উঠ মা, উঠ মা ত্বরা, হল সর্ব্বনাশ।
ফেলে চলে গেলা বুঝি করিতে সন্ন্যাস॥
চমকি উঠিলা শচী কাঁপিতে কাঁপিতে।
"নিমাই নিমাই" বলি লাগিলা ডাকিতে॥
বাহির হইলা পথে পাগলিনী পারা।
"নিমাই নিমাই" বলি কোথা নাই সাড়া॥
জাগিলা পরশী তাঁর রোদন শুনিয়া।
পাড়ার যতেক লোক আইল ধাইয়া॥
প্রিয়াজী ভুমেতে পড়ি হইল অচেতন।
প্রভা কান্দি করে তাঁর চরণ বন্দন॥

প্রিয়াজীর মুখখানি ধূলধূসরিত, নয়নের জল ভূমিতে পরিয়া ভূমি কর্দ্দমিত হইয়াছে। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, আর নয়নের জল নয়নে শুকাইতেছে। সুচিক্কণ কেশরাশি আলুলায়িত, ধূলায় অবলুণ্ঠিত, নাসায় নিশ্বাস নাই, চতুর্দ্দশীর চাঁদের ন্যায় মুখখানি নিষ্প্রভ দেখাইতেছে। তাঁহার মর্ম্মসখী চরণতলে বসিয়া এই মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিতেছেন; আর ধীরে ধীরে তাঁহাকে সচেতন

করার চেষ্টা পাইতেছেন, আর এক একবার মনে মনে ভাবিতেছেন, "অভাগিনী প্রাণবল্লভ-বিরহিণী প্রিয়াজীর মূর্চ্ছাই এখন ভাল। ইনি যতক্ষণ মূর্চ্ছিত থাকিবেন ততক্ষণই শোকের আগুন চাপা থাকিবে, জাগাইলেই আবার সেই মহানল ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিবে। আবার মনে করিতেছেন, প্রিয়াজীর এই মৃতার ন্যায় ভাব আর কতক্ষণ দেখিব, আর যে এ দশা দেখিতে পারি না। এই সোণার কুসুম ধূলায় পড়িয়া থাকিবে, ইহাও কি দেখা যায় ?

সহচরী তখন মনের দুঃখে আপন প্রাণে বলিতে লাগিলেন, "হা গৌরসুন্দর একি হইল, হা গৌরবিশ্বম্ভর তুমি কোথায় ? একবার দেখিয়া যাও, তোমার অঙ্কলক্ষ্মী,—সোণার কমল,—বিষ্ণুপ্রিয়া আজ কি নিদারুণ দশায় ধূলায় পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছেন হা গৌর, হা বিশ্বম্ভর, হা বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণবল্লভ, তুমি কোথায় ?"

এই বলিয়া তিনি প্রিয়াজীর পদতলে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে গৌরসুন্দরের নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র, বিষ্ণুপ্রিয়ার অর্দ্ধবাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি এই অবস্থায় বলিতে লাগিলেন :—

কই, সখি, কই প্রাণধন।
দুখিনীরে দয়া করে এলে কি আবার ফিরে
নদীয়াবিহারী হরি হারাণ-রতন॥
আমি অভাগিনী বলে দিতে পার পায়ে ঠেলে,
স্নেহময়ী বৃদ্ধা মায়ে কে ত্যজে কখন।

এই বলিতে বলিতে আরও একটুকু জ্ঞান জ্ঞান হইল। তখন সহচরীকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন :—

সখি, জননীরে মনে করি এলেন কি গৌরহরি,
পাবে কি দুঃখিনী তাঁর হেরিতে বদন॥
আমি তাঁর কাছে গেলে যদি পুন যান চ'লে
না হয় দূরেতে রহি করিব দর্শন।
তথাপি দেখিতে পাব তাঁহার বদন॥

সহচরী উঠিয়া আসিয়া সম্মুখে বসিলেন, দেখিলেন,—প্রিয়াজীর নয়ন সজল ও সতৃষ্ণ, তখনও পূর্ণজ্ঞান হয় নাই। সহচরী বলিলেন— সখি, দেহ থাকিলে কোনদিন অবশ্যই দেখা হইবে। তিনি কি তোমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে। ধৈর্য্যই এখন একমাত্র সম্বল।"

প্রিয়াজীর জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি আবার হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটিয়া পড়িলেন। প্রভাদেবী এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

আছাড়িয়া পুন দেবী ভূমিতে পড়িল।
"কোথা প্রাণনাথ" বলি কাঁদিতে লাগিল॥
"আমরা লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনী।
কি দোষে ছাড়িয়া এবে গেলা গুণমণি।
তোমা না হেরিয়া প্রাণ কেমনে রাখিব।
জলে ঝাঁপ দিব, কিম্বা অনলে পশিব॥

নিলাজ পরাণ কেন নাহি বাহিরায়।”
এই বলি স্বর্ণলতা ধূলায় লুটায়॥
দশা দেখি প্রভা কান্দে অধীর হইয়া।
“হা গৌরাঙ্গ কোথা গেল দেখনা আসিয়া॥”

ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। নদীয়ার লোক নদীয়ার সর্ব্বত্রই ব্যাকুল ভাবে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মালিনী প্রভৃতি প্রতিবাসিনী মহিলাগণ শচীমাতা ও প্রিয়াজীকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু দাবানল যখন প্রবল ভাবে জ্বলিতে থাকে, শিশিরের ফোটায় কে কবে সেই আগুন নিভাইতে পারে? সিন্ধু যখন অনন্ত উচ্ছ্বাসে দুকুল ভাসাইয়া প্রবাহিত হয়, কে কবে বালুর আলি বাঁধিয়া সেই স্রোতে বাধা দিতে সমর্থ হয়? সন্নিপাতের প্রবল তৃষ্ণায় রোগী যখন আনছান করিতে থাকে, জল দিব বলিয়া আশা দিলে তখন কি রোগীর প্রাণ বাঁচে? ফলে কাহারও সান্ত্বনায় শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ায় শোকবেগ কমিল না, অপর পক্ষে যাঁহারা সান্ত্বনা দিতে আসিলেন, তাঁহারাও ইঁহাদের শোকবেগে শোকাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

গৃহে নারায়ণ, তাঁহার সেবার আয়োজন হয় নাই দেখিয়া প্রবীণা রমণীরা ভোগের উদ্যোগ করিলেন। পূজান্তে নারায়ণের ভোগ হইল। শচীমা ও প্রিয়াজীকে কোনক্রমে শান্ত করা গেল না। প্রতিবাসী রমণীগণ প্রাণান্ত যত্ন করিয়াও ইঁহাদের

মুখে প্রসাদ তুলিয়া দিতে সমর্থ হইলেন না। দিনমান প্রায় অবসন্ন হইল। এই ঘোরতর শোকবেগের মধ্যে প্রিয়াজী যখন শুনিলেন, বৃদ্ধা জননী একবারে অনাহারে রহিয়াছেন, জলটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই, তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া শাশুড়ীর শয্যার পাশে গিয়া বসিয়া বলিলেন,—"মা, আপনি কি আমাকে মারিয়া ফেলিবেন? আপনি এমন করিলে আমার গতি কি হইবে? আমার পিতামাতা আছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে এখন জানি না। আপনি ভিন্ন ত্রিজগতে আমার আর অন্য কেহ নাই। আপনি যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, আমার উপায় কি? আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার কথা ভাবিয়া আপনি প্রাণরক্ষা করুন।"

শচীদেবী প্রিয়াজীকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আবার উন্মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা বিশ্বরূপ পুত্র ছাড়িয়া গিয়াছে তাহাও সহিয়া রহিয়াছি, নিমাই ছাড়িয়া গেল, তাহাও ধীরে ধীরে সহ্য হইত, কিন্তু মা তোমার কথা ভাবিয়াই আমার পাঁজর ধসিয়া যাইতেছে। আমি কি করিয়া তোমার মলিন মুখ দেখিব? মা, তোমার ঐ এলোচুল, ধূলায় ধূসরিত মুখ দেখিয়া আমি কি করিয়া প্রাণধারণ করিব।" প্রিয়াজী আবার মনের দুঃখ মনে চাপা দিয়া বলিলেন, মা আমি যদি আপনার চরণ সেবা করিতে পাই, তবে আমার দুঃখ নাই।"

এই বলিয়া প্রিয়াজী উঠিলেন, স্নান করিলেন, শ্রীগৌরচরণ:চিন্তা করিতে করিতে নারায়ণের গৃহে গিয়া প্রণত হইয়া বলিলেন,—

"দেব, যাহা হইবার তাহা হইল, এখন আমার প্রাণে বল দাও।" এই বলিয়া শচীমায়ের শয়ন মন্দিরে গিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র আনিলেন। শাশুড়ীকে স্নান করাইয়া নারায়ণের মন্দিরে লইয়া গেলেন। শচীমা তখন নারায়ণের নাম জপ করিলেন, কি গৌরাঙ্গ-নাম জপ করিলেন,—পাঠকগণই তাহা অনুমান করুন।

প্রিয়াজী প্রসাদ লইয়া আসিয়া শাশুড়ীর মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। শচীমা বাধা দিতে গিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। দুই চারিগ্রাস মুখে দিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন, কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার নিমাই আজ পথের ভিখারী, হয়ত এখনও সে জলটুকু মুখে দেয় নাই, আর আমি আমার পোড়ামুখে অন্ন দিতেছি।"

শচীমা অবশ হইয়া পড়িলেন। প্রিয়াজী দেখিলেন এ অবস্থায় আর যত্নে কোন ফল নাই। তিনি শচীমাতার মুখ ধোয়াইয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া শয্যায় রাখিলেন। শচী বলিলেন, মা আমার দেহ অবশ। আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না। তোমার মা বাপ আসিয়াছেন, মালিনী এখানে আছেন, তুমি কাহারও কথায় বাধা না দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিও; মা লক্ষ্মী, আমার এই কথাটি রাখিও, আমি আর কিছুই বলিতে পারিতেছি না।"

এই বলিয়া শচীদেবী বিবশা হইয়া বিছানায় পড়িলেন। প্রিয়াজীর মাতা পিতা তাঁহাকে অনেকপ্রকার সান্ত্বনা দিলেন। প্রিয়াজী বলিলেন আমার জন্য আপনারা কেহই ব্যস্ত হইবেন না। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি মনে বল পাই।

আর আপনারা এখানে আসিলে আমার যাতনা দূর হইবে না। আমি এখন নির্জ্জনে থাকিলেই কিছু শান্তি পাইব। আপনারা এখন গৃহে গমন করুন, প্রতিদিন সংবাদ লইতে আসিবেন তাহাতেই যথেষ্ট।" প্রিয়াজীর মাতা কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন "মা তুমি এক গ্রাস প্রসাদ গ্রহণ কর আমি দেখিয়া যাই।"

প্রিয়াজী বলিলেন, "সে জন্য ভাবিবেন না, যাহা করিতে হয়, আমি সকলই ঠিক ঠিক করিব। আপনারা আমার বৃদ্ধা শাশুড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, ইহাই আমার মিনতি।"

অপরাহ্নে প্রিয়াজীর ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। যাঁহারা তাঁহার আহারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, সকলকেই তিনি এমন ভাবে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, যে তাঁহারা তাঁহার মুখ ওভাব দেখিয়া একরূপ এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন।

ফলতঃ গৌরবিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া সেদিন একবিন্দু জলও গ্রহণ করিলেন না। তিনি স্থির করিলেন, যাহার প্রাণের প্রাণ—প্রাণবল্লভ সন্ন্যাসী, তাহার আবার আহার কি, তাহার আবার শয়ন কি? প্রাণের দেবতা ভিখারীর বেশে পথে পথে ভ্রমণ করিবেন, আর আমি ঘরের তলে বসিয়া পোড়ামুখে অন্ন তুলিয়া দিব, কখনই তাহা হইবে না।" প্রিয়াজী এবিষয়ে একবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই দিন হইতেই একরূপ আহার ছাড়িয়া দিলেন। পদকর্ত্তা প্রেমদাস লিখিয়াছেন:—

যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥

দিবানিশি পিয়ে গোরা নাম সুধা খনি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী।
বদন তুলিয়া কারো মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে।
হেনমতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী॥
গৌরাঙ্গ-বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥
প্রবোধ করয়ে তারে কহি কত কথা।
প্রেমদাস-হৃদয়েতে রহিগেল ব্যথা॥

গৌর-বিরহে প্রিয়াজীর অবস্থার লেশাভাস প্রেমদাসের এই পদে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ভক্ত পাঠকগণ এই নিদারুণ দশার কিঞ্চিৎ আভাস বুঝিতে সমর্থ হইবেন। প্রিয়াজী বস্তুতঃ অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গৌর-নাম জপ করিয়া দিবানিশি যাপন করিতেন, গৌর গৌর বলিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেন, কান্দিতে কান্দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মূর্চ্ছাদশায় শ্রীগৌরাঙ্গ সন্দর্শন করিতেন।

কখন কখন শ্রীগৌরাঙ্গের নাম লইতে লইতে এক একটী করিয়া চাউল বাছিয়া লইতেন। এইরূপে যে কয়েকটী চাউল সংগৃহীত হইত, তাহাই ফুটাইয়া লইয়া আপন প্রাণবল্লভের নামে নিবেদন করিয়া উহাই মুখে দিতেন। এইরূপে তিনি কোনপ্রকারে প্রাণ ধারণ করিয়া মহাবিরহে অনুক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ স্মরণ করিতেন। কোন কোন দিন শাশুড়ীর আগ্রহে তাঁহার পাত্রশেষ-প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তিনি কাহারও মুখ দেখিতেন না, কাহারও সহিত

কথা বলিতেন না, নীরবে নির্জ্জনে পড়িয়া থাকিয়া গৌর-চিন্তা ও গৌর-নাম জপ করিয়া বিরহ-যাতনায় দিনযামিনী যাপন করিতেন।

কিন্তু এই নিদারুণ বিরহ-যাতনার মধ্যেও তাঁহার একটী প্রধানতম ব্রত ছিল। সে ব্রত—বৃদ্ধা শ্বশ্রুমাতার সেবা। প্রভু তাঁহার উপরে এই সেবাব্রত প্রদান করিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণে সাহসী হইয়াছিলেন। প্রিয়াজী একমুহূর্ত্তের তরেও এই ব্রতের কোন অংশে ত্রুটি করেন নাই। প্রয়োজনমতে অনেক সময়ে মনের দুঃখ মনে চাপা দিয়া একবারে প্রতিপ্রফুল্ল মুখে তিনি শোকাকুলা শ্বশ্রুমাতার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন, তাঁহার সেবা করিতেন। শ্বশ্রুমাতার সমক্ষে তিনি কখনও নিজের শোকাবেগ দেখাইয়া তাঁহাকে অধিকতর বিহ্বল করিয়া তুলিতেন না। কিন্তু মনের বেগ চাপা দিতে, তাঁহাকে অধিকতর যাতনা ভোগ করিতে হইত। তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আসিয়াছে, কণ্ঠ ফাটিয়া হাহাকার আসিয়া আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, নয়নকোণে শ্রাবণের জলধারার ন্যায় নয়নাশ্রু আসিয়া নয়নকোণেই তাহা শুখাইয়া যাইতেছে, কিন্তু শাশুড়ীর শোক বৃদ্ধির আশঙ্কায় ইহার কিছুই প্রকাশ করিবার যো নাই। আর যেই তিনি শাশুড়ীর সেবা করিয়া নির্জ্জনে বসিবার অবসর পাইতেন, আর অমনি শোকের উচ্ছ্বাস সিন্ধুর উচ্ছ্বাসের ন্যায় অথবা আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাসের ন্যায় ফুটিয়া বাহির হইত, জগতের চক্ষু তাহা দেখিতে পাইত না, জগতের

কর্ণ সে অফুরন্ত আকুল রোদন-ধ্বনি শুনিতে পাইত না। প্রভাদেবী এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

বিজনে তটিনী যথা আকুল পরাণে
তটান্তে তরঙ্গ ঢালি লুটায়ে লুটায়ে
গায় বিরহের গীতি দিবস রজনী।
অথবা নিশায় যথা বিষাদ-সমীর
সাঁ সাঁ রবে বহে একা গগনের গায় ঃ—
একতান—একভাব—যাতনা-বিহ্বল।
তেমনি বিজনে বসি গৌর-বিরহিণী।
বিরহ-বিষাদে কাঁদে দিবস রজনী॥
আড়ালে বসিয়া প্রভা দেখে এ যাতনা।
বিদরে হৃদয় তার,—কে দিবে সান্ত্বনা॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া যে নিদারুণ যাতনা অনুভব করেন, সহস্র সহস্র কবি বিবিধ ভাষায় সেই বিরহ-যাতনা ও বিরহ-বিলাপের আভাস সহস্র সহস্র পদে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গৌরবিরহিণী শ্রীমতী প্রিয়াজীর বিরহ-বেদনা এ পর্য্যন্ত ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক সহৃদয় বাঙ্গালী কবি এই নিদারুণ যাতনার বিসাদচিত্র কাব্যের ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রিয়াজীর অনুগত ভক্তহৃদয়ে ক্রমেই সেই বিরহবিলাপ পরিস্ফুট হইবে, ক্রমেই উহা ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইবে, এবং কালে তাহাতে

পাষাণ-হৃদয়েও কারুণ্যের এবং ভক্তির মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইবে, তাহাতে পাষাণ হৃদয়েও ভগবদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রিয়াজী প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিতে পাইয়া কিয়ৎক্ষণ মূৰ্চ্ছিত হইয়াছিলেন। প্রবীণা রমণীগণ শচীমাতাকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, এদিকে প্রিয়াজী শয়নমন্দিরে মূৰ্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কেহই জানিতে পান নাই। প্রিয়াজীর প্রিয়াসখী সহসা তাঁহার শয়নমন্দিরে গিয়া দেখিতে পাইলেন,

সন্ন্যাস-বারতা শুনি, হেথা গৌর-বিরহিণী
বিষ্ণুপ্রিয়া ভূমে পড়ি আছে অচেতন।
ধূলি-ধূসরিত কেশ চৌদশী চাঁদের বেশ
প্রভাহীন-মৃতপ্রায় মলিন-বদন॥
নাসায় না বহে শ্বাস হলো বুঝি সর্ব্বনাশ
হেরি প্রিয় সহচরী করে হায় হায়।
"হায় হায় একি হলো সব আশা ফুরাইল
উদাস বদন,—প্রিয়া বুঝি ছেড়ে যায়॥"
মুখপাশে মুখ রাখি প্রিয়াজীরে ডাকে সখী
"উঠ উঠ গৌরপ্রিয়া মেল গো নয়ন।
আবার আসিবে সখা কখনো হইবে দেখা
ধৈর্য্যধরি প্রিয়সখি রাখগো জীবন॥
শুনিয়া গউর নাম আসিল প্রিয়ার প্রাণ
কাতরে চাহিলা দেবী সখী-মুখ-পানে।

বলে "কোথা প্রাণপতি কি হবে দাসীর গতি
সন্ন্যাস লয়েছ নাথ তুমি মোরে ছাড়ি।
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ ধরেছ সন্ন্যাসি-বেশ
পরিধানে বহির্ব্বাস,—অরুণ কৌপীন।
করে দণ্ড,—নাহি বাস গাছের তলায় বাস
ভিক্ষা-ভোজী শীর্ণদেহ অতি দীনহীন॥
তবে কেন তব দাসী রহিবে সুখেতে বসি
তবে কেন কেশরাশি করিবে ধারণ।
মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী-বেশ
পড়িব গো সাড়ী ত্যজি অরুণ বসন॥
শঙ্খের কুণ্ডল পরি তব নাম স্মরি স্মরি
অনাহারে অনিদ্রায় যাপিব জীবন।
যতদিন এই দেহে এ ছার জীবন রহে
কোন্ মুখে অন্নজল করিব গ্রহণ॥
শীতের ভীষণ বায় কাঁপিবে তোমার কায়
কোন্ সুখে গৃহে আমি করিব শয়ন।
নিদাঘে দারুণ রৌদে ভ্রমিবে গো পথে পথে
কেমনে ধরিব প্রাণ ঘরেতে তখন॥
বরষায় বারি-ধারা জলময় বসুন্ধরা
কেমনে রহিবে তুমি গাছের তলায়।
এ ভাবে তোমাকে ছেড়ে কোন্ প্রাণে রব ঘরে
ভাবিয়া ভাবিয়া হিয়া বিদরিয়া যায়॥"

বক্ষে করাঘাত করি ভূমে যায় গড়াগড়ি
সোনার লতিকা গৌরপ্রিয়াজী আমার।
প্রভার লোচনে লোর,— বলে "কি করিলে গৌর
কেমনে রাখিব প্রাণ তোমার প্রিয়ার॥

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যাইতে লাগিল কিন্তু প্রিয়াজীর বিরহ-যাতনার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না। তিনি নীরবে আপন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া দিবানিশি কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ চিন্তা করিতেন, তাঁহার চিত্ত অনুক্ষণ নীরবে নীরবে ঝুরিত। বাসুঘোষ একটি পদে এইরূপে প্রিয়াজীর দুঃখ বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী, অকুলে ভাসাইয়া॥
হায়রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥
হায়রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ মোর কারে নিয়া দিলি॥
আর কে সহিবে মোর যৌবনের ভার।
বিরহে অনলে পুড়ি হ'ব ছারখার॥
বাসুঘোষ কহে আর কারে দুখ কব।
গোরাচাঁদ বিনে আর প্রাণ না রাখিব॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ও অসংখ্য পদাবলীতে শ্রীরাধার বিরহ-যাতনা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বিরহে ব্যাকুলভাবে রোদন করিয়া দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেন, বনে বনে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ করিতেন,

তাঁহার দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত শত শত সখী ও অনুচরী ছিলেন কিন্তু প্রিয়াজীর বিরহ-যাতনা বাহির হওয়ার পথ ছিল না, প্রগাঢ় উদ্বেগে তাঁহার পাঁজর ধসিয়া যাইত, কিন্তু তিনি ফুকারিয়া কাঁদিতে পারিতেন না, চিত্তেব আবেগে প্রাণ যখন গৃহরূপ কারাগারে ছট্‌ফট্‌ করিত, তখনও তাঁহার ঘরের বাহির হওয়ার উপায় ছিল না। তিনি কুলবধূ। শাশুড়ীর শোকবৃদ্ধির ভয়ে তিনি ফুকারিয়া কাঁদিতে পারিতেন না, একাকিনী বিরহে জ্বলিয়া মরিলেও সকলের নিকট সে দুঃখের কথা বলিয়া হৃদয়ের ভার কমাইবার যো ছিল না। বাসুঘোষ একটী পদে প্রিয়াজীর এই দুঃখের ভাষা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পদটী এই—

হরি হরি গোরা কোথা গেল।
কোন নিদারুণ বিধি এত দুঃখ দিল॥
হিয়া মোর জরজর, পাঁজর ধসে।
পরাণ গেল যদি, আশা বা কিসে॥
ফুকারি কান্দিতে নারি,—চোরের রমণী।
অনুখন পড়ে মনে গোরা মুখখানি॥
ঘরের বাহির নহি কুলের ঝি।
স্বপনে না হয় দেখা করিব কি॥
সে রূপমাধুরী-লীলা কাহারে কহিব।
গোরা পহুঁ বিনে মুঁই অনলে পশিব॥
গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ।
বাসু কহে মোর মুণ্ডে না পড়য়ে বাজ॥

প্রিয়াজী শ্রীগৌর-বিরহে যে যাতনা অনুভব করিতেন, তাহা তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ মর্ম্ম সখীদের নিকট বলিতে গিয়াও বলিতে পারিতেন না, তাঁহাব বাক্য বন্ধ হইয়া পড়িত, নয়নকোণে অশ্রু-বিন্দু আসিয়া অমনি নয়নকোণেই উহা শুখাইয়া যাইত। সখীর নিকট প্রিয়াজী বলিতেছেন—

কহ সখি কি করি উপায়। ছাড়ি গেল গোরা নট রায়॥
ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ। বিচ্ছেদে বাঁচিব কত দিন॥
নিরমল গৌরাঙ্গ বদন। কোথা গেলে পাব দরশন॥
কি বিধি লিখিল মোর ভালে। চিড়ি দেখি কি আছে কপালে
হিয়া জরজর অনুরাগে। এ দুঃখ কহিব কার আগে॥
কহে বাসুঘোষ নিদান। গোরা বিনু নাহি রহে প্রাণ॥

এইরূপ যাতনার কথা বলিতে বলিতে প্রিয়াজী বলিতেছেন, সখি, যদি গৌর আমায় বিমুখ হইলেন, তবে এ জীবনে আর ফল কি? আমি এ দুঃখের কথা ফুটিয়া বলিতে পারি না, বলিতে গেলে বুক বিদীর্ণ হয়; এখন বল, এ জীবনে আর কি সুখ আছে, আর কি বলিয়াই বা প্রাণ ধারণ করি?

মঝুমনে লাগল শেল। গৌর বিমুখ ভৈ গেল॥
জনম বিফল মোর ভেল। দারুণ বিধি দুঃখ দিল॥
কাহে কহব এই দুখ। কহইতে বিদরয়ে বুক॥
আর না হেরিব গোরা মুখ। তবে আর জীবনে কি সুখ॥
বাসুদেব ঘোষ রসগান। গোরা বিনে না রহে পরাণ॥

প্রিয়াজীর গৌর-বিরহ অফুরন্ত—এ যাতনার বিরাম নাই—

বিশ্রাম নাই—রাবণের চিতার মত সে বিরহ-আগুনের তিলার্দ্ধও নির্ব্বাণ নাই। প্রিয়াজী একাকিনী থাকিতেই ভালবাসিতেন। অপরের নিকট দুঃখের কাহিনী বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না, অপর কাহারও সহিত কথা বলিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইত না। শ্রীগৌর-বিরহ তাঁহার পক্ষে মহাযোগীর ধ্যানের মত গভীরতম হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অনেক সময়েই নিজের হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেন, প্রাণকে ধিক দিয়া আপন মনে শোক করিতেন, সে গভীর শোকের মর্ম্মদাহী বিলাপ অপর কেহ জানিতে পাইত না। তিনি নিজের প্রাণকে বলিতেছেন :—

হেদেরে পরাণ নিলজিয়া। এখন না গেলি তনু ত্যজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর। আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গচাঁদ পাবে। মিছে তার আশ-আশে রবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া প্রভু গেল। এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী। বাসু কহে না রহে পরাণী॥

আবার বলিতেছেন :—

ধিক্ যাউ এ ছার জীবনে।
পরাণের পরাণ গোরা গেল কোনখানে।
গোরা বিনু প্রাণ মোর আকুল বিকল।
নিরবধি আঁখিজল করে ছল ছল॥
না হেরিব চাঁদমুখ না শুনিব বাণী।
হেন মনে করি আমি পশিব ধরণী॥

গেল সুখসম্পদ যত প্রভু দিল।
শেল সমান মোর হৃদয়ে রহিল॥
গোরা বিনু নিশিদিন আর নাহি মনে।
নিরবধি চিন্তি মুই নিধনিয়ার ধনে॥
না হেরিব রাতুল কোমল পদ শোভা।
যাহা লাগি মন মোর অতিশয় লোভা॥
প্রসন্ন আছিল বিধি এবে হলো বাম।
কহে বাসুদেব ঘোষ না রহে পরাণ॥

পদকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-শোক মর্ম্মান্তিক ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল পদের মধ্যে "বারমাসিয়া বিরহ" নামে যে কয়েকটী পদ পাওয়া গিয়াছে, সেই পদগুলি করুণ রসে পরিপূর্ণ। এই সকল পদ কোনও সময়ে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত, এমন কি কৃষক-রমণীরাও এই সকল পদ লইয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইত। নিম্নে এই "বারমাসিয়া-বিরহ" পদের কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া আকাশে।
কে রাখে এ তরি, পতি-কাণ্ডারী বিদেশে॥
জৈষ্ঠে রসাল রস সবে পান করে।
বিরস আমার হিয়া,—প্রিয় নাই ঘরে॥
আষাঢ়েতে রথযাত্রা দেখি লোক ধন্য।
আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য॥

শ্রাবণে নূতন বন্যা জলে ভাসে ধরা।
কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদা জলধারা॥
ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি-জন্মমাস।
সবার আনন্দ,—কিন্তু মোর হা হুতাস॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা সুখী সব নারী।
কাঁদিয়া গোঁয়াই আমি দিবস শর্ব্বরী॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম, হয় হিমপাত।
ভয়ে মরি আমি সখি শিরে বজ্রাঘাত॥
আঘনে নবান্ন করে নূতন তণ্ডুলে।
অন্নজল ছারি মুঞি ভাসি এ অকুলে॥
পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে।
বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে॥
মাঘের দারুণ শীতে কাঁপয়ে বাঘিনী।
একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যামিনী॥
ফাল্গুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে।
কান্ত বিনু অভাগী ঢুলিবে কার কোলে॥
চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্ত উদয়।
লোচন বলে বিরহিনীর মরণ নিশ্চয়॥

২

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা দিবসে।
উদ্বর্ত্তন তৈলে স্নান করায় হরিষে॥

পিষ্টক পায়স আর ধূপ দীপগন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁহে তোমার জন্মতিথি-পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বাল-বৃদ্ধ যুবা ॥
চৈত্রে চাতক পাখী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কাঁদে কি কহিব কাকে ॥
বসন্ত কোকিল সব ডাকে কুহুকুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু ॥
পুষ্প মধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে।
তুমি দূরদেশে আমি গোয়াব কার কোলে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁহে আমি কি বলিতে জানি।
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥
বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোচা ॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে।
সেরূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাঁদে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁহে বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র ॥
জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ-রাতা ॥
সোঙঁরি সোঙঁরি প্রাণ কাঁদে নিশিদিন।
ছট্‌ফট্‌ করে যেন জল বিনু মীন ॥

ও গৌরাঙ্গ পঁহুহে নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার ঘাট॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু মোরে সঙ্গে লইয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা বনে চিন্তি চাও॥
শ্রাবণে গলিতধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা॥
লক্ষ্মীর বিলাস ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁহে তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কব অবধান॥
ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায়॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁহে বিষম ভাদ্রের খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার জীয়ন্তে সে মরা॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা দুর্গা মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে॥

শরত সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ মোরে কর উপদেশ।
জীবন-মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীনবস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা॥
কত ভাগ্য করি তোমার হইয়াছিলাম দাসী।
এই অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে অন্তর যামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥
অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাটনেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গাচরণের ছায়া॥
পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে।
কান্ত আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-অনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে পরবাস নাহি শোহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাসধর্ম্ম নহে॥

মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব ॥
এইত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁহে মোরে লেহ নিজপাশ
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস ॥

৩

ইহ পহিল মাঘ কি মাহ। সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ।
জিনি কনক কেশর দাম। পহুঁ গৌরসুন্দর নাম ॥
কেশ চামর শোহই।
কুসুম শরবর, জিনিয়া সুন্দর, কতিহুঁ ভাবিনী মোহই ॥
না হেরিয়া সোমুখ ফাটি যায়ত বুক, প্রাণ ফাঁফর হোয়রি।
কেশব ভারতী, মন্দ মতি অতি, কয়ল প্রিয়যতি সোঁয়রি ॥
ইহ মাহ ফাল্গুন ভেল। বিহিনাহ কাহে লেই গেল ॥
তঁহি আওয়ে পুণমিক রাতি। দিন সোঙরি ফুরত ছাতি ॥
জন্মদিন ইহ গারিয়া।
ভকত চাতক, অঝোরে লোচন, রোয়ত সোমুখ ভাবিয়া ॥
হাম কৈছে রাখব, পামর পরাণ গৌর তনু নাহি হেরিয়া।
ঐছে মাধুরী, প্রেম চাতুরী, সোঙরি ফাটত ছাতিয়া ॥
ইহ আওয়ে চৈতক মাহ। ঋতুরাজ বাঢ়ায়ত দাহ ॥
ইহ ভকতবৃন্দক মেলি। পহুঁ করত কীর্ত্তন কেলি ॥

কাঞ্চন-বল্লী-মাধুরী-গঞ্জিয়া।
বাহুযুগ তুলি, কৃষ্ণ হরি বলি, লোরে নদী কত সিঞ্চিয়া॥
কান্ত লাগি প্রাণ, করে আনচান, কাহে কাটাব দিন রাতিয়া।
বিরহক আগি, মন দগদগি, মরমে জলত বিরহক বাতিয়া॥
ইহ মাধবী পরমেশ। পিয়া গেল কিয়ে দূরদেশ॥
ইহ বসন্ত তনু সুখ হোড়। তবধার কৌপীন ডোর॥
অরুণ বাস ছোড়লহি চন্দনে।
তেজি সুখময় শয়ন আসন, ধূলায় পড়ি করু ক্রন্দনে॥
যো বুক পরিসর, হেরি কামিনী রস লাগি মোহই।
সো কিয়ে পামর, পতিত কোলে করি অবনী মূরছিত রোঅই
অব জেঠ মাহ ইহ আই। পহুঁ শশী নাহি পাই॥
হাম কৈছে রাখব দেহ। সখি, বিছুরি সো পহু লেহ॥
দারুণ দেহ রহে কিবা লাগিয়া।
নিদাঘ ভাসল, বিরহ ভয়ে হাম, রজনীদিন রহি জাগিয়া॥
যো পদতল থল-কমল-সুকোমল, কঠিন কুচে নাহি ধরিয়ে।
সো পদ মেদিনী, তপত কুশবনে, ফিরয়ে সহিতে কি পারিয়ে॥
ইহা বিরহ দারুণ বাঢ়। তাহে আওয়ে মাহ আষাঢ়॥
তাহে গগনে নবসব মেহ। সব লোক আওল গেহ॥
দারুণ ঐছে বাদর হেরিয়া।
হাম সে পাপিনী, পূড়ব তাপিণী, পহু না আওল ফিরিয়া॥
কিবা সে চাঁচর, চিকুর শ্যামর, চূর্ণ কুন্তল শোভিতা॥
ভালে চন্দন, তাহে মৃগমদ, বিন্দু রতিপতি মোহিতা॥

ইহা সঘনে বাঢ়ত দাহ। তাহে আওয়ে শাঙন মাহ॥
ইহ মত্ত দাদুরী রোল। শুনি প্রাণ ফাটয়ে মোর॥
দামিনী চমকি চমকিত কাঁতিয়া।
মেহ বাদর বরিখে ঝর ঝর, হামারি লোচন ভাঁতিয়া॥
এ দুরদিনে প্রিয়া, দেশে দেশে ফিরত, জিনি সোণার কাঁতিয়া।
হাম অভাগিনী, কৈছে রহব গেহ, এহেন পিয়াক বিছরিয়া॥
মঝু প্রাণ কঠিন কঠোর। তাহে আওয়ে ভাদর ঘোর॥
মঝু প্রাণ জ্বলি জ্বলি যায়। দেহ ছাড়ি নাহি বাহিরায়॥
সো চাঁদ মুখ অব নাহি পেখিয়া।
হায় রে বিধি, না জানি করমহি আর কি রাখিয়াছে লিখিয়া॥
আজানুলম্বিত, বাহু যুগল, কনক-করিবর-শুণ্ডরে।
হেরি কামিনী থির দামিনী রোই ছোড়ল মন্দিরে॥
এ দুঃখ কহব কাহ। তাহে আওয়ে আশিন মাহ॥
ইহ নগর নবদ্বীপ মাঝ। তাহে ফিরত নটবর-রাজ॥
কীর্ত্তনে প্রেম আনন্দে মাতিয়া।
নাগর নাগরী, ও মুখ হেরি, পতিত ঘাতত্তি ছাতিয়া॥
আর পুনঃ কি আওব সো পিয়া নগর-কীর্ত্তন গাইয়া।
খোল করতাল গান সুমধুর, রোই ফিরব কি চাহিয়া॥
এত দুঃখ সহে কিয়ে ত ছাতি। তাহে আওয়ে কাতিক রাতি॥
তাহে শরদ চাঁদ উজোর। তহি ডাকে অলিকুল ঘোর॥
কুসুম-সমুহ নিগন্ধ রাজ বিকশয়ে।
শ্রীবাস আদি কত, ভকত শত শত, করল কীর্ত্তন বাসরে॥

সে হেন সুখ দিন গেল, দুরদিন ভেল, বিহি অব বাম রে।
থাকুক দরশন, অঙ্গ পরশন, শুনিতে দুলহ নাম রে॥

মঝু প্রাণ কর আনচান।
যব শুনিয়ে আঘন নাম॥
পহুঁ অধুনা না আওল রে।
মোরে বিধাতা বঞ্চল রে॥
আঘন যে দারুণ প্রাণ চল তছু পাশ রে।
এ ঘর ছাড়িয়া, দণ্ড করে লৈয়া,
কাহে কয়ল সন্ন্যাস রে॥
এ নব যুবতী, পরাণে বধিয়া,
সন্ন্যাসে কি ফল পাও রে।
কাণে কুণ্ডল পরি, যোগিনী হইয়া,
পিয়াপাশ হাম যাওব রে॥

যব দেখি পৌষ হি মাস।
তব তেজলু জীবনক আশ॥
অব ধন্য সো বর-নারী।
যেদেশে পহুঁ পরচারি॥
গেল তাসব দুঃখ রে।
মঝু প্রাণ পামর, জর জর বিরহে,
দেহ জনু তরু শুষ্ক রে॥

কাঁদিয়া আকুলি, বিরহে ব্যাকুলি,
দশমী দশাপর বেশ রে।
এ শচীনন্দন দাস নিবেদন,
কেন বা ছারিল দেশ রে॥

৩

পহিল হি মাঘ, গৌরবর-নাগর,
দুখ-সায়রে মুঝে ডারি।
রজনীক শেষ, শেজ সঞে ধায়ল,
নদীয়া করিয়া আঁধিয়ারি॥
সজনি কিয়ে ভেল নদীয়াপুর।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে ছিল যত সুখ,
এবে ভেল দুখ পরচুর॥
নিজ সহচরীগণ, রোয়ত অনুখন,
জননী লুঠত মহী রোই।
আহা মরি মরি করি, ফুকরই বেরি বেরি,
অন্তর গরগর হোই॥
সো নাগর-বর, রসময় সাগর,
যদি মোহে বিছুরল সোই।
তব কাহে জীউ, ধরব হাম সুন্দরি,
জনম গোঙায়ব রোই॥

দোসর ফাগুন, গুণগণে নিমগন,
ফাগু-সুমণ্ডিত অঙ্গ।
রঙ্গে সঙ্গিয়া যত, মৃদঙ্গ বাজাওত,
গাওত কতহুঁ তরঙ্গ ॥
সজনি সুন্দর গৌরকিশোর।
রসময় সময়, জানি করুণাময়,
এবে ভেল নিরদয় মোর ॥
কুসুমিত কানন, মধুকর গাওন,
পিককুল ঘন ঘন রোল।
গৌর-বিরহ দাব- দাহে দগধ হাম্,
মরি মরি করি উতরোল ॥
মৃদুমৃদু পবন, বহই চিতমাদন,
পরশে গরল সম লাগি।
যাকর অন্তরে, বিরহ বিথারল,
সো জগমাঝে দুখভাগী ॥

মধুময় সময়, মাস মধু আওল,
তরু নব পল্লব শাখ।
নবলতিকা-পর, কুসুম বিথারল,
মধুকর মৃদু মৃদু ডাক ॥
সহচরি দারুণ সময় বসন্ত।

গোরা-বিরহানলে, যো জন জারল,
তাহে পুনঃ দগধে দুরন্ত ॥
নব নদীয়াপুর, নব নব নাগরী,
গৌর-বিরহ-দুখ জান।
নিজ মন্দির তেজি, মোহে সমুঝাইতে,
তব চিতে ধৈরজ না মান ॥
কাঞ্চন দহন- বরণ অতি চিকন,
গৌরবরণ দ্বিজরায়।
যব হেরব পুন, তব দুখ-বিমোচন,
করব কি মন পাতিয়ায় ॥

দুখময় কাল, কাল করি মানিয়ে,
আওল মাহ বৈশাখ।
দিনকর কিরণ, দহন সব দারুণ,
ইহ অতি কঠিন বিপাক ॥
খরতর পবন, বহই সব নিশিদিন
উমরি গুমরি গৃহ মাঝ।
গোরাবিনু জীবন, রহয়ে তছু অন্তরে,
তাহা দুখ সমুহ ধিরাজ ॥
মন্দ তরঙ্গিত, গন্ধ সুগন্ধিত
আওত মারুত মন্দ।

গৌর-সুসঙ্গ- বিভঙ্গ যদঙ্গ হি,
লাগয়ে আগি প্রবন্ধ॥
কো করু বারণ বিরহ নিদারুণ,
পর কারণ দুখভাগী।
করুণা-বরুণালয়, সো শচীনন্দন,
যাকর হোই বিরাগী॥

গণি গণি মাহ জেঠ অব পৈঠল
অনিল সম সব জান।
কানন গহন দাব ঘন দাহন
ভয়ে মৃগী করত পয়ান॥
মধুরিম আম্র পনস সরসাবলী,
পাকল সকল রসাল।
কোকিলগণ ঘন, কুহুকুহু বোলত,
শুনি যেন বজর বিশাল॥
ইথে যদি কাঞ্চন বরণ গৌরতনু,
দরশন আধতিল হোই।
তব দুখ সকল সফল করি মানিয়ে,
কি করব ইহ সব মোই॥
মধুকর নিকর, সরোরুহ মধুপর,
বেরি বেরি পীবি করু গান!

ঐ ছন গৌর- বদন সরসীরুহ,
মধু হাম করব কি পান ॥
ঘন ঘন মেঘ গরজে দিনযামিনী
আওল মাহ আষাঢ়।
নবজলধর পর দামিনী ঝলকয়ে
দাহ দ্বিগুণ তঁহি বাঢ় ॥
সহচরি দৈবের দারুণ মোহে লাগি।
শরদ সুধাকর সমমুখ সুন্দর
সো পহুঁ কাঁহা গেও ভাগি ॥
অন্তর গরগর পাঁজর জরজর
ঝরঝর লোচন-বারি।
দুখ-কুল-জলধি মগন অছু অন্তর
তাকর দুখ কি নিবারি ॥
যদি পুন গৌরচাঁদ আঁধার নদীয়াপুর
গগনে উজরো হয় নিত।
তব সব দুখ সফল করি মানিয়ে
হোয়ত তব স্থির চিত ॥

পুনপুন গরজন বজর নিপাতন
আওল শাঙন মাহ।
জলধর তিমির ঘোর দিনযামিনী
ঘরবাহির নাহি যাহ ॥

সজনি কো কহে বরিষা ভাল ।
ধারাধর জল ধারা লাগয়ে
বিরহিণী তীর বিশাল ॥
একে হাম গেহি লেহি পুন কো করু
ফাঁফর অন্তর মোর।
তিতি খনে মরি মরি গৌর গৌর করি
ধরণী লোঠহি মহাভোর ॥
গণি গণি দিবস মাস পুন পূরল
মাস মাস করি সাত।
ইথে যদি গৌরচন্দ্র নাহি আওল
নিচয় মরণ কি বাত ॥

আওল ভাদর কো করু আদর
বাদর তবহি না জাত।
দাদুর দাদুরী রব শুনি বেরি বেরি
অন্তরে বজর-বিঘাত ॥
কি কহব রে সখি হৃদয় কি বাত।
পরিহরি গৌরচন্দ্র কাঁহা রাজত
দ্বয় এক সহচর সাথ ॥
যদি পুন বেরি শান্তিপুর আওল
কাহে না আওল নিজ ধাম।

তাঁহা সংকীর্ত্তন প্রেম বিথারণ
পূরল তছু মনকাম॥
দূরাগত পতিত দুখিত যত জীবচয়
তাহে করুণা করু সেই।
তাহে পুন তাপ রাশি পরিপূরিয়া
মোহে কাহে তেজল সোই॥

আওল আশ্বিন বিকসিত সবদিন
জলথল-পঙ্কজ ভাল।
মুকুলিত মল্লিকা কুসুম ভরে পরিমলে
গন্ধিত শরত কাল॥
সজনি কত চিত ধৈরজ হোই।
কেমন শশিকর নিকর সেবন পর
যামিনী রিপুসম মোই॥
যদি শচীনন্দন করুণা-পরায়ণ
যাপর নিদয় ভেল।
তাকর সুখময় সময় বিপদময়
লাগয়ে যৈছন শেল॥
ঘুমহীন লোচন বারি ঝরত ঘন
জনু জলধরে বহে ধার।
ক্ষিতি পর শুই রোই দিনযামিনী
কো দুখ করব নিবার॥

আওল কাতিক সব জন নৈতিক
সুরধুনী করত সিনান।
ব্রাহ্মণগণ পুন সন্ধ্যা তর্পণ
করতহি বেদ-বাখান॥
সখি হে হাম ইহ কছু নাহি জান।
গৌর চরণ-যুগ বিমল সরোরুহ
হৃদে করি অনুক্ষণ ধ্যান॥
যদি মোর প্রাণ- নাথ বহু বল্লভ
বাহুরায় নদীয়াপুর।
ধরম করত তব কছু নাহি খোজব
পীয়ব প্রেম মধুর॥
বিধি বড় নিদারুণ অবিধি করয়ে পুন
সরবস যাহে দেই যোই।
তাকর ঠামে লেই পুন পরিহরি
পাপ করয়ে পুন সোই॥

আওল আঘন মাহ নিরায়ণ
কোন করব সে নিতান্ত।
সব বিরহিণীজন দেহ-বিঘাতন
তাহে ঘন শীত কৃতান্ত॥
শুন সহচরি এবে ভেল মরম বিশেষ।

পুনরপি গৌর কিশোর-চিতে হোয়ত
ভরসা দুখ অবশেষ॥
তব কাহে ধৈরজ মানব অন্তর মাহ
অতএব মরণ অবঘাত।
নিজ সহচরীগণ আওত নাহি পুন
কার মুখে না শুনিয়ে বাত॥
যদি পুন স্বপনে গৌরমুখ পঙ্কজ
হেরিয়ে দৈব-বিধান।
তব হি সুফল করি মানিয়ে নিশে দিনে
আধ তিল ধৈরজ মান॥

আওল পৌষ মাহ অতি দারুণ
তাহে ঘন শিশির নিপাত।
থরহরি কম্পি কলেবর পুনঃপুনঃ
বিরহিণী পর উতপাত॥
সজনি অবহি হেরব গোরামুখ।
গণি গণি মাহ বরষ অব পূরল
ইথে পুন বিদরয়ে বুক॥
তোমারে কহিয়ে পুন মরমক বেদন
চিত মাহাকর বিশ আস।
গৌর-বিরহ জ্বরে ত্রিদোষ হইয়া যারে
তাহে কি ঔষধ অবকাশ॥

এত শুনি কাহিনী নিজ সব সঙ্গিনী
রোই সব জন ঘেরি।
দাস ভুবনে ভণে ধৈরজ করহ মনে
গৌরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি॥

এইরূপ অসংখ্য বারমাসিয়া পদ এদেশে গীত হইত, প্রিয়াজীর বিরহ-যাতনার লেশাভাস এইরূপে বঙ্গের সুদূর পল্লীতে পল্লীতে "বারমাসিয়া" গানের আকারে প্রকাশ পাইত। সে গানে সকলেরই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত, 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া ভাবুক ভক্ত-শ্রোতৃবর্গ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন, পুরাতন কথা বারমাসিয়া গানে নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিত।

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ, গুণ ও লীলা ভক্তসমাজে ও অভক্ত সমাজে সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইত। এই বারমাসিয়া গানগুলি কোন কোন অঞ্চলে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

এখনও গৌরভক্ত নরনারীগণ প্রিয়াজীর বিরহ-যাতনার লেশাভাস অনুভব করিয়া পদ-গীতিকা রচনা করিয়া থাকেন, সেই সকল পদেও এই নিদারুণ বিরহ-রসের আভাস পাওয়া যায়। নিম্নে এক বিশিষ্টা ভক্ত মহিলার পদ প্রকাশ করা যাইতেছে।

১*

গৌর গরবিণী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী
বিয়োগে পাগলী পারা।

* ১ হইতে ৩ চিহ্নিত পদত্রয় গোলকগত ৺শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ের পরম স্নেহ-পাত্রী ভগিনী মহোদয়ার রচিত।

সোনার পুতলী ধূলায় পড়িয়া
নয়নে বহিছে ধারা॥
চাহি সখীপানে সজল নয়নে
তেয়াগী সরম লাজ।
বলে "সখি, বল কি হোলো কি হোলো
শিরে কে হানিল বাজ॥
শুন সহচরি কিছু নাহি জানি
কি কাল রজনী এলো।
মোর হৃদি ধন অমূল্য রতন
গৌরাঙ্গ হরিয়া নিল॥
শুন সহচরি আগে যদি জানি
ছেড়ে যাবে গোরাশশী।
পরাণ ভরিয়া সে মুখ দেখিতুঁ
জাগি পোহাইতাম নিশি॥
জগত দুর্ল্লভ আমার রতন
আগে জানিতাম যদি।
সে দুটী চরণ করিয়া যতন
হৃদে রাখিতাম বাঁধি॥
অসাধনে আমি রতন পাইয়া
গরবে ভরিয়া গেনু।
অমূল্য রতন হেলায় হারায়ে
এখন ঝুরিয়া মনু॥

আর না সেবিব সে রাঙ্গা চরণ
আর না হেরিব মুখ।
গৌরাঙ্গ বিহনে নাহি গেল প্রাণ
কেন না ফাটিল বুক॥
নিলাজ পরাণী যাওরে এখনি
থেক না থেক না আর।
পরাণ-পরাণী গোরা গুণমণি
ছাড়িয়া গেছে আমার॥
রূপের জলধি গোরা-গুণনিধি
প্রাণপতি হারা হয়ে।
মুই অভাগিনী বড়ই পাষাণী
এখনও রয়েছি জীয়ে॥
গৌর-গরবে গরবিনী হায়
ছিলাম নদীয়া পুরে।
নদিয়াবাসিনী যতেক রমণী
সকলে সেবিত মোরে।
এবে অভাগিনী পতি তেয়াগিনী
না দেখিবে মোর মুখ।
শুনরে সজনী জ্বালার আগুনি
নিভাই সকল দুঃখ॥
কোথা প্রাণেশ্বর গুণের সাগর
গৌরাঙ্গ দয়ার নিধি।

তোমার বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়া দহে
জুড়াও তাহার হৃদি ॥
কোথা প্রাণপতি অগতির গতি
কোথা হে করুণাধাম।
করুণা করিয়া জগত তারিলে
কি দোষে দাসীরে বাম ॥
তোমা না দেখিয়া মরে বিষ্ণুপ্রিয়া
কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ।
জনম দুঃখিনী দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া
কর নাথ আত্মসাত ॥
কহে কাঙ্গালিনী যুড়ি দুই পানি
শুনলো গোরাঙ্গ প্রিয়া।
গোরা দয়াময় তোমা ছাড়া নয়
দেখ না আপন হিয়া ॥
তারিতে সংসার গোরা অবতার
তাঁহার সহায় তুমি।
তব আঁখি জলে জগত ভাসালে
তারিলে ভারতভূমি ॥
গৌর-প্রেমদাত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী
বারেক যে তোমা ভজে।
লভে গোরাপদ পরম সম্পদ
গতি হয় তার ব্রজে।

ওগো মা জননী মুছ আঁখি পানি
কহিছে বলাই দাসী।
বড় সাধ মনে হেরিব নয়নে
ও চাঁদবদনে হাসি ॥
গোরা মনোরমে বসো গোরাবামে
নয়ন ভরিয়া হেরি।
দেহ এই ভিক্ষে ছুঁহে রহ সুখে
মুই কাঁদি জন্মভরি ॥

২

মনে ভাবি প্রাণসখি, হৃদয়ে সে রূপ আঁকি,
নিশি দিশি করি নিরীক্ষণ।
করেতে লইয়া তুলি, ভাবিতে সে অঙ্গগুলি,
এলাইয়া পড়ে তনুমন ॥
নয়নে বহয়ে নীর, পরাণ না হয় স্থির,
কেমনে আঁকিব ছবি বল।
না হইল ছবি আঁকা, না হইল রূপ দেখা,
সব আশা হইল বিফল।
একবার মনে করি, শুন প্রাণ সহচরি,
নাথ সনে মনে কথা কই।
স্মরিতে তাঁহার কথা, হৃদে উঠে যত ব্যথা,
আমাতে আর আমি যেন নই ॥

বাক্‌রোধ হয় মোর, ঝরে না নয়নে লোর,
অমনি মুরছি পড়ি ধরা।
যত কথা রৈল মনে, না হলো নাথের সনে,
আরো মোরে করিল অধীরা।
নিশিযোগে শুয়ে থাকি, মনে মনে ভাবি সখি,
নিদ্রা এলো দেখিব স্বপনে।
মোর ভাগ্য মন্দ অতি, যে অবধি গেছে পতি,
নিদ্রাত্যাগ করেছে নয়নে।
কি আর কহিব দুঃখ স্বপনে ও চন্দ্রমুখ,
একবার নারিনু দেখিতে॥
আমার মরম ব্যাথা, মরমে রহিল গাঁথা,
কেবা আছে কব কার সাথে॥
কি আর বলিব বল, আমার করম ফল,
সবদিকে হইনু বঞ্চিত।
গৌরাঙ্গ বিরহানল, কেমনে নিভাই বল,
উপায় যে না দেখি কিঞ্চিত॥
এবে দেখি সহচরি, কাঁদিব জীবন ভরি,
এই মোর ললাট লিখন।
ছাড়ি গেল প্রাণধন, প্রাণ নাহি গেল কেন,
বিধির বিধান নিদারুণ।
না, আমি চাহি না সুখ, বুকভরা থাক দুঃখ,
মরমে থাক রে মর্ম্মব্যথা।

জ্বল রে বিরহানল, পড় রে নয়ন জল,
স্মরাইয়া দাও গৌর কথা ॥
ছাড়ি গেছে প্রাণপতি, তোরা দোঁহে মোর সাথী
এ দুঃখেতে আমার সহায় ।
তোরা যদি যাস্ ফেলি, গৌরকথা যাব ভুলি,
তবে মোর কি হবে উপায় ॥”
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা, এতেক কহিয়া কথা,
মুরছি পড়িল ভূমিতলে ।
বলাইদাসের দাসী, অমনি পদ পরশি,
লুটায়ে পড়িল তার তলে ॥

৩

সনাতন বালা করে লয়ে মালা
জুড়াইতে জ্বালা বসিল জপে ।
স্মরি শ্রীগৌরাঙ্গ এলাইল অঙ্গ
চিত হল ভগ্ন বিষম তাপে ॥
কনক-বরণী এলায়িত বেণী
দীন কাঙ্গালিনী পাগলী পারা ।
ধূলায় ধূসরা ক্ষীণ কলেবরা
ঝরিছে নয়ন, বহিছে ধারা ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি বলে “মরি মরি
এই ছিল কি হরি তোমার মনে ।

করুণা প্রকাশি করি নিজ দাসী
দিয়া প্রেমফাঁসি বধিলে প্রাণে ॥
যায় প্রাণ যায় তায় ক্ষতি নাই
ওহে দয়াময় যে সুখে আছি।
দগধ জীবন দিয়া বিসর্জ্জন
নিভাই আগুন এখনি বাঁচি ॥
তবে এক সাধ আছে গোরাচাঁদ
হেরি মুখচাঁদ মরিব আমি।
অন্তিম সময় করুণা-নিলয়
হৃদয়ে উদিত হবে কি তুমি ॥
রাতুল চরণ করি আলিঙ্গন
ও চাঁদবদন দেখিতে দেখিতে।
জনমের মত শেষ করি ব্রত
হবে দাসী হত এ সাধ চিতে ॥
আর এক বাণী শুন গুণমণি
যবে আসি তুমি দিবে হে দেখা।
ছাড়ি দীনবেশ আমার প্রাণেশ
এস দাসী পাশে পরাণ-সখা ॥
গৌরাঙ্গ-সুন্দর হবে নটবর
মম হৃদিপর দাঁড়াবে আসি।
ভরিয়া নয়ন হেরি সুবদন
তেয়াগিবে প্রাণ তোমার দাসী ॥

যুড়ি দুই হাত বলে প্রাণনাথ
তুমি জগন্নাথ জগৎ স্বামী।
জগত বাঞ্ছিত তোমার শ্রীপদ
যেন হে বঞ্চিত না হই আমি॥"
কহিতে এ কথা সনাতন-সুতা
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা পড়িল ধরা।
গেল বুঝি ধনী বলি কাঙ্গালিনী
ধরি পা দুখানি বসিল ত্বরা॥
উঠগো জননী গৌর-সোহাগিনী
জগত-তারিণী জগত-মাতা।
তব প্রাণেশ্বর নহেন অন্তর
অন্তরে তোমার আছেন গাথা॥
ওমা হয়ে কাঙ্গালিনী তারিলে অবনী
ধন্য গো জননী তোমার দয়া।
পড়ি পদতলে কাঙ্গালিনী বলে
দিও গো যুগল চরণ-ছায়া॥

প্রিয়াজী দিনের বেলায় বিষণ্ণবদনে গৃহকার্য্যাদি করিতেন, শাশুড়ীর সেবা করিতেন কিন্তু তাঁহার চিত্ত সততই শ্রীগৌরভাবনায় ব্যাকুল থাকিত। বৃদ্ধা শচীমাতা বধূমাতার সান্ত্বনার জন্য অনেক কথা বলিতেন, অনেক প্রকার উপদেশ দিতেন কিন্তু সে প্রকার সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেই পুত্র-বিরহের শোকবন্যায় ভাসিয়া যাইতেন, হাহাকার করিয়া কাঁদিতেন, তজ্জন্য প্রিয়াজীকে শতগুণ অধিক

ক্লেশভোগ করিতে হইত। এ অবস্থায় শাশুড়ীর নিকট তিনি বিরহ-ভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া তাঁহার সেবা ও সংসারকার্য্য করিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের পর হইতে গৃহকার্য্যের কোনও আড়ম্বর ছিল না। সেরূপ লোকসমাগমের ঘটাও ছিল না। আর সেরূপ পঁচিশ ত্রিশজন করিয়া সাধুসন্ন্যাসীর সেবা লইয়াও ইঁহাদিগকে বিব্রত হইতে হইত না। এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহ একরূপ নির্জ্জন হইয়াছিল। তবে সহৃদয় রমণীগণ সততই শচীমাতা ও প্রিয়াজীর তত্ত্বাবধান করিতেন, শ্রীবাসাদি ভক্তগণও অনুক্ষণ প্রভুর বাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু ইঁহারা প্রভুর বাটীতে গিয়া অন্য কোনরূপ কথা তুলিতেন না। বিরহব্যাকুলা শচীমাতা অন্য কথায় কাণ দিতেন না, শ্রীগৌরাঙ্গের কথা সততই তাঁহার মনে জাগিত, অথচ সে কথা তুলিতে গেলেই তাঁহার হৃদয়ের শোক-পারাবার উছলিয়া উঠিত।

ভক্তগণ ও সহৃদয় মহিলাগণ অতি সাবধানে শচীমাতার গৃহে যাইয়া তাঁহাদের সেবাদির তত্ত্বাবধান ও সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন। সুতরাং প্রভুর বাড়ীখানি সততই নির্জ্জন ও নীরব বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এই নীরবতার মধ্যে সময়ে সময়ে শচীমাতা যখন পুত্র-বিরহে হৃদয়ের দ্বার উঘারিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিতেন, তাহা শুনিয়া পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যাইত। যাঁহারা প্রবোধ দিতে যাইতেন, সে রোদনে ও সে বিলাপে তাঁহারাও অধীর হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিতেন। তখন

কার এই হৃদয়বিদারী ভাবের কথা অনুমানেও কিছু কিছু বুঝা যাইতে পারে।

প্রিয়াজীর চাপা শোক উচ্চরোদনে ফুটিত না, তিনি চেঁচাইয়া কাঁদিতে জানিতেন না। যাতনায় তাঁহার বক্ষে ও কণ্ঠে চাপ পড়িত, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিত, মুখে কথা ফুটিত না, মুখমণ্ডল আরক্তিম হইত, নয়নে জলধারা দেখা দিয়াই উহা বন্ধ হইয়া যাইত। তখন ধীরে ধীরে মুখের আরক্তিমতা ঘুচিয়া যাইত, শিশিরসিক্তি পরিমৃদিত কমলের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী অত্যন্ত মলিন দেখাইত। প্রিয়াজীর শ্রীমুখ পঙ্কজের এই ভাব দেখিয়া সকলের প্রাণই বিদীর্ণ হইত। বৃদ্ধা শচীমাতা প্রিয়াজীর মুখের দিকে চাহিয়া আরও অধীর হইতেন, বিনা রোদনেও অধিকাংশ সময়েই তাঁহার মুখে রোদনের ভাব ফুটিয়া বাহির হইত। বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া, তাঁহাকে শয়ন করাইয়া অবশিষ্ট সময়ে তিনি একাকিনী অপর গৃহের কোণে বসিয়া আপন মনে গৌর-বিরহে ঝুরিয়া ঝুরিয়া দিনমান যাপন করিতেন। প্রিয়াজীর গুরুগম্ভীর অথচ ব্যাকুলতাময় ভাবলেশ-অবলম্বনে গৌরপ্রভা যে সকল গান রচনা করিয়াছেন, নিম্নে তদ্‌রচিত কয়েকটী গান প্রকাশ করা যাইতেছে :—

১

ওহে প্রাণেশ্বর, গৌরসুন্দর
জগত-জীবের সখা।

চরণ দাসীরে কেন বা বঞ্চিলে
কি মোর করম লেখা ॥
তোমার চরণ,—আমার শরণ,
তুমি চিরদিন আমার জীবন,
তোমা হারা হয়ে রয়েছি পড়িয়ে
কবে প্রাণনাথ পাইব দেখা।
দেখিতে দেখিতে কোথা লুকাইলে,
ফিরিয়া চাহিতে যেন চলে গেলে ;
না পূরিতে সাধ, বিধি সাধে বাদ,
প্রতিপদে যেন চাঁদের রেখা ॥
যোগীর মতন তোমারে ধিয়াই
দয়াল নদীয়া-চাঁদ।
সকলের প্রতি তুমি দয়াময়
স্থধুই দাসীরে বাম ॥
তোমার পথের লক্ষ্য ধরিয়া
বসিয়া রয়েছি একা।
শত সাধনার উজ্জল রতন
দাও হে দাসীরে দেখা ॥

২

আমি কি লয়ে থাকিব ঘরে ?
জীবন আমার, পরাণ আমার
গিয়েছ আমায় ছেড়ে।

আমি সারাটি রজনী জাগিয়া জাগিয়া
তোমার লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
তোমার আশায় পরাণ ধরিয়া
রয়েছি এখানে পড়ে ॥
দিনযামিনী জপি তব নাম,
তুমি নাথ মম তনুমন প্রাণ,
তোমার মধুর মূরতি মোহন
রয়েছে নয়ন ভ'রে।
বিরহে তাপিত এ তনু রেখেছি
ও পদ-পরশ তরে ॥
তব কথাসুধা শুধু জাগে কাণে,
তব তনু গন্ধ সদা পাই ঘ্রাণে,
জাগিয়া জাগিয়া স্বপনে স্বপনে
পরাণ তোমারে স্মরে।
দাসী বলে নাথ মনে কি পড়ে না
এস হে কান্ত ফিরে ॥

৩

ওহে পরাণ বল্লভ আমার, তুমি কোথা—
কোথা গেলে আমায় ফেলে।
আমায় স্থান দাও, স্থান দাও হে.নাথ—
তোমার চরণ তলে ॥

নীরবে নীরবে গুমরে মরি
ফুকারি তিলেক কাঁদিতে নারি,
সারা নিশিদিন তোমারে ভাবিয়া
ভাসিতেছি আঁখিজলে।
পরাণ বল্লভ রাখ এ দাসীরে
চরণ ধূলার তলে॥
তুমি বিনে আর কে আছে আমার
এ বিপুল ধরা মাঝে।
তোমা ছাড়া সব হয়েছ আঁধার,
রবো বা কাহার কাছে॥
কোথা—কোথা নাথ—কনক-কান্তি,
তব পদযুগ দাসীর শান্তি ;
শ্রান্তচরণ রাখহ বারেক
দাসীর বক্ষঃস্থলে।
চির সাধনার চরণ দুখানি
ধোয়াব নয়নজলে ॥

৪

তোমার চরণ পথ আমার সর্ব্বস্ব ধন,
সে ধন ধূলায় ধূসরিত।
হেথা আমি অভাগিনী গৃহের মাঝারে রহি
ছার দেহ রাখি আবরিত॥

নিরমল তব তনু কোটি-ভানু-সমুজল
লাবণ্য-মাধুর্য্য-সুধা-সার।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ সদা করে আনছান
চারিদিকে বিঘোর আঁধার॥
তোমার দরশ তরে রেখেছি জীবন ধ'রে
পাব কি তোমার দরশন।
তুমি নাথ দীনবন্ধু,—অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপাবিন্দু যাঁচে দেবগণ॥
আমি অতি অভাগিনী পেয়ে পদ রত্নখানি
সেবিতে না হলো অধিকার।
তোমার বিরহ-শোকে জ্বলে হিয়া সদা দুখে
পরাণে সতত হাহাকার॥

৫

শূন্য মন্দিরে কাঁদে পরাণ
কোথা বা নদীয়াচাঁদ।
অনন্ত শূন্য হৃদয় মোর,
কোথা গেলে ওহে চিত্তচোর ?
এস এস এস পরাণ গৌর
আজ টুটেছে হৃদয় বাঁধ॥
বিষাদ-বন্যা তরঙ্গ তুলিয়া
হৃদয়ে দিয়েছে হানা।

গেল বুঝি টুটে ধৈরয মোর,
জীবনের সে সাধনা ॥

তোমার বিরহ অনন্ত সাগর
দিবানিশি ভাসি হইনু ফাঁপর
পরাণ-বঁধুয়া গৌরাঙ্গসুন্দর
নয়ন-আনন্দ-ছাঁদ ।
তোমার বিহনে হৃদয় উদাস
না আছে শান্তিবিন্দু-লেশাভাস
তোমা ছাড়া হয়ে শূন্য হৃদয়ে
এ জীবনে কিবা সাধ ॥

৬

কনক-সুন্দর গৌর কিশোর
কোথা বা উদিল রে ।
শূন্য নদীয়া শূন্য হৃদয়
আঁধারে ঘেরিল রে ॥
দগধ পরাণ করে আনছান,
বিরহ-অনল জ্বলে অবিরাম,
হিয়া দগদগি সদা অফুরাণ
চিত্ত জারল রে ।
অমৃতসিন্ধু গৌরইন্দু
চরণ-দরশ-পীযূষ-বিন্দু-

আশে রেখেছি জীবন তুচ্ছ
কোথা বা রহিল রে।
বিরহ অনল দারুণ তীব্র
হৃদয় দহিল রে॥

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীলা ছিলেন, কিন্তু গৌর-বিরহে তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যদিও শচীমাতা তাঁহার অধীরতা অল্পমাত্রই লক্ষ্য করিতেন। যদিও তাঁহার অন্তরঙ্গ দুই একটী সহচরী তাঁহার নয়নে অশ্রু এবং সময়ে সময়ে শোকের প্রতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস প্রত্যক্ষ করিতেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক উদ্বেগ এত প্রগাঢ় ছিল যে অতি নিকটবর্ত্তিনী সহচরীরাও তাঁহার প্রকৃত পরিমাণ বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার মুখমণ্ডলে গৌর-বিরহ-যাতনার যে গম্ভীরচ্ছবি সততই দৃষ্ট হইত, তাহা ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে না।

প্রিয়তম প্রণয়ীর বিরহে পতিপ্রাণা প্রণয়িণী পত্নীর যে সকল অবস্থা ঘটে রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ সেই সকল অবস্থা প্রধানতঃ দশ প্রকার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন,—যথা, উদ্বেগ, চিন্তা, জাগরণ, অঙ্গ-কৃশতা, অঙ্গ-মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু। গৌর-বিরহে প্রিয়াজীর এই সকল দশা অত্যধিক পরিমাণেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু সংযম ও স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যই বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত্রের প্রধানতম উপাদান। তাই তাঁহার বিরহের ভাব বহিরঙ্গগণ কেহ বেশী জানিতে পারেন নাই।

পরন্তু এত সংযমের মধ্যেও সময়ে সময়ে প্রিয়াজী যখন একা-

বাম করেতে কপোল রাখিয়া
মহাযোগিনীর মত
শ্রীগৌরাঙ্গ-ধ্যানে বিরহ-ব্যথায়
কাঁদিছেন অবিরত॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইয়া
সোণার প্রতিমা থানি।
ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি যায়
নিরজনে একাকিনী॥
বিরহ-সন্তাপে প্রতপ্ত হৃদয়
ধৈরয নাহিক মানে,
মরম-যাতনা গোপনে প্রকাশে,
সহচরী নাহি জানে॥
ফুকারিয়া দেবী কাঁদিতে না পারে
পাছে বা রোদন শুনি
শচীমার প্রাণ হয় বিয়াকুল,
এই ভয় মনে গণি॥
গুমরি গুমরি ফাঁপরি ফাঁপরি
অনন্ত যাতনা ভার
বহে বিষ্ণুপ্রিয়া আপন হৃদয়ে;
কেবা পারে সহিবার॥
কাঁদি প্রভা কহে "গৌর-বিভাবিনি
এই ঘোর যাতনায়।

চরণের পাশে রাখ এ দাসীরে,
এ মিনতি তব পায়॥
ধূলি-ধূসরিত শ্রীঅঙ্গ নেহারি,
নেহারি লোচনে লোর
শচীমার প্রাণ হইবে আকুল
না পাবে যাতনা ওর॥
আমি পাশে রহি মুছাব শ্রীঅঙ্গ,
মুছাব নয়ন জল।
চরণের তলে রহিয়া জপিব
গৌরনাম অবিরল॥

চিত্তের উদ্বেগ ও চিন্তার এই অবস্থায় যে কি নিদারুণ যাতনা উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনার অতীত। প্রিয়াজী কোন কোন দিন মর্ম্মসখীর নিকট অতি সংগোপনে এই বিরহক্লেশের লেশাভাস বলিতে যাইতেন। দুই একটি কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার বাক্য গদ্‌গদ হইয়া পড়িত, তাঁহার মনের কথা মুখে আসিতে না আসিতেই তাঁহার বাক্য বদ্ধ হইয়া পড়িত, নয়নজলে শ্রীমুখকমল ভাসিয়া যাইত, তিনি অধোবদনে নীরবে অশ্রুপাত করিতেন। আবার কথন কথন অশ্রুর উৎস পর্য্যন্ত বদ্ধ হইয়া যাইত, নয়নকোণ হইতে নয়নজল-বিন্দু পড়িতে না পড়িতে উহা নয়নকোণে শুথাইয়া যাইত।

তাঁহার এই নিদারুণ নীরবতার মধ্যে যে কি ভীষণ উদ্বেগ আকুলিতভাবে নীরবে নীরবে উছলিয়া উঠিত, তাহা বাহিরের

লোকের বোধগম্য হইত না। আবার কখন কখন দুই একটি কথা আগ্নেয় গিরির উষ্ণনিঃস্রবের ন্যায় ভাষায় ফুটিয়া বাহির হইত। তিনি মর্ম্মসখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন,—সখি শুনিতে পাই, প্রাণবল্লভ আমার করুণাময় বিগ্রহ, তিনি জগতের জীবগণের উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস লইয়াছেন। জীবদিগের দুঃখ যাহাতে দূর হয়, তিনি সেইরূপ নামপ্রেম দিয়া জীবের ক্লেশ নিবারণ করিবেন? আমিও তো তাঁহারই পদাশ্রিতা, এ জগতে তিনি ছাড়া আমার আর কে আছে? দয়াময় প্রাণেশ্বর এ দাসীকে কোন্ দোষে ত্যাগ করিলেন? যদি তাঁহার চরণসেবার অধিকার না পাইতাম, তবে বোধহয় এত যাতনা হইত না। এই নদীয়ায় আমার মত আরও তো শত শত রমণী আছেন, গৌরচরণ-সেবায় যে কি আনন্দ, তাঁহারা তাহা জানেন না; না জানিয়া ভালই আছেন। এ অমৃতে যে এত হলাহল, এ পারিজাত-কুসুমকাননে যে এত কণ্টক ও এত বিষধর ভুজঙ্গের বাস, আমি তাহা আগে জানিতাম না। গৌরপ্রেমের তরঙ্গরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া মনে হইত, সখি, আমার চিরদিন বুঝি এমনি ভাবেই অতিবাহিত হইবে, এ সুখময় সাগর বুঝি আর শুখাইবে না। কিন্তু সখি, পোড়াবিধির বিধান দেখ, প্রতিপদের চাঁদের মত আমার প্রাণের গোরাশশী আমার হৃদয়-গগনে তাঁহার প্রেম-জ্যোতিঃ দিতে না দিতেই আমায় আঁধারে ফেলিয়া অদর্শন হইলেন। এক মুহূর্ত্তেই আমার সুখের সাগব শুখাইয়া গেল। আমি এখন গভীর জলের মীনের মত মরুভূমে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছি। আমি ভাবিতাম তিনি আমায় কত ভালবাসেন। যে

নিশির শেষে আমার হৃদয়ে বজ্রনিক্ষেপ করিয়া নিঠুর আমায় নিদ্রায় ফেলিয়া চলিয়া যান, সে নিশিতেও তিনি আমার প্রতি যেরূপ ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন, যেরূপ প্রণয়বিলাসে আমায় কোলে তুলিয়া লইয়া আমার মুখ—”

এই কথা বলিয়াই প্রিয়াজীর কণ্ঠ সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল। তিনি আর একটী কথাও বলিতে পারিলেন না; নিদারুণ উদ্বেগে ঢলিয়া পড়িলেন। বজ্রাহত কনকলতার ন্যায় প্রিয়াজীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রিয় নর্ম্মসখী তাঁহাকে ধরিয়া আপন কোলে তুলিয়া লইলেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া নিজেই ব্যাকুল হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রিয়াজীর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি বলিলেন, সখি, ওকি! এইজন্যই তো আমি তোমাদের কাছে মনের কথা বলি না। আমার নিজের দুঃখের পার নাই। তোমরা আমার প্রিয়জন, আমার দুঃখে তোমাদিগকে দুঃখ দিব কেন, এই ভাবিয়া মনের দুঃখ নিজের মনে চাপিয়া রাখিতে চাই। কিন্তু পোড়া হৃদয়ে চাপা দিতে যাইয়া নিজেই অধীর হইয়া পড়ি, নিজেই ব্যাকুল হইয়া প্রিয়-জনকে ব্যাকুল করি। সখি চুপ কর, আমার শোকাতুরা মা যদি রোদন শুনিতে পান, তিনি উহা বজ্রপাত অপেক্ষা অধিক ক্লেশজনক মনে করিবেন। আমার হৃদয়ে নিরন্তর সহস্র রোদন ঘুরিয়া ফিরিয়া বাহির হইতে প্রয়াস পায়, আমি কেবল মায়ের দিকে চাহিয়া বাধা দিয়া রাখি। বর্ষার ধারার ন্যায় অবিরাম নয়নজল আমার নয়ন-কোণে সঞ্চিত হইতে চাহে, আমি নিজের নয়নজল নিজের আঁচলে

মুছিয়া সাদামুখে মায়ের নিকটে আসিয়া যথাসম্ভব তাঁহার সেবা করি। আমার সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন সেই সুখের স্মৃতিও আমার পক্ষে বিষ। সেই সকল আদর ও সুখের কথা মনে করিতে গেলেই আমার উদ্বেগ বাড়ে, ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া যায়। যে অনন্ত যাতনায় দিনযামিনী আমার চিত্ত দগ্ধ হইতেছে, আমার তাহা বলিবার শক্তি নাই, ইচ্ছাও নাই। যতদিন পারি, নিঠুরের চরণ চিন্তা করিয়া সকল ক্লেশই সহিতে চেষ্টা করিব, আর যতদিন পারি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিব—এইরূপ মনে করিয়া চিত্ত স্থির করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু বর্ষাকালীন গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় দারুণ উদ্বেগে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাকে আকুল করে, আর আমার এ অবস্থায় তোমাদের প্রাণেও অশেষ যাতনা হয়।

সখি, আমি তাঁহাকে কিছুতেই ভুলিতে পারি না—সেই ভুবন-মোহন রূপ, সেই লাবণ্য-সৌন্দর্য্য-সুধা-সিন্ধু দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আমার নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়, আর আমায় বাউরী করিয়া তোলে। তাঁহার সোহাগ ও আদর এখনও মনে লাগিয়া রহিয়াছে। পাশরিব বলিয়া মনে করিলেও পাশরিতে পারি না,—সখি আমার এ কি হলো,—আমার প্রাণবল্লভ—আমার প্রাণেশ্বর,—আমার রসময় রসিকশেখর—কোথা তুমি—"

বলিতে বলিতে প্রিয়াজীর উত্তাল নয়নতারা স্থির হইয়া গেল, নয়নের জল নয়নে শুকাইল, শ্রীমুখকমল পাণ্ডুর হইয়া পড়িল, সখী ধীরে ধীরে তাঁহাকে আপন কোলে শোয়াইয়া মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার কর্ণে গৌরনাম জপ করিতে লাগিলেন।

এবার দীর্ঘকাল পরে প্রিয়াজীর চেতনা হইল। তাঁহার দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে সখী বুঝিতে পাইলেন,—প্রিয়াজীর চেতনা আসিয়াছে। তিনি অতি মধুর কোমলভাষায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "সখি, তুমি এরূপ হইলে এ দেহ থাকিবে না। প্রাণ থাকিলে অবশ্যই কোনদিন প্রাণবল্লভের দর্শন পাইবে। তাঁহার ন্যায় করুণা-কোমল পতি কি কখনও তোমার ন্যায় প্রেমবতী প্রণয়িনী লক্ষ্মী-পত্নীকে চিরদিন ভুলিয়া থাকিতে পারেন ? যে কার্য্যের জন্য তিনি ঘরের বাহির হইয়াছেন, সেই কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আবার তোমার সহিত তাঁহার মিলন হইবে।"

এইরূপ উদ্বেগের আতিশয্যে এক একদিন প্রিয়াজীর জীবনের আশঙ্কা উপস্থিত হইত। তাহা শচীমাতা জানিতে পাইতেন না, অপর লোকেও জানিত পাইত না। কেবল দুই একটি মর্ম্মসখী কোন কোন সময়ে এই ভীষণ অবস্থার লেশাভাস জানিতে পাই-তেন। দিনমান কোনও রূপে সাংসারিক কার্য্যাদিতে কাটিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রিতে প্রিয়াজীর যে যাতনা হইত, তাহার লেশা-ভাস অনুভাবেও বুঝা কঠিন। রাত্রিতে বিরহ-যাতনা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিত। তিনি শাশুড়ীর নিকট শয়ন করিতেন। বুক ফুলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিত, কিন্তু ভয়ে ভয়ে তিনি সেই উষ্ণশ্বাস চাপিয়া রাখিতেন। যতক্ষণ শচীমাতার নিদ্রা না হইত, ততক্ষণ তিনি তাঁহার চরণসেবা করিতেন, নয়ত মস্তকের পার্শ্বে বসিয়া মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন। তাঁহার সুকোমল সেবায় তাপদগ্ধা শচীমার তন্দ্রার ন্যায় ভাব হইত।

জাগরণ

কিন্তু প্রিয়াজীর নিদ্রা ছিল না। যে দিন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে নিদ্রার কোলে মগ্ন রাখিয়া গৃহত্যাগ করিলেন, সেই-দিন হইতে নিদ্রাও প্রিয়াজীর নয়নের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিল। কি দিবা কি রাত্রি, কোনও সময়ে তাঁহার নিদ্রা হইত না। অনাহার অনিদ্রায় তিনি কেবল গৌরবিরহে, গৌরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। রাত্রিতে যে সময়ে তাঁহার প্রাণনাথ গম্ভীরা-মন্দিরে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণবিরহে নানাপ্রকার যাতনা অনুভব করিতেন, এবং "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন ও বিলাপ করিতেন,—গৌরবল্লভা বিষ্ণুপ্রিয়াও তখন শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য অধিকতর উদ্বিগ্ন হইতেন।

কিন্তু গৌরসুন্দর পুরুষ, তাহাতে সুবিজ্ঞ, নানা প্রকারে মনকে প্রবোধ দিবার শক্তিসামর্থ্য থাকাসত্ত্বেও তিনি শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইতেন। শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর স্বভাবতঃ সুকোমল নারী-হৃদয়। প্রেম-রস-সর্ব্বস্ব প্রণয়ী পতিবিরহে তাঁহার ব্যাকুলতা যে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণবিরহব্যাকুলতা হইতে কতশতগুণ অধিক, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

শ্রীগৌরাঙ্গের সেবার জন্য গোবিন্দদাসাদি ভক্তগণ ছিলেন। তাঁহার মহাবিরহে কৃষ্ণ-রস-গান ও কৃষ্ণকথা শুনাইয়া সান্ত্বনা দিবার জন্য স্বরূপ রামানন্দ ছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রিয়াজী এই মহামহা-বিরহে একবারেই একাকিনী। এই মহামরুতে তাঁহার দ্বিতীয় সঙ্গিনী নাই, এই ঘোর অন্ধকারে তাঁহার পথপ্রদর্শিকা সহচরীরও

অভাব। এমন কি তিনি মূর্চ্ছিতা হইলে, তাঁহাকে যে ধরিয়া তুলিবে এমন সঙ্গিনীও সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ মনের আবেগে ঘরের বাহির হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক আবেগ লইয়াও প্রিয়াজীকে বিনিদ্রভাবে একাকিনী নীরবে নীরবে নিদারুণ নিশার বিরহযাতনা সহ্য করিতে হইত।

প্রিয়াজীর বিরহচিত্র আঁকিবার তুলি নাই, সে কথা বলিবার ভাষা এখনও সৃষ্ট হয় নাই। প্রিয়াজী অনিদ্রভাবে যে কি ভীষণ যাতনায় রাত্রিযাপন করিতেন, মানুষের মনে সে ধারণা আসিবে না, মানুষের ভাষাতেও সে ভাব ফুটিবে না। সে কথা মনে করিতে গেলেও প্রাণ বিষাদে ডুবিয়া যায়, হৃদয় বিশীর্ণ ও বিদীর্ণ হইয়া পড়ে। সে মর্ম্মন্তুদ যাতনার বিন্দুমাত্রও আমাদের ধারণায় আসিবে না।

মা বিষ্ণুপ্রিয়ে—তুমি নিখিল পতিত-পাষণ্ডীর মাতৃস্বরূপিণী। এই যুগে তোমা হইতেই পতিত জীবগণ উদ্ধারলাভ করিবে,—যাঁহাদের নয়নকোণ হইতে, মা, তোমার বিরহ-যাতনা স্মরণ করিয়া একবিন্দুমাত্রও অশ্রুপাত হইবে, তাঁহারাই সেই পতিতপাবনী অশ্রুমন্দাকিনীর পবিত্রতম প্রক্ষেপে কৃতার্থ হইবেন, পরিত্রাণ পাইবেন এবং প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের যুগলচরণ লাভ করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের পর তাঁহার আলয় নীরব হইয়া পড়ে। রজনীতে এই নীরবতা অতীব ভীষণতর হইয়া উঠিত। মধ্যে মধ্যে প্রভুর গৃহরক্ষক দুই একটি প্রাচীন

ভৃত্যের কাশির শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত। শচীমাতার মর্ম্ম বিদারি হাহাকার রবও কখন কখন এই নৈশ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু প্রিয়াজীর অস্তিত্ব জানাই যাইত না। অথচ তিনি সারা যামিনী জাগিয়া জাগিয়া অতিবাহিত করিতেন। গৌর-বিরহে তাঁহার প্রাণ আনছান করিত, কিন্তু তাঁহার মুখে কোন শব্দ ফুটিত না, সারানিশি উঠ্‌বোস করিয়া কাটাইতেন, গৌরচিন্তা, গৌরধ্যান, ও গৌরনাম জপ করিতেন। তাঁহার ঝর ঝর লোচন জলে বালিশ ভিজিয়া যাইত। পদকর্ত্তার ভাষায় এই দশার বর্ণনা প্রকাশ করিতে হইলে নিম্নলিখিত চরণ-চতুষ্টয় উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

গৌরাঙ্গ গুণবতী সোই।
গণি গণি যামিনী রোই ॥
গলত গলত দিঠিধারা।
গিরত গীম মণিহারা ॥
গদ গদ ঝরে অবিরামা।
গাওয়ে গৌরাঙ্গ নামা ॥

শ্রীরাধার বিরহ-বিকলতার কথা বলিতে গিয়া কবি বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন:—

কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি
কৈছন বঞ্চব ইহদিন রজনী ॥
নয়নক নিন্দ গেও,—বয়ানক হাস,
সুখ গেও পিয়াসঙ্গে, দুখ হাম পাশ ॥

প্রিয়াজীরও নয়নের নিদ্রা, মুখের হাসি, এবং চিত্তের সুখ, শ্রীগৌরাঙ্গের পাছে পাছেই চলিয়া গিয়াছিল। প্রিয়াজী শূন্য মন্দিরে শূন্য জীবন লইয়া মরুভূমের মীনের মত সততই ছটফট করিয়া কাল কাটাইতেন। প্রভা লিখিয়াছেন :—

শূন্য মন্দিরে প্রিয়াজী আমার
স্মরিয়া গৌরাঙ্গ রায়।
জাগিয়া জাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কি দুখে নিশি পোহায়॥

ক্ষণে ক্ষণে করে কত বিলাপ,
ক্ষণে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণেক কাঁপ,
হাহাকার করি বলি গৌরহরি
অমনি ভূমে লুঠায়।

কখনো বা তাঁর না রহে জ্ঞান।
বলে "এসো গোরা আমার প্রাণ ;
কভু হাসে কভু দ্বারে মুখ ঘসে,
কভু অচেতন প্রায়॥

কভুবা প্রিয়াজী তুলিয়া হাত
বলে "কোথা মোর পরাণ-নাথ
থাকিতে জীবন, এস একবার
দাসী সুধু পদ চায়।

এস হে পরাণ-বঁধুয়া এস,
বারেক দাসীর পাশেতে বোস
সেবি ও চরণ, জুড়াব জীবন
এ মিনতি করি পায়॥

জনৈক প্রাচীন মহাজনের একটি পদের প্রতিধ্বনি করিয়া এখানে প্রিয়াজীর নিশি-বিরহের আর একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি:—

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাঁদবদন।
আঁখি তিরপিত হবে, জুড়াবে পরাণ॥
কালরাতি না পোহায়, কত জাগিব বসিয়া।
গুণ গুণি প্রাণকান্দে না যায় পাতিয়া॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারীজাতি।
দেহ গেহ যৌবন আন্‌বন্ধুজন।
গৌর বিনু শূন্য যেন এতিন ভুবন॥

পদকর্ত্তা শচী নন্দন দাস প্রিয়াজীর বিরহ-জাগরণ-যাতনার ভাব অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন:—

সখি বিছুরি সো পহুঁ লেহ দারুণ
দেহ রহে কিবা লাগিয়া
নিন্দ সে ভাগল বিরহে জরজর
রজনী দিন রহি জাগিয়া।

অন্যান্য মহাজনের পদ হইতেও এইরূপ বিরহ-জাগরণ-জনিত নিদারুণ দশার পদ সঙ্কলন করা যাইতে পারে। ভক্ত পাঠকগণের অবিদিত নয়, যে এই সকল বিরহ-পদ-গীতি ভক্তগণের সাধন-সম্বল। ভক্তহৃদয়েও এইরূপ শ্রীভগবদ্‌বিরহের লেশাভাস অনুভূত হইয়া থাকে। ভক্তগণ তাহাতে বিভাবিত হইয়াই বিরহ-রসময় পদ-গীতির আস্বাদন করেন।

বিরহে বিরহে প্রিয়াজীর লাবণ্যপূর্ণ সুঠাম ও সমুজ্জ্বল দেহ খানি কৃশা ও মলিনা হইয়া গিয়াছিল, কোন কোন পদকর্ত্তা তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহ-ত্যাগের

কৃশতা ও মলিনতা

পর হইতেই প্রিয়াজী কেবল সধবার লক্ষণ-সূচক বেশ ভিন্ন অন্যান্য সকল প্রকার বসন-ভূষণ ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মস্তকে তৈল দিতেন না, ইহাতে তাঁহার অমল ঘন কৃষ্ণ সুনীল সুদীর্ঘ কুন্তলগুচ্ছ একবারে রুক্ষ ও জটাপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অবস্থাও অতি শোচনীয় হইয়াছিল। তিনি আহার একরূপ ত্যাগ করিয়াছিলেন। নিদারুণ বিরহ-তাপে তাঁহার লাবণ্যমাখা কনককান্তি-বিনিন্দিত অঙ্গসৌন্দর্য্য একবারে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর স্নেহময়ী জননীর সংবাদ লইবার জন্য পণ্ডিত জগদানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া নবদ্বীপ-বাসীদের যে শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছিলেন, প্রাচীন কবি চন্দ্রশেখর তাঁহার বিবরণসূচক একটী সুন্দর ও সুললিত পদ

রচনা করেন। এই পদের মধ্যে অতি সংক্ষেপে একস্থানে প্রিয়াজীর অবস্থাও কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে যথা :—

প্রভুর রমণী সেহ অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন মলিন বসন,
সজল নয়ান ধারা।

এই সংক্ষেপ বাক্যেই সমস্ত অবস্থা বুঝা যাইতে পারে।

বিলাপ

গৌর-বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ যেমন গম্ভীর, তেমনই হৃদয়বিদারক। শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণবিরহ-বিলাপ প্রবল উচ্ছ্বাসময়। তিনি কুলধর্ম্ম ভাসাইয়া দিয়া কৃষ্ণান্বেষণ করিতেন। তিনি বলিতেন—

কি করিব, কোথা যাব, সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হলে কার মুখ চাব॥

* * *

নহেত পিয়ারে গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥

প্রিয়াজী কুলবধূ। যোগিনী হইয়া দেশ-ভ্রমণের কথা তাঁহার মনে আসিত না। ইহার উপরে প্রভুর আজ্ঞায় বৃদ্ধা শশ্রুমাতার সেবার ভার তাঁহার উপরে। তাঁহাকে ষোলআনা সংসার

করিতে হয়। অথচ যিনি তাঁহার সংসারের সারসর্ব্বস্ব,—জীবনের জীবন,—তিনি আর গৃহে নাই। একি ভীষণ যাতনা!

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গমন করেন, তখন তিনি সত্বরেই আসিবেন বলিয়া আশা দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়াজীর হৃদয়ে সে আশা বা সে সান্ত্বনা ছিল না। তাঁহার স্বামী গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সন্ন্যাসী, স্ত্রী-ত্যাগী। তাঁহার স্বামী তাঁহার মুখের দিকেও তাকাইতে পারিবেন না। এই অবস্থায় প্রিয়াজীর বিরহ-যাতনা শ্রীরাধার বিরহ-যাতনা অপেক্ষে যে অনেকগুণে অধিক, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

কবি বিদ্যাপতি শ্রীরাধার বিলাপ বর্ণনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

পরাণ পিয়া সখি হামারি পিয়া।
অবহুঁ না আওল, কুলিশ হিয়া॥
নখর খোয়ায়নু দিবস লিখি।
নয়ন আন্ধুয়া ভেল পিয়াপথ পেখি॥
হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করি জনম বহি গেলা॥
আওব কহি, মোর পিয়া চলি গেল।
পূরবক যতগুণ বিসরিত ভেল॥
মর্ম্মে মোর যত দুখ কহব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুঃখ নাহি জানে লোকে॥

কৃষ্ণ আবার ব্রজে আসিবেন, এই আশায় শ্রীরাধিকা দিন গণনা করিতেন, তাঁহার আসিবার আশায় পথপানে চাহিয়া থাকিতেন। তাই তিনি বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—"নয়ন আঁধুয়া ভেল পথপানে পেখি।" কিন্তু প্রিয়াজীর পশ্চাতেও অন্ধকার, সম্মুখেও অন্ধকার। তাঁহার বিরহ, অসীম অনন্ত ও চির অন্ধকার ময়। এ বিরহের অনন্ত আকাশে একটি আশার তারকাও জ্বলে না। তাই তিনি বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—

প্রিয়সখি কি বলিব মোর যত দুখ।
না হেরি সে পাদপদ্ম ফেটে যায় বুক॥
আসার আশায় প্রাণ রাখে বিরহিণী।
হৃদয় আঁধার মোর দিবস রজনী॥
আমার লাগিয়া প্রভু সন্ন্যাসী হইলা।
সভারে করিলা দয়া, আমারে বঞ্চিলা।
কোন্ আশে সখি বল রাখিব জীবন।
কোন্ মুখে অন্নজল করিব গ্রহণ॥
হায় হায়, এজনমে আর কি হেরিব।
প্রেমময় বন্ধুয়ারে আর কি পাইব॥
সে সোহাগ সে আদর সদা পড়ে মনে।
নীরবে কাঁদয়ে প্রাণ সে সব স্মরণে॥
কোথা প্রাণবন্ধু সখি, গৌরকিশোর।
সুঠাম কনককান্তি প্রাণেশ্বর মোর॥

কেমন রাখিব প্রাণ, হৃদয় ফাঁপর।
গৌর-বিরহে সদা দেহ জর জর॥
সে কথা কহিতে সখি পরাণ বিদরে।
অনন্ত যাতনা মোর বুকের ভিতরে॥
পাঁজর ধসিয়া যায়, কহিতে না জানি।"
প্রভা কহে ধৈর্য্যধর পাবে গৌরমণি॥

বিরহে প্রিয়াজী সততই ব্যাকুল থাকিতেন, কিন্তু সে ব্যাকুলতার মধ্যে চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহার অনন্ত যাতনাময় বিরহ ঘনীভূত হইয়া ভাবগম্ভীর হইয়াছিল। তাঁহার বিরহবিলাপে তরলতা ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন পদকর্ত্তারা তাঁহার বিরহবিলাপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভাবে ভিন্নতা থাকিলেও সকলগুলি পদই হৃদয়-বিদারক। "বারমাসিয়া" পদগুলি,—হৃদয়-বিদারি বিলাপের মর্ম্মোচ্ছ্বাস। একমাস চলিয়া যাইতেছে, অন্যমাস আসিতেছে, প্রতিমাসেই প্রিয়াজীর হৃদয়ে এক এক ভাবের স্মৃতি উদিত হইতেছে আর সেই ভাব ধরিয়া তিনি বিলাপ করিতেছেন। মাঘমাস স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"সখি, এই মাঘ মাসে প্রিয়তম গৌরসুন্দর আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া রজনীশেষে চলিয়া গেলেন, আর অমনি নদীয়া আঁধার হইল। এই নদীয়ায়, প্রভুর কীর্ত্তনে ঘরে ঘরে কত আনন্দ ছিল। আজ নদীয়াচাঁদ নদীয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর সে আনন্দ নাই, এখন এখানে কেবলই যাতনা। সখি সেই কনক-কেশ-দাম গৌরসুন্দরের কথা সততই মনে আসিতেছে, আর নীরবে

নীরবে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। সখি, সেই কুসুমশর কন্দর্পরূপ-বিনিন্দি গৌরসুন্দরের রূপ,—আমার নয়নসমক্ষে আসিয়া আসিয়া আমায় পাগলিনী করিয়া তুলিতেছে, তাঁহাকে না দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া পড়িতেছে, আমি যেন ফাঁপর হইতেছি। আমার হৃদয়ের যাতনা বলিতে পারিতেছি না। এখন উপায় কি, বল।

সখি, শ্রীগৌরসুন্দর যখন নদীয়ায় ছিলেন, তখন নদীয়ায় ফাল্গুন মাসে কি আনন্দ। ভক্তগণ সেই কনক অঙ্গে ফাগু দিতেন, আর ফাগু মাখা অঙ্গে আমার প্রাণবল্লভ যখন ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেন, মৃদঙ্গের ধ্বনিতে ও হরিনামে সমগ্র নদীয়া নাচিয়া উঠিত, তখন আমার হৃদয়ে যে কি আনন্দের বন্যা বহিয়া চলিত, তাহা মনে করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সজনি, এখন এই রসময় সময়ে গৌরকিশোরের সঙ্গসুখে বঞ্চিত হইয়াছি। কাননে কাননে সুগন্ধবসন্তকুসুম—কুসুমে কুসুমে ভ্রমরগুঞ্জন,—শাখায় শাখায় পিককুলের প্রাণোন্মাদক কুহুকুহু রোলে আমার পরাণ ব্যাকুল করিয়া তুলিলেছে, দাবদাহের ন্যায় গৌরবিরহ-দাহে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। মলয়ের মৃদুপবন আমার নিকটে আগুনের ন্যায় বোধ হইতেছে।

সখি, আবার মধুময় মধুমাসে মহীমণ্ডল নব শোভায় শোভিত হয়, নব পল্লবে বৃক্ষ বল্লরীর লাবণ্যমাধুর্য্য দৃষ্ট হয়, নব লতিকায় কুসুম শোভা ছাড়াইয়া পড়ে, মধুকরের মধুর গুঞ্জনে কানন ভূমি মুখরিত হয়। কিন্তু সখি, গৌর-বিহনে আমার নিকট এই মধুমাসও বিষের ন্যায় বোধ হয়।

সখি, বৈশাখে আমার হৃদয়বল্লভ এই নদীয়ায় প্রখর নিদাঘে চন্দন লেপনে সুশোভিত হইতেন, রজনীতে কত সুগন্ধি কুসুমে আমি তাঁহাকে সাজাইতাম, ফুলের শয্যা করিতাম, তাহাতে তাঁহাকে কত আদরে শোয়াইতাম, তিনি সেই সকল ফুল লইয়া মালা গাঁথিয়া কত আদরে আমার গলে পড়াইতেন, ফুল-সাজে আমাকে বনদেবীর ন্যায় সাজাইয়া কত আদর করিতেন ও আনন্দ পাইতেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে কুসুমগন্ধ হা'র মানিত। আমি ফুলের মালা ফেলিয়া তাঁহার সুশীতল চরণপদ্ম বুকে রাখিতাম। এখন এই আগুনের মত নিদারুণ দিনকর-কিরণে প্রাণবল্লভ আমার কৌপীন পড়িয়া কাঙ্গালের বেশে পথে পথে বেড়াইতেছেন, আর আমি গৃহমাঝে আরামে রহিয়াছি। হায়, সখি এ নিলাজ পরাণ এখনও এ দেহে রহিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠমাসে উদ্যানে উদ্যানে মধুরিম আম্র পনসাদি রসাল ফল পাকিয়া উঠে, কোকিল-কুল কাননে কাননে কুহু-কুহু রবে দশদিক মুখারিত করিয়া তোলে, মধুকর নিকর কুসুমে কুসুমে মধুপান করে, আর উহা দেখিয়া তৃষিত ভাবে শ্রীগৌর-মুখ-পঙ্কজের কথা আমার মনে হয়। আমার মনে সাধ হয়, আবার এ দগ্ধ নয়ন কবে সেই গৌরমুখ-কমলের মধুপান করিয়া আনন্দে বিভোর হইবে।

আষাঢ়ে দিন-যামিনী ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন হয়, নবজলধরে বিজলির ঝলক দেখিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের কথা মনে পড়ে। হায় সখি, আমার সেই শারদ-সুধাকর গৌরাঙ্গসুন্দর এখন কোথায়?

তাঁহার বিরহে আমার অন্তর জরজর হইতেছে, পাঁজর ধসিয়া যাইতেছে, আমার চিত্ত নিদারুণ দুখ-জলধিতে ডুবিয়া গিয়াছে, তাঁহার দর্শন ভিন্ন আর কিছুতেই আমার এ ক্লেশের শান্তি নাই।

শ্রাবণের মেঘে দিন যামিনী যখন আঁধারে আচ্ছন্ন হয়, ময়ূরের ও মত্তদাদুরির অবিরাম রোলে আমার প্রাণ তখন অধীর হইয়া উঠে। মনে হয় আমি ঘরে রহিয়াছি, আর আমার কনককান্তি প্রাণেশ্বর বুঝি এই শ্রাবণের ধারায় পথে পথে ভিজিতেছেন,—এই ভাবিয়া আমি কিছুতেই নয়নের জল সংবরণ করিতে পারি না।

ভাদ্রের খরতর রৌদ্রে আমার প্রাণ-গৌর কি ভাবে কোথায় ভ্রমণ করিতেছেন, কে তাঁহার সেবা করিতেছে, আমার মনে সততই এই চিন্তার উদয় হয়, আর তখন গৃহবাস আমার নিকট বিষের স্থায় হইয়া উঠে।

আশ্বিনে ঘরে ঘরে অম্বিকা-পূজার আনন্দ। কুসুম-কানন স্থল-পদ্মে, এবং সরোবর সুবিকশিত পঙ্কজে সুশোভিত হয়,—নীলাকাশে সমুজ্জ্বল শরৎ সুধাকরের উদয় হয়—এ সকল দেখিয়া আমার কেবল সেই গোরাশশী ও গোরামুখ-পঙ্কজই মনে পড়ে। আমার ঘুমহীন নয়নে অনবরতই অশ্রুজল; প্রিয়তম গৌর বিরহে দিন যামিনী নিদ্রা নাই। সখি প্রাণ-গৌর ভিন্ন এ দুঃখ আর কিছুতেই যাইবার নয়।

কার্ত্তিক মাসে নরনারীগণ কত পুণ্য কার্য্য করে, কত ধ্যান করে, জপ যজ্ঞ করে। সখি! আমি গৌরচরণ ভিন্ন আর কিছুই জানি না। সজনি আমার প্রাণ-বল্লভের দেখা পাইলে আমি সকল ধর্ম্মত্যাগ

করিয়া কেবল তাহাও প্রেম মধুপান করিব আমি জাগিয়া জাগিয়া এই সুখ স্বপ্নে বিভোর হই। সখি, আমার কি দুরাশা ও দুর্দ্দশা।

অগ্রহায়ণে শীতের আরম্ভ হয়, আর পৌষে দারুণ শিশির পড়ে, শীতের বৃদ্ধি হয়। আমি ভাবি, আমি ঘরের মাঝে শীতের কাপড়ে দেহ আবরিয়া রহিয়াছি, কিন্তু আমার প্রাণের প্রাণ গৌরকিশোরের কৌপীন মাত্র সম্বল, তাঁহার দেহ ঢাকা দেওয়ার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। এই নিদারুণ শীতে কোন্ নদীর তীরে, বা কোন্ পথের ধারে আমার প্রাণবল্লভ শিশিরে, শীত ও বাতে না জানি কত যাতনা পাইতেছেন, আর আমি কোন্ প্রাণে ঘরে রহিয়াছি। হায় হায়, আমার প্রাণ কি কঠিন, আমার প্রাণবল্লভের এত যাতনার কথা ভাবিয়া এখনও উহা এ দেহে রহিয়াছে। সখি, এই যাতনা লইয়া আর কত কাল যাপন করিব?

আমি কি অভাগিনী, এমন দুর্ল্লভ-রত্ন পাইয়া আঁচলে বাঁধিতে না বাঁধিতেই চিরদিনের তরে অগাধ জলে হারাইলাম। বিধাতা এ অভাগিনীর নয়ন-সমক্ষে এমন শারদ সুধাকর গৌরমূর্ত্তি দেখাইয়াই অমনি কাড়িয়া লইলেন! হায় হায়, আমি কি করি, কোথায় যাই— সখি, আমায় ধর, একি হলো, আমি কোথায়?'

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে প্রিয়াজী কখন কখন উন্মাদিনীর ন্যায় অধীর হইতেন, আবার আত্ম-সংযমে নিজেই নিজের চিত্তকে বশে রাখিতেন। বিরহের আতিশয্যে অনেক সময়েই তাঁহার মোহ হইত। মোহ অবস্থাতে তিনি একবারে গৌর-ধ্যানে বিভোর থাকিতেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গদর্শন লাভ করিতেন।

শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র শেঠের রচিত এই ভাবসূচক একটি পদ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

গভীর নিশায় চাঁদ আকাশের গায়।
উদাসীর মত একা ধীরে চলে যায়॥
নাহি কোথা সাড়াশব্দ, সমস্ত নদীয়া স্তব্ধ,
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সুধু আছেন জাগিয়া।
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, ঘুম নাহি দু-নয়নে,
ঝরিছে হৃদয়-ধারা নয়ন গলিয়া॥
হিয়া করে আন্‌ছান নিয়ত বিদরে প্রাণ,
কপাট খুলিয়া দেবী এলেন বাহিরে।
শোকাকুলা মা'র লাগি নীরবে থাকয়ে জাগি
ফুকারিয়া ক্ষণতরে কাঁদিতে না পারে॥
চাহিয়া আকাশ পানে ঝর্‌ঝর্ দু-নয়নে
নেহারিলা অনিমিযে অনন্ত আকাশে।
হইয়া মূর্চ্ছিত-প্রায় পড়িলা ভূমিতে হায়
বজ্রাহত স্বর্ণলতা ভাবের আবেশে॥
"হা নাথ হা নাথ" বলি থেমে গেল শেষ বুলি,
ছুটিল অনন্তপানে সে ধ্বনি-ঝঙ্কার।
ব্যাকুল উন্মাদ-প্রায় আসিয়া শ্রীগোরারায়
বলে-প্রিয়ে এই দেখ আমি গো তোমার॥"
শ্রীপ্রভু-কোমল করে ধরি প্রিয়াজীর করে
তুলিলা সোহাগভরে মেলিলা নয়ন।

বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া নেহারিলা চমকিয়া
বলিলেন "প্রাণনাথ সত্য কি স্বপন॥"
সযতনে করে ধরি প্রিয়াজীর কর।
প্রবেশিলা গৃহ মাঝে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥

প্রিয়াজী কখন কখন স্বপ্নেও শ্রীগৌর-দর্শনানন্দ প্রাপ্ত হইতেন। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটী মহাজনী প্রাচীন পদ প্রদত্ত হইল :—

লোচন ঝরঝর আনন্দ-লোর।
স্বপনহি পেখনু গৌর-কিশোর॥
চিরদিন আওল নবদ্বীপ মাঝ।
বিহরয়ে আনন্দ ভকত-সমাজ॥
কি কহব রে সখি রজনীক সুখ।
চিরদিন হেরনু গোরা-চাঁদ-মুখ॥
বিরহে আকুল যত নদীয়ার লোক।
গোরামুখ হেরি দূরে গেল সব শোক॥
পুন না দেখিয়া হিয়া বিদরিয়া যায়।
নরহরিদাস কান্দি ধূলায় লুটায়॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহভাব অপার ও অনন্ত। উহা ধারণার অতীত। কিন্তু তথাপি গৌরভক্তগণ এই নিদারুণ কারুণ্যরসের আশ্রয় লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীচরণ-শরণই শ্রীগৌরসাধনার প্রধানতম অবলম্বন। বিরহিণী প্রিয়াজীর বিরহভাবের লেশাভাস হৃদয়ে প্রতিফলিত হইলে হৃদয় নির্ম্মল হয়, এবং শ্রীগৌর-চরণে অনুরাগ জন্মে।

———

নিত্য মিলন।

নিদাঘের নিদারুণতাপে জগৎ যখন অতিমাত্রায় প্রতপ্ত হয়, এবং সে তাপ যখন একবারে অসহনীয় হইয়া উঠে, তখন বর্ষার অবিরল ধারাপাতে বসুন্ধরা পরিষিক্ত ও সুশীতল হয়, ইহা বহির্জ্জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। অন্তর্জ্জগতেও এইরূপ নিয়ম আছে। প্রণয়িপ্রণয়িনীর হৃদয় যখন নিদারুণ বিরহের নিরতিশয় তাপে বিদগ্ধ হইয়া উঠে, তখন বিধাতার বিধানে মিলনের ব্যবস্থা হয়। অত্যন্ত বিরহের চরম পরিণাম—মধুর মিলন।

অচিন্ত্যতর্কৈশ্বর্য্যময়ী শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার লীলা,—ভাগবতী লীলা। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে নিয়মের ব্যভিচার নাই। এই যে প্রিয়াজী মহাবিরহের মহানলে সুদীর্ঘকাল তাপ-যাতনা ভোগ করিলেন, অবশেষে চির মহামধুর মিলনেই এই মহাবিরহের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। কিরূপে এই মিলন ঘটিল, সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াই এই গ্রন্থের উপসংহার করা হইবে। পাঠকমহোদয়গণের মনে আছে, শ্রীগৌরসুন্দরকে নীলাচলের পথে রাখিয়া আমরা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শচীমাতা ও প্রিয়াজীর বিরহ-কথা লইয়া বিব্রত হই।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর ফাল্গুনের প্রথমেই নীলাচলে উপনীত হয়েন এবং নীলাচল-চন্দ্র-দর্শনে পরমানন্দ লাভ করেন। এই সময়ে তিনি জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক-পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্‌বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে

স্বকীয় অনন্ত বিদ্যাপ্রভাব এবং অমিত ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইয়া স্বীয় শ্রীচরণের একান্ত দাসরূপে পরিণত করেন। তিনি তাঁহাকে ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করান। সার্ব্বভৌম শ্রীগৌর-দেহে রাম, কৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হয়েন। এখনও পুরীধামে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সার্ব্বভৌম সকল ছাড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে ঃ—

সার্ব্বভৌম হয় প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু* বিনে সেব্য নাহি জানি আন॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শচী-সুত গৌর ধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম॥

অতঃপরে শ্রীগৌরাঙ্গ বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ দেশস্থ তীর্থসমূহ দর্শনার্থ গমন করেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে ঃ—

এই মতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণে গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥
মাঘ শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাল্গুনের শেষে দোল যাত্রা সে দেখিল।
প্রেমা বেশে তাহা বহু নৃত্য গীত কৈল॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ-প্রথমে দক্ষিণে যাইতে হইল্ল মন॥

শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণদেশে গমন, বহুল ঘটনাপূর্ণ। এই উপলক্ষে

তিনি সমগ্র দক্ষিণ দেশে বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির বীজ বপন করিয়া আসিয়াছিলেন। অনেক নাস্তিক পাষণ্ডীকেও কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত করিয়াছিলেন। পূর্ণ দুই বৎসর কাল শ্রীগৌরাঙ্গ দক্ষিণ তীর্থ ভ্রমণ করেন। এই দুই বৎসরে দয়াময় জীবের যে অনির্ব্বচনীয় হিতসাধন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা অপর গ্রন্থের বিষয়। সুতরাং এখানে উহার সবিশেষ কোনও উল্লেখ করিব না। তবে মোটামোটি কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কূর্ম্ম-ক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠবিমোচন, গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সহিত সম্মিলন, এবং তাঁহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া সাধ্যসাধন-তথ্যের চরম তত্ত্ব-প্রকটন করেন, তথা হইতে পথিমধ্যে অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বৃদ্ধকাশীতীর্থে উপনীত হয়েন। এই অঞ্চলে তিনি জীবের প্রতি যে কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে উহার নিম্নলিখিত বিবৃতি আছে:—

তাহা হইতে চলি আগে গেলা একগ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজে তাহা করিলা বিশ্রাম॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইসে দর্শনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে না মিলে গণনে॥
গোসাঞীর সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সর্ব্বদেশ॥
তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম॥

নিজ নিজ শাস্ত্রে সবে উদ্‌গ্রাহে প্রচণ্ড।
সর্ব্বপ্রেম মূর্ত্তি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে॥
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এই মতে বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণ দেশ॥
পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা।
গর্ব্বকরি আইলা সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে।
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু, গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥
তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমেতে।
তর্কেই খণ্ডিলা প্রভু, না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবায় পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পড়িল লজ্জায়॥

এই স্থলে বিচারে পরাজিত হইয়া এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা দেখিয়া বৌদ্ধগণ শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন শিব-কাশীতে উপনীত হয়েন, তখন তাঁহার প্রভাবে শৈবগণও বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর চাতুর্ম্মাস্যায় শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্টের আলয়ে অবস্থান করেন। এখানেও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ-দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন॥
সৌন্দর্য্য প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইলা সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
সবে কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুরে দেখিতে॥

এই স্থান শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্‌বেঙ্কট ভট্টের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে ব্রজরস-উপাসনার সার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দক্ষিণে সেতুবন্ধ কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য বহুতীর্থ স্থান দর্শন করেন। অতঃপর তিনি উড়ুপীতে আসিয়া মধ্বাচার্য্য স্থাপিত নটবর গোপাল মুর্ত্তি দর্শন করেন এবং তত্ত্ববাদীদের মত খণ্ডন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে স্বীয়মত প্রতিষ্ঠিত করেন।

অতঃপরে অন্যান্য তীর্থদর্শনান্তে শ্রীগৌর-সুন্দর পাণ্ডুপুরে উপনীত হয়েন। তাঁহার অগ্রজ শ্রীমদ্‌বিশ্বরূপ এই পাণ্ডুপুরে আসিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানের লোকদের নিকট তিনি শঙ্করারণ্য নামে খ্যাত ছিলেন। শ্রীরঙ্গপুরীর মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ এই স্থানে এই শোক সংবাদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার সেই

স্নেহময় অগ্রজের কথা মনে হওয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে এখানে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, পশ্চিম উপকূলের বহুতীর্থস্থান-দর্শনান্তে আবার গোদাবরী-তটে শ্রীরাম রায়কে দর্শন দিয়া এবং তাঁহাকে পুরীধামে আসিতে আদেশ করিয়া অনতিবিলম্বে আবার তিনি পুরীধামে প্রত্যাগত হইলেন। সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণ আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন।

এই সময়ে পুরীর অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ বীর-কেশরী প্রতাপ রুদ্র দেব, শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত্ব ও অনন্ত প্রভাবের কথা শুনিয়া তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং গৌরচন্দ্র যে স্বয়ং ভগবান্, সার্ব্বভৌমের সহিত আলাপে উহা তিনি সুস্পষ্ট বুঝিতে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করেন। প্রতাপ রুদ্রের পরামর্শে কাশীমিশ্রের বিপুল ভবন, মহাপ্রভুর বাসস্থানরূপে নির্ণীত হয়। কাশীমিশ্রকে মহাপ্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া ছিলেন। এই ভবনেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গম্ভীরা-মন্দির এখনও বিরাজমান।

এই বৃহৎ ভবনস্থ গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, পুরীতে প্রকট-লীলার সময়ে নিরন্তর অবস্থান করিতেন। লক্ষ লক্ষ ভক্ত এখানে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে কৃতার্থ হইতেন। এই স্থান গৃহী, উদাসী, ব্রহ্মচারী, যতি, সন্ন্যাসী ও অগণ্য ভক্ত তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রভুর ও তাঁহার ভক্তগণের চরণ-রজে এই স্থান চিরদিনই পরম পবিত্র তীর্থ ও মাধুর্য্যের পরম ধামরূপে বিরাজ করিবেন। গোবিন্দ দাস, স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ

প্রভৃতি কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্ত এই স্থানে প্রভুর নিত্য সহচর ছিলেন। প্রতি বৎসর শ্রীমন্নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য ও শিবানন্দ সেন প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় ভক্তগণ রথযাত্রার সময়ে পুরীধামে যাইয়া এই স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিতেন।

দক্ষিণ তীর্থ হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের অনুরোধে আজকাল করিয়া দুই বর্ষ চলিয়া গেল। দুই বর্ষের মধ্যে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন গমন ঘটিল না, যথা—

আর দুই বর্ষ চাহে বৃন্দাবনে যেতে।
রামানন্দের হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥

এইরূপে গৃহত্যাগের পর পঞ্চম বর্ষে মহাপ্রভু পুনর্ব্বার জননী-দর্শন ও বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া সার্ব্বভৌম ও রামরায়কে বলিলেন :—

বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমা সবার হঠে দুই বর্ষ না কৈল গমন॥
অবশ্য চলিব,— দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দুঁহা বিনে মোর অন্য নাহি গতি॥
গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী, জাহ্নবী,—এই দুই দয়াময়॥
গৌরদেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইঞা॥

সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ দেখিলেন, প্রভু এবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সুতরাং এবার আর তাঁহারা বাধা দিলেন না। সকলের অনুমতি-অনুসারে বিজয়াদশমীর দিন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া জন্মভূমির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামানন্দ ভদ্রক পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

উড়িষ্যা-রাজ্যের সীমা ছাড়িয়া প্রভু গৌড়ের সীমায় আসিলেন। তখন দুর্দ্দান্ত মুসলমান, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা। প্রভু যখন যেখানে গমন করেন, সেইখানেই লক্ষ লক্ষ লোক হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার পদানুসরণ করে। মুসলমানদের তাহা সহ্য হইবে কি না—ভক্তগণের মনে এই আশঙ্কা হইল। কিন্তু অন্তর্য্যামী প্রভু, সীমান্তের মণ্ডপ যবনশাসনকর্ত্তার চিত্ত তাঁহার স্বীয় চরণান্তিকে আকৃষ্ট করিলেন। স্থানীয় মুসলমানশাসন-কর্ত্তা শ্রীগৌরচরণে শরণ লইয়া তাঁহার গমনের সহায় হইলেন। তিনি বহু নৌকা করিয়া সৈন্যাদি সঙ্গে দিলেন। মহাপ্রভু পাণিহাটির ঘাটে আসিয়া অবতরণ করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। রাঘবপণ্ডিত বিপুল জনতার ভিতর দিয়া প্রভুকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। শ্রীচরিতামৃতে মহাপ্রভুর প্রত্যাগমনের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে :—

প্রভু আইলা করি লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল॥

গৌরচন্দ্র একদিন মাত্র পাণিহাটিতে ছিলেন, পরদিন তথা হইতে কুমারহট্টে,—তৎপরে শিবানন্দের আলয়ে,—তথা হইতে বাসুদেবের ভবনে দর্শন দিয়া সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহ পবিত্র করি-

লেন। চারিদিক হইতে অগণ্য লোক আসিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল। সমগ্র স্থল লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্রভু লোক-ভীর-ভয়ে কুলিয়ার মাধবদাসের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানেও সেই বিশাল জনতা। লোকের শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনতৃষ্ণা কিছুতে মিটিল না। লক্ষ লক্ষ লোকের দর্শন-স্পৃহা-শান্তির জন্য তিনি সাত দিন কুলিয়ায় মাধবদাসের গৃহে ছিলেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

মাধবদাস-গৃহে তাহা শচীর নন্দন।
লক্ষ কোটি লোক তাহা পাইল দর্শন॥
সাত দিন রহি তাহা লোক নিস্তারিলা।
শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে ঐছে গেলা॥
দিন দুই চারি প্রভু তাঁহাই রহিলা।
শচীমাতা আনি তার দুঃখ খণ্ডাইলা॥

পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যে শান্তিপুর হইতে শচীমাতা তাঁহার অঞ্চলের ধনকে সন্ন্যাসের অতলসাগরে ভাসাইয়া দিয়া শূন্যহাতে, শূন্যহৃদয়ে শূন্য নদীয়ায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, আজ পাঁচবৎসরের পরে আবার সেই শান্তিপুরে শচীমাতা প্রতিপদের চাঁদের মত তাঁহার হারাধন গোরাচাঁদকে দেখিতে পাইলেন। মাতা ও পুত্রের এই চকিতমিলন,—আনন্দ কি যাতনা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। খুব সম্ভবতঃ এই অবস্থায় শ্রীগৌরদর্শন তাঁহার নিকট স্বপ্নের ন্যায়ই মনে হইয়াছিল।

অতঃপর শান্তিপুরের ঘাট পার হইয়া গঙ্গার পশ্চিমপার দিয়া

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর বৃন্দাবনের অভিমুখে গমনোদ্দেশে উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। তখন নবদ্বীপে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। নরনারী অনেকেই গঙ্গা পার হইয়া বহুদিন পরে চকিতের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ার অপর পারে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম-ভবনের ঘাটের সোজাসোজি আসিয়া সহসা দাঁড়াইলেন, দুই কর জোড় করিয়া সতৃষ্ণনেত্রে জন্মভূমি নমস্কার করিলেন, অতি অল্পক্ষণই এই স্থানে দাঁড়াইয়া আবার গম্যপথে গমন করিতে লাগিলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীও গঙ্গাঘাটে দাঁড়াইয়া অসংখ্য লোক মণ্ডলীর অগ্রগামী স্বীয় প্রাণবল্লভের সমুন্নত, কনকগৌর, মণ্ডিতমস্তক সুঠাম সুদীর্ঘবাহু দিব্যমূর্ত্তি বিজলির ন্যায় সতৃষ্ণনয়নে দর্শন করিয়াছিলেন। যতদূর দেখিতে পাইলেন, ততদূর তিনি সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, যখন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তখন নিরাশপ্রাণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অবশ ভাবে গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের তাপ শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রথমতঃ তাঁহার প্রাণ বল্লভের সন্ন্যাস মূর্ত্তি দর্শন, তাঁহার নিকট একবারেই অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। দ্বিতীয়তঃ বিজরি-চমকের ন্যায় এইরূপ দর্শনে বিরহ-জনিত যাতনা আরও অধিকতরই অনুভূত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া সখীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কবিবর বিদ্যাপতির ভাষায় বলিলে বলিতে হয়:—

সখি, ভাল করি পেখন না ভেল।
লোক-মেঘমালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥

প্রভুর এই সন্ন্যাসমূর্ত্তি-সন্দর্শনের পরে প্রিয়াজী বিরহে আরও অধিকতর যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর আর কোনও লক্ষ্য না করিয়া একবার রামকেলি গ্রামে উপনীত হইলেন। রামকেলি গঙ্গা-তটে অবস্থিত। তিনি চারি দিন এখানে ছিলেন। এই সময়ে এখানে এমন কীর্ত্তনানন্দ-তরঙ্গ উঠিয়াছিল, যে যবনগণও সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। এমন কি যবন-শাসন-কর্ত্তা পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের নামে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌররায়।
যবনেও বলে হরি অন্যের কি দায়॥
যবনেও দূরে আসি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার॥

এই সময়ে হুসেন সাহ বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। রামকেলি গ্রামে জনৈক নবীন সন্ন্যাসীর আগমনে কীর্ত্তন ও হরি নামের প্রবল বন্যা-তরঙ্গ উঠিয়াছে, ইহা জানিয়া হুসেন সাহ প্রথমতঃ কোতোয়ালকে অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করেন। কোতোয়াল বিপুল জনতাবেষ্টিত সন্ন্যাসীর অলৌকিক দিব্যরূপ, দিব্যভাব ও ভগবত্তা যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, অবিকল সেই সকল কথা হুসেন

সাহকে জানাইল। হুসেন সাহ বিস্মিত হইয়া কেশব ছত্রীকে পাঠাইলেন। সন্ন্যাসীর প্রভাব-প্রতিপত্তি শুনিয়া .পাছে বা হুসেন সাহের মনে বিপরীত ভাব জন্মে, এই আশঙ্কা করিয়া কেশব ছত্রী আসিয়া বলিলেন,—জাহাপনা, বিশেষ কিছুই নয়, যে লোকটির কথা বলিতেছেন,—সে দেশান্তরী গরীব, বৃক্ষতলবাসী, ভিখারী সন্ন্যাসী।”

ইহার উত্তরে গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহ যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তাহা এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

রাজা বলে বলে “গরীব না বোল কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলেও কাণে॥
হিন্দু যারে বলে “কৃষ্ণ” “খোদায়” যবনে।
সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে ॥
আপনার রাজ্যেসে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁর আজ্ঞা সর্ব্বদেশে শিরে করি বহে॥
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে॥
তাঁহারে সকল দেশে কায়বাক্য মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে॥
ছয়মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক লোক সকলে॥
আপনার খাই লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে; তাও কেহ নাহি পায় ভালমতে॥

অতএব তিঁহ সত্য জানিহ ঈশ্বর।
গরীব করিয়া তারে না বোল উত্তর॥
যেথানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেথানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥
সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
কি বিরলে থাকুন, যে লয় তার মন॥
কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জন।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবন॥"

হুসেন সাহার এই কথার উপরে মন্তব্য করিয়া শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন :—

যে হুসেন সাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপি এবে না মানয়ে যত অন্ধ॥

যাহা হউক, প্রভু যখন রামকেলি গ্রামে দিনযামিনী কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত ছিলেন, তখন হুসেনসাহার প্রধান মন্ত্রী সনাতন ও অপর কর্ম্মচারী তদীয় ভ্রাতা শ্রীরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণদর্শন ও সঙ্গ-সুখ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাদিগকে কৃপা করাই যে তাঁহার রামকেলি গ্রামে আগমনের উদ্দেশ্য, প্রভু তাহা স্পষ্টতঃই ইহাদিগকে বলিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতা দ্বারাই প্রভু অশেষ বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করেন। সুবিখ্যাত শ্রীজীবগোস্বামী

ইঁহাদেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র। এই দুই ভ্রাতা শ্রীগৌরচরণ-দর্শনাবধিই গৃহবাসে বিরক্ত হয়েন এবং অবশেষে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁহারই আদেশে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করেন। যাহা হউক, শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবৃন্দাবনদর্শন-উদ্দেশে রামকেলি হইতে বৃন্দাবনের পথ ধরিয়া কানাইর নাটশালা গ্রামে যাওয়ার পূর্ব্বে সনাতন, মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া বলিলেন ঃ—

ইঁহা হইতে চল প্রভু ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌররাজ॥
তথাপি যবনজাতি না করি প্রতিত।
তীর্থসংঘট্টে এত লোক ভাল নহে রীত॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবনে যাওয়ার এ নহে পরিপাটি॥

মহাপ্রভু কানাইর নাটশালায় কৃষ্ণ-চরিত-লীলা-মূর্ত্তি প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া সনাতনের কথা স্মরণ করিয়া আবার নীলাচলাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শান্তিপুরে আসিয়া আবার পাঁচসাত দিন শ্রীল অদ্বৈতগৃহে ছিলেন। এই সময়ে শ্রীমৎদাস রঘুনাথ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন। প্রভুর আজ্ঞায় কিয়দ্দিন বাড়ীতে থাকিয়া অতুল-বৈভববিলাস ত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি রঘুনাথ নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আবার যথাসময়ে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন।

কিয়দ্দিন নীলাচলে অবস্থান করিয়া তিনি কটকের নিম্নে মহানদী পার হইয়া পুনর্ব্বার ঝারিখণ্ডের জঙ্গলময় পথে শ্রীবৃন্দাবন গমন-কামনায় যাত্রা করেন এবং যথাসময়ে কাশীধামে উপনীত হয়েন। এখানে ষাটহাজার মায়াবাদী সন্ন্যাসীর গুরু, নিখিলশাস্ত্রবেত্তা, কাশীধামের অদ্বিতীয় সন্ন্যাসী,—পণ্ডিত প্রকাশানন্দ যদিও প্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে শ্রীগৌরাঙ্গের অমানুষী বিদ্যা ও ভগবত্ত্বার অনন্ত প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র উপাস্যদেবতা স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-চিন্তনই সর্ব্বসাধনার সার বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ইঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থখানি ভক্তগণের কণ্ঠহার। কাশী হইতে শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমমত্তাবস্থায় মথুরা অভিমুখে ধাবিত হইলেন, মথুরায় পদার্পণ করিয়া ব্রজমণ্ডলের তীর্থসমূহ প্রেমাবিষ্টভাবে দর্শন করিলেন, এবং যে সকল তীর্থ বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল বিলুপ্তভীর্থ উদ্ধার করিয়া আবার নীলাচল অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় হইতে মহাপ্রভু, অপ্রকট সময় পর্য্যন্ত এক-ক্রমে আঠার বৎসর নীলাচলেই অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীজগন্নাথ-দর্শন, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-চিন্তন, বহিরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে রসাস্বাদন এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণ-প্রেম-বিবশতায় দিনযামিনী যাপন করিতেন।

শেষ দ্বাদশবৎসর গম্ভীরামন্দির হইতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিতেন না। শ্রীরায় রামানন্দ তাঁহার নিকটে বসিয়া কৃষ্ণকথা কহিতেন আর শ্রীপাদ স্বরূপ, রসগানে তাঁহার

কৃষ্ণ-বিরহ-যাতনায় সান্ত্বনা দিতেন। শেষ দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণবিরহের বিবিধ দশায় বিভোর হইয়া তিনি দিব্যোন্মাদে কখন বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন, কখন বা প্রগাঢ় আনন্দ-সমাধিতে মগ্ন হইয়া কৃষ্ণলীলা সন্দর্শন করিতেন। এই সময়ে তিনি বাহ্যদশায় বিরহ-বেদনা-সূচক উদ্বেগ চিন্তা, জাগরণ ও প্রলাপাদিতে অধীর থাকিতেন, অর্দ্ধবাহ্যদশায় বাহ্যজ্ঞান আংশিক বিলুপ্ত হইত ; অন্তর্দ্দশায় একবারেই কৃষ্ণলীলায় বিভোর থাকিতেন। তাঁহার এই সকল ভাব গ্রন্থান্তরে* কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে বাহুল্যভয়ে আর পুনর্ব্বার এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দ্বাদশবর্ষকাল ব্যাপিয়া শ্রীগম্ভীরামন্দিরে যে লীলারসাস্বাদন করেন, প্রিয়াজী সারা জীবন ব্যাপিয়া শ্রীগৌরাঙ্গবিরহে সেই বিরহ-রসের বিবিধ দশায় ব্যাকুল ছিলেন।

শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলাই মানুষের হিতের জন্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে জন্য অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে জন্য প্রিয়াজী, বিরহের নিদারুণ অবস্থায় দিনযামিনী কেবল "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া ব্যাকুল থাকিতেন, সেই সকল লীলার উদ্দেশ্য,—মানুষের কঠোর হৃদয় কারুণ্যরসে কোমল

---

* মৎকৃত "গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" নামক গ্রন্থে এই লীলার বিস্তৃতি আছে। শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীমৎ দাসগোস্বামীর চরিত ও শিক্ষা পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এই সকল প্রধান প্রধান পার্ষদগণের শিক্ষা ও চরিত এ গ্রন্থে পুনর্ব্বার বিবৃত করা অনাবশ্যক*।

করা এবং সেই কোমলহৃদয়ে প্রেমভক্তির বীজ বপন করা। প্রভুর সে উদ্দেশ্য যখন নিঃশেষিত ভাবে সুসম্পন্ন হইল, তখন আর তাঁহার লীলা-প্রাকাট্যের প্রয়োজন রহিল না।

এদিকে প্রিয়াজীর বিরহ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিল। সেই ঘনীভূত বিরহের একশ্রেষ্ঠ অংশ দূতীর মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। ভাব-মূর্ত্তি দূতী শ্রীগৌরাঙ্গসমীপে উপনীতা হইয়া বলিলেন:—

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, তুয়াগুণ সোঙরিয়া, মুরছি পড়য়ে ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ, ঘেরি করে রোদন, তুল ধরি নাসার উপরে॥
তুয়া বিরহানলে, অন্তর জরজর, দেহছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়াবাসী যত, তারা ভেল মূরছিত, না দেখিয়া তুঞা মুখখানি॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা, দেহ তার প্রাণ ছাড়া, তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গিগণ, কেমনে ধরিবে প্রাণ, কেমনে ছাড়িয়া তার মায়া॥
যত সহচর তোর, সবাই বিরহে ভোর, শ্বাস বহে দরশন আশে।
ওগো ও রসিকবর, চলহে নদীয়াপুর, কহে দীন এ মাধব ঘোষে॥

দূতী অধিকতর ব্যস্ত হইয়া আবার বলিতেছেন:—

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার পূরব যত চরিত পীরিত।
সোঙরি সোঙরি এবে হৈল মূরছিত॥
হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া।
ধূলায় পাড়িয়া কাঁদে তোমা না দেখিয়া॥

কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্ব ; আগে আমি যাই মরি॥

শ্রীগৌরসুন্দরের কোমলপ্রাণ, দূতীর কথায় সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"দূতি, পতিতজীবের কল্যাণ-সাধনের জন্য আমি আমার প্রিয়তমা মহাশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে নিদারুণ বিরহ-যাতনায় কত ক্লেশ দিয়াছি। আমি ত্রেতায় শ্রীরামরূপে প্রণয়িনী পতিব্রতা সীতাদেবীকে এইরূপ ক্লেশ দিয়াছিলাম, দ্বাপরে শ্রীরাধিকাকেও বিরহক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, বুদ্ধাবতারে শ্রীমতী গোপাও ক্লেশ পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার যাতনা সর্ব্বোপরি। তোমায় প্রকৃত কথা বলিতে কি, আমার শক্তি সমূহের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও সর্ব্বশক্তির মূলাধার। দূতি, তুমি যাও, তাঁহাকে বলিও অচিরেই তাঁহার সহিত আমার নিত্য মিলন হইবে। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমিই কি সুখে আছি? আমার শ্রীরাধাপ্রেমাস্বাদের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, মানুষের ভজনপথও দেখাইয়াছি, সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যও শেষ হইয়াছে। এখন সুখময় মিলনের দিন আসিয়াছে, আর বিলম্ব নাই। তুমি সত্বরে যাইয়া প্রিয়াকে এই সংবাদ দাও।"

দূতী তৎক্ষণাৎ প্রিয়াজীর নিকটে গিয়া শুভ সংবাদ দিলেন। প্রিয়াজীর মৃতদেহে যেন মহাপ্রাণ সঞ্চারিত হইল, তাঁহার নয়ন-যুগল আনন্দজলে পরিপ্লুত হইল। শচীমা প্রথমতঃ একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, এ সংবাদ তাঁহার নিকট একবারে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, তথাপি তাঁহার অবশদেহ যেন একটুকু

সবশ হইল। নদীয়ার সর্ব্বত্র শুভ সংবাদ প্রচারিত হইল, যে নদীয়ার চাঁদ আবার রসরাজবেশে নদীয়ায় ফিরিয়া আসিতেছেন! সমগ্র নদীয়া আনন্দময় হরিধ্বনিতে যেন বিষাদমৃত্যু হইতে সহসা জাগিয়া উঠিল। ভক্তগণ আনন্দে গাইতে লাগিলেন—

আওত গৌর, পুনহি নদীয়াপুর, হোয়ত মন হি উল্লাস।
ঐছে আনন্দকন্দ, পুনকিয়ে হেরব, করবহি সে সুখ বিলাস॥
হরি হরি কবে হেরব সো মুখচাঁদ।
বিরহ পয়োধি, কবহুঁ দিন পঙরব, টুটব হৃদয়ক ধাঁদ॥
কুন্দ-কনক-কাঁতি, কবে মোরা হেরব, মদন মনোহর সাজ।
বাহুযুগল তুলি, হরি হরি বোলব, নাচব ভকতগণ মাঝ॥
এত কহি নয়ন, মুদি রহু সবজন, গৌরপ্রেমে ভেল ভোর।
নরহরি দাস, আশা কবে পূরব, হেরব গৌরকিশোর॥

শ্রীশ্রীপ্রিয়াজীর আনন্দ-আশার কথাও শুনুন। প্রিয়াজী বলিতেছেন ঃ—

আসিবে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর, নদীয়া নগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া, চমকিত হৈঞা, করব মঙ্গল কাজ॥
জল ঘট ভরি, আম্রশাখা ধরি, রাখি সারি সারি করি।
কদলী আনিয়া, রোপণ করিয়া, ফুলমালা তাহে ধরি॥
আওল শুনিয়া নারী নদীয়া, আওব দেখিবার তরে।
হরি হরি ধ্বনি, জয়জয় বাণী, উঠিবে সকল ঘরে॥
শুনিয়া জননী, ধাইবে অমনি, করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে, ধুই কলেবরে, তুরিতে লইবে ঘরে॥

যতেক ভকত, দেখি হরষিত, হইবে প্রেম আনন্দ।
যদুনাথ যাঞা, পড়ে লোটাইয়া, লইতে চরণারবিন্দ॥

ওদিকে শ্রীগৌরসুন্দরের গম্ভীরামন্দির একদিন সহসা একবারে নীরব হইল। ভক্তগণ দেখিলেন, তাঁহাদের নয়নের মণি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে সহসা প্রবেশ করিলেন কিন্তু আর বাহির হইলেন না, তাঁহাকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। পুরীধাম সহসা আঁধার হইয়া পড়িল, ভক্তগণের বিষাদময় বিরহ-রোদনে সমগ্র পুরী শোকাচ্ছন্ন হইল।

কিন্তু এই সময়ে নদীয়ার সুনীল ভাগ্যগগনে সহসা সৌভাগ্য-শশী উদিত হইলেন। নদীয়াবাসীরা চকিতের ন্যায় দেখিতে পাইলেন, আবার সেই নটবরবেশে সেই কুন্তল-অলকাবৃত হাসি-মাখামুখে শ্রীগৌরসুন্দর শচীমাতার ভবনে প্রবেশ করিলেন, শচীমা আনন্দবিহ্বলভাবে হারাধন নয়নমণিকে পাইয়া কোলে তুলিয়া লইতে গেলেন। বাসুদেব ঘোষ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

আওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে ব্যাকুল চিত না পারে চলিতে॥
চিরদিনে গোরাচাঁদের বদন দেখিয়া।
ভুখল চকোর আঁখি রহয়ে মাতিয়া॥
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে কোর॥
মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষ গান॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সহাস্যবদনে মায়ের চরণধূলা মাথায় লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, আর প্রিয়াজী তখন বিদ্যুতের ন্যায় গৃহমাঝে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"এইত পরাণ-নাথে পাইনু।
যাহা লাগি বিরহ-দহনে ঝুরি গেনু॥"
এতদিনে সদয় হইল মোরে বিধি।
আনি মিলাইল মোর গোরা গুণ-নিধি॥
এতদিনে মিটল দারুণ দুঃখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদমুখ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর॥*

এই বলিতে বলিতে বাহু প্রসারণ করিয়া তিনি নিজ প্রাণবল্লভের নিকটে গিয়া স্বর্ণলতার ন্যায় শ্রীগৌরসুন্দরের কনকভুজপাশে বিজড়িত হইলেন। মধুময় উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, বিবিধ মঙ্গলধ্বনি ও মঙ্গল সঙ্গীতে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। চিদানন্দময় নবদ্বীপধামে এই নিত্য-মিলন চির-পবিত্র, চির-সুন্দর ও চির-মধুর।

শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীচরণকমলে সমর্পিতোঽস্তু।

---

* নিম্নাংশ বাসুদেব ঘোষের রচিত। উহার ভণিতা এই :

বাসুদেব ঘোষ গায় গোরা পরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ॥